সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা

(প্রথম ভাগ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., ডি. ফিল.
অধ্যাপক, মৌলানা আজাদ কলেজ, কলিকাতা

ও

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য এম. এ., পি. আর. এস., কাব্যতীর্থ,
অধ্যাপক, মৌলানা আজাদ কলেজ, কলিকাতা



এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট : কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
২, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৩৬৩

মুদ্রাকর :
শ্রীজয়ন্ত বাকচি
ইণ্ডিয়া ডাইরেক্টরী প্রেস
(পি. এম. বাকচি অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ)
৩৮এ, মসজিদবাড়ী স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ

সংস্কৃত সাহিত্য সুপ্রাচীন ও সুবিশাল। বর্তমান যুগে কোন সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস আয়ত্ত করিতে না পারিলে সেই সাহিত্যের জ্ঞান সম্পূর্ণ বলিয়া মনে করা হয় না। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রামাণ্য ইতিহাস রচিত হইয়াছে পাশ্চাত্য ভাষায়। এই ইতিহাস-রচয়িতৃগণের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ম্যাক্স্মূলার, ম্যাক্ডোনেল, কীথ্ ও ভিণ্টারনিৎস। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপ একটি ইতিহাস প্রকাশিত করিয়াছেন। কিন্তু, উক্ত গ্রন্থগুলি এত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও বৃহদাকার যে, উহাদের মধ্যে সাধারণ পাঠকের প্রবেশ সহজসাধ্য নহে। এইজন্য উহাদের সংক্ষিপ্তসার ইংরাজীতে রচিত হইয়াছে। এমন কি, হিন্দী এবং অন্যান্য কতক নব্য ভারতীয় ভাষায়ও সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা কেহ কেহ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, বাংলা ভাষায় এইরূপ ইতিহাস নাই বলিলেই চলে। জাহ্নবী ভৌমিক মহাশয়ের 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' সম্ভবতঃ বাংলা ভাষায় রচিত একমাত্র গ্রন্থ। কিন্তু, উহা মুদ্রিত হইয়াছিল প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে এবং ঐ গ্রন্থ বর্তমানে দুর্লভ।

সংস্কৃত সাহিত্যে উৎসাহী বাঙ্গালী পাঠকসাধারণের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি রচিত হইল। ইহা সংস্কৃত সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নহে, এই সাহিত্যের ইতিহাসে প্রবেশ-কামী ব্যক্তির সহায়ক মাত্র। ইহাতে পণ্ডিতগণের সূক্ষ্ম বিচার ও জটিল বিষয়ে বাদবিতণ্ডার অবতারণা করা হয় নাই।

যাঁহাদের জন্য এই গ্রন্থিকা রচিত হইল, ইহার দ্বারা তাঁহাদের কিঞ্চিৎ উপকার হইলেও লেখকদ্বয়ের শ্রম সার্থক হইবে। ইহা পাঠে কোন সহৃদয় ব্যক্তি ইহার দোষক্রটির প্রতি লেখকদ্বয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি তাঁহাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে দর্শন, অলঙ্কার প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রহিল।

রেফযুক্ত কোন কোন বর্ণের দ্বিত্ববিধি সকলে মানিয়া চলেন না। সুতরাং বর্তমান গ্রন্থে ঐ সকল বর্ণের দ্বিত্ববিধি কোন কোন ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হইয়াছে, অপর স্থলে করা হয় নাই। গ্রন্থমধ্যে কতক মুদ্রাকর প্রমাদ রহিয়া গেল বলিয়া গ্রন্থশেষে একটি শুদ্ধিপত্র সন্নিবেশিত হইল।

কলিকাতা
শ্রীপঞ্চমী, ১৩৬৩

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য

অবতরণিকা

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিবার পূর্বে আমাদের জানা প্রয়োজন, 'সংস্কৃত ভাষা' ও 'সংস্কৃত সাহিত্য' বলিতে ঠিক কি বুঝায়। সংস্কৃতকে ভারতীয় আর্যভাষা বলা হয়। সাধারণতঃ, 'সংস্কৃত ভাষা' বলিতে বৈদিক যুগের ভাষা হইতে আরম্ভ করিয়া 'রামায়ণ' 'মহাভারত'এর ভাষা ও তৎপরবর্তী যুগের ভাষা, নাটক, ব্যাকরণ, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, উহাদের টীকা টিপ্পনী প্রভৃতি সব কিছুর ভাষাকেই বুঝায়। কিন্তু, 'সংস্কৃত' শব্দটিতেই সংস্কার বা refinementএর একটা ভাব আছে। তাহা হইলে বুঝা যায়, পূর্বে এমন একটা ভাষা ছিল, যাহা refined হইয়া সংস্কৃতে পরিণত হইয়াছিল। সেই ভাষা কাহারও কাহারও মতে প্রাকৃত ভাষা, অর্থাৎ জনসাধারণের স্বাভাবিক ভাষা। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, মূল ভাষাই ছিল সংস্কৃত। ইহার বিকৃতিই প্রাকৃত ভাষা।

অধিকাংশ আধুনিক পণ্ডিতের মত অনুসারে ভারতীয় আর্যভাষার তিনটি স্তর স্বীকৃত হইয়াছে। উহারা এইরূপ :—

১। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা,

২। মধ্যভারতীয় আর্যভাষা,

৩। নব্য ভারতীয় আর্যভাষা।

ভিণ্টারনিৎস প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার নিম্নলিখিতরূপ কালানুক্রমিক ভাগ করিয়াছেন :—

(১) অতি প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা

(ক) প্রাচীনতর বৈদিক মন্ত্রসমূহের ভাষা (প্রধানতঃ ঋগ্বেদে),

(খ) পরবর্তী মন্ত্রসমূহের ভাষা (বিশেষতঃ অন্যান্য বেদ, ব্রাহ্মণ এবং সূত্রসাহিত্যের ভাষা)।

(২) সংস্কৃত

(ক) মন্ত্রাংশ ছাড়া, বৈদিক যুগের গদ্যগ্রন্থসমূহের ভাষা এবং পাণিনির ভাষা,

(খ) 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'—এই দুইটি এপিকের ভাষা,

(গ) ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত—অর্থাৎ পাণিনির পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষা।

মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্গত পালি ও প্রাকৃত ভাষা। প্রাকৃত ভাষা স্থানভেদে নানারূপে প্রচলিত ছিল; যথা—শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, মাগধী ইত্যাদি। ইহাদের উপভাষাও বিবিধপ্রকার ছিল। কালক্রমে প্রাকৃত ভাষা অপভ্রংশে পরিণত হইল।

অপভ্রংশ হইতে নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির উৎপত্তি; যথা—বাংলা, বিহারী, নেপালী ইত্যাদি।

এই ত গেল ভাষার কথা। এই গ্রন্থে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসই আমরা আলোচনা করিব; সুতরাং, মধ্যভারতীয় আর্যভাষা অর্থাৎ পালি ও প্রাকৃতে যে সাহিত্য রচিত হইয়াছিল, তাহা আমাদের ইতিহাসের বিষয়ীভূত নহে। মধ্যভারতীয় আর্যভাষা সংস্কৃত ভাষা নহে। অতএব, একমাত্র প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় রচিত সাহিত্যের ইতিহাসই বর্তমান গ্রন্থে আলোচনা করা হইবে। এই সাহিত্যকে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত কালানুক্রমিক ভাগে বিভক্ত করা হয়:—

(১) বৈদিক সাহিত্য,—সংহিতা,—ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও বেদাঙ্গসমূহ।

(২) এপিক সাহিত্য—রামায়ণ ও মহাভারত।

(৩) ক্লাসিক্যাল সাহিত্য—পাণিনির পরবর্তী নানাবিষয়ক গ্রন্থরাজি।

সংস্কৃত 'এপিক সাহিত্য'কে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। 'রামায়ণ' 'মহাভারত'কে তাঁহারা বলিয়াছেন popular epic বা জনপ্রিয় এপিক। পরবর্তী কালের পদ্যকাব্য সাহিত্যের আখ্যা তাঁহারা দিয়াছেন court epic বা রাজসভার এপিক।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এত প্রাচীন তাহা আমাদের পড়িবার বা জানিবার প্রয়োজন কি? বর্তমানে আমরা সংস্কৃত ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করি না বটে, কিন্তু এই ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষার প্রয়োজন নাই—একথা বলা চলে না। প্রথমতঃ, ভারতবাসীর পক্ষে সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান আবশ্যকতা এই যে, তাহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহন সংস্কৃত। পিতৃপিতামহের পরিচয় না থাকিলে যেমন কোন লোকের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে, তেমনই জাতির ঐতিহ্য না থাকিলে

তাহার মর্যাদার হানি ঘটে। কোন ব্যক্তির যদি জাতীয়তাবোধ না থাকে তাহা হইলে সে আত্মমর্যাদার জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হয়। তাই বিখ্যাত পণ্ডিত ম্যাকস্‌মূলার বলিয়াছেন,

,'A people that could feel no pride in the past, in its history……, had lost the mainstay of its national character."

দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে এবং কাব্য নাটকাদিতে যে সমস্ত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ ও নীতিমূলক কথা আছে, সেগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সুতরাং, আত্মোন্নতির জন্য ঐ সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিতে হইলে এই ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন। ভারতীয় কাব্যরসপিপাসুর পক্ষেও সংস্কৃত ভাষা অবশ্যপাঠ্য। তৃতীয়তঃ, প্রাচীন ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি যাবতীয় তথ্য বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতিতে নিহিত আছে। সুতরাং যে সংস্কৃত এই সকল গ্রন্থের ভাষা, তাহা অবশ্য শিক্ষণীয়। বস্তুতঃ সাহিত্য ছাড়াও মুদ্রা (numismatics) এবং লেখমালা (epigraphy) প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদানগুলি অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতে লিখিত। চতুর্থতঃ, পৃথিবীর ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাষা হিসাবে সংস্কৃত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার তুলনামূলক বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা বর্তমান যুগে আর্যগণেরই তিহাসে আলোকপাত হইতেছে। আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভারতীয় আর্যভাষার ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলেও সংস্কৃত ভাষা অপরিহার্য।

উল্লিখিত প্রয়োজন ছাড়াও কৃষিবিজ্ঞান, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, পদার্থ-বিদ্যা, বনস্পতিবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয় সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ আছে। এই সকল বাস্তব জীবনের উপযোগী বিদ্যা অর্জন করিতে হইলেও সংস্কৃত শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন।

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা

পরিশিষ্ট

বৈদিক যুগ

এক

বৈদিক সাহিত্য

বৈদিক সাহিত্য বলিতে বুঝায় ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগে আর্যদের সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যে সাহিত্য ভারতের মাটিতে স্বয়ং উদ্ভূত হইয়াছিল, সেই সাহিত্য। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশে যখন জ্ঞানের দীপশিখা জলিয়া উঠে নাই, তখনই সেই নিবিড় তমসাচ্ছন্ন যুগে আর্যদের জ্ঞানগরিমা ভারতের বুকে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। ঋগ্বেদের সূক্তগুলির আবির্ভাবের সময় হইতে অর্থাৎ সংহিতা-আবির্ভাবের সময় হইতে বেদাঙ্গ রচনার শেষ সময় পর্যন্ত যে বিশাল সাহিত্যের সন্ধান আমরা পাই, সংক্ষেপে বৈদিক সাহিত্য বলিতে ইহাকেই বুঝায়।

বৈদিক সাহিত্য বলিতে কি বুঝায় ?

বেদ কাহাকে বলে ? 'বেদ' শব্দ বিদ্ ধাতু হইতে জাত। বিদ্ ধাতুর অর্থ জানা। অর্থাৎ যে গ্রন্থ বা যে শব্দরাশি মানবজাতিকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের সন্ধান দেয় তাহাই বেদ। এই জন্যই সায়ণাচার্য বলিয়াছেন—'ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারয়োরলৌকিকমুপায়ং যো গ্রন্থো বেদয়তি স বেদঃ'।[১] অর্থাৎ যে গ্রন্থ ইষ্টলাভের ও অনিষ্টপরিহারের জন্য অলৌকিক কোন উপায় বলিয়া দেয় তাহাই বেদ। এই বেদ আবার কি লক্ষণ যুক্ত ? ইহার উত্তরে সায়ণ তাঁহার ভাষ্যভূমিকাতে বেদ বলিতে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণই কেবল বুঝিয়াছেন এবং মীমাংসার যুক্তিদ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন।

সেই বেদ নামক গ্রন্থরাশি কেবলই মন্ত্রমূলক, না ব্রাহ্মণভাগও তাহার অন্তর্গত—ইহার বিচার প্রয়োজন। বেদ শব্দই হোক কিংবা ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিন বেদই হোক—ইহারা মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক ভাগকেই বুঝায়। অতএব বেদ বলিতে আমরা সামগ্রিকভাবে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক শব্দরাশিকেই বুঝি।

১। তৈত্তিরীয়-সংহিতার ভাষ্যভূমিকায় সায়ণ।

সেই বেদ কোন লেখক রচনা করেন নাই। অনন্তকালের ন্যায় কিংবা অনাদি আকাশের ন্যায় এই শব্দরাশি অনাদি ও অপৌরুষেয়।[১] শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করিলে শব্দরাশি-মূলক বেদ পদার্থও যে নিত্য তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। যুগান্তে এই শব্দরাশি প্রচ্ছন্ন আকারে বর্তমান থাকে, যুগপ্রারম্ভে আবার স্বয়ং প্রকাশিত হয়। সেইজন্য ইহা স্বয়ম্ভু।

বেদের অনাদিত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব

কিন্তু এই বিষয়ে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই যে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ—এই দুইভাগে বিভক্ত গ্রন্থরাশি আর্যদের ধর্মগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ পদ অধিকার করিয়া আছে—ইহা আর্যাবর্তের অধিবাসী বহুদর্শী মহর্ষিগণ কর্তৃক তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনামাত্র এবং মহর্ষিগণ সেই পরিস্থিতিকে সাক্ষাৎ পর্যবেক্ষণ করিয়া গ্রন্থাকারে ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, সেই সময়ে যে সকল দেবতা ঋষিগণের মানসনেত্রে প্রতিভাত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই মন্ত্রে স্তুত হইয়াছেন। সেই সমস্ত মন্ত্রগুলি একত্র সংকলিত করিয়া যে গ্রন্থের সৃষ্টি হইল, তাহাই ঋগ্বেদ। ইহাকেই আমরা ঋক্‌সংহিতাও বলিয়া থাকি। ইহা পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম গ্রন্থ। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

পাশ্চাত্ত্য মত

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতে বেদের মন্ত্রভাগ ব্রাহ্মণভাগের পূর্বে রচিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে তাঁহাদের বিচারের মানদণ্ড ভাষা, ছন্দ ও সভ্যতার ক্রম-বিকাশ। ইহা ছাড়াও দেবদেবীর ক্রমবর্ধমান সংখ্যা, দার্শনিক মতের আবির্ভাব ও যাগযজ্ঞের প্রাধান্য তাঁহাদের উক্ত মতকে দৃঢ়ীভূত করিয়াছে। কিন্তু এই মত নানাকারণে বিচারসহ নয়। যথাস্থানে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

এই মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদ প্রথমতঃ চারিভাগে বিভক্ত—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। অবশ্য প্রথমে অথর্ববেদ কতকগুলি কারণে বেদ বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। সেই জন্যই বেদের সংহিতা বুঝাইতে অনেক স্থলেই 'ত্রয়ী' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে।

সংহিতার চারিভাগ

১। 'কালাকাশাদয়ো যথা নিত্যা এবং বেদোঽপি ব্যবহারকালে কালিদাসাদিবাক্যবৎপুরুষ-বিরচিতত্বাভাবেন নিত্যঃ'—সায়ণ।

ঋগ্বেদ কতকগুলি ঋকের সমষ্টিমাত্র। ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রের নামই ঋক্। ছন্দোহীন গদ্যাত্মক মন্ত্রই যজুঃ। ঋকের অন্তর্গত গেয় পদার্থের যখন গান করা হয় তখনই তাহা সাম। আর ছন্দোবদ্ধ ঋগ্বিশেষই প্রধানতঃ অথর্বাঙ্গিরস বলিয়া পরিচিত। অথর্ববেদে অবশ্য ঋক্, যজুঃ ও সাম অর্থাৎ পদ্য, গদ্য ও গানের সমন্বয় ঘটিয়াছে—তবে ঋকের সংখ্যাই সেখানে বেশী।

এই চারিবেদের প্রত্যেকটির আবার অনেকগুলি করিয়া শাখা আছে। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির মতে[১] ঋগ্বেদের ২১টি শাখা, সামবেদের সহস্র শাখা, যজুর্বেদের ১০০টি ও অথর্ববেদের ৯টি শাখা। কালক্রমে ইহাদের অনেক শাখা বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। যে কয়েকটিমাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহাদের আলোচনা বিভিন্ন সংহিতার অধ্যায়ে করিব।

ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক

ঋগ্বেদের দুইটি ব্রাহ্মণ ও দুইটি আরণ্যক। ব্রাহ্মণ দুইটির নাম ঐতরেয় ও কৌষীতকী। আরণ্যক দুইটি যথাক্রমে ঐতরেয় ও কৌষীতক।

যজুর্বেদের দুইটি 'recension' বা রূপ—শুক্ল যজুর্বেদ ও কৃষ্ণ যজুর্বেদ। এই বেদ দুই রূপে বিভক্ত হওয়ার কারণ যজুর্বেদের অধ্যায়ে বলা হইবে। স্থূলভাবে যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক প্রচারিত বেদের নাম শুক্ল যজুর্বেদ ও বৈশম্পায়ন যে যজুর্বেদকে সমর্থন করিয়াছিলেন তাহাই কৃষ্ণ যজুর্বেদ। শুক্ল যজুর্বেদ পদ্যে রচিত, কৃষ্ণ যজুর্বেদের বেশীর ভাগই গদ্য। কৃষ্ণ যজুর্বেদের ৩টি শাখা। উহার তৈত্তিরীয় শাখায় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ রহিয়াছে। শুক্ল যজুর্বেদের দুইটি

শুক্ল ও কৃষ্ণ যজুর্বেদ

শাখা মাত্র পাওয়া যায়। তাহাদের নাম কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন। এই উভয় শাখারই পৃথক্ পৃথক্ দুইটি ব্রাহ্মণ আছে। সেই ব্রাহ্মণ ভাগ 'শতপথ ব্রাহ্মণ' নামে প্রসিদ্ধ। সামবেদের শাখা ৩টি। ইহার ব্রাহ্মণ ৮টি : তাণ্ড্য, ষড্‌বিংশ, মন্ত্রদৈবত, আর্ষেয়, সামবিধান, সংহিতোপনিষদ্, বংশ ও জৈমিনীয়। ইহার মধ্যে তাণ্ড্য ব্রাহ্মণই আকারে বৃহৎ ও বিষয়বস্তুতে শ্রেষ্ঠ, সেজন্য ইহার নাম 'মহাব্রাহ্মণ'।

অথর্ববেদের সংহিতা দুইটি। ব্রাহ্মণ একটিই মাত্র পাওয়া যায়—নাম গোপথ।

১। "একশতমধ্বর্যুশাখাঃ সহস্রবর্ত্মা সামবেদ, একবিংশতিধা বাহ্বৃচ্যং নবধাথর্বণো বেদঃ" (মহাভাষ্য পস্পশা আহ্নিক)।

'ব্রাহ্মণ' শব্দের অর্থ 'বেদের ব্যাখ্যাভাগ', কারণ বেদকে ব্রহ্ম বলিয়া ব্রাহ্মণ ঋষিগণ মনে করিতেন। 'সংহিতা' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অবশ্য যাহা কাছাকাছি থাকে [পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা] অর্থাৎ মন্ত্রগণ পরস্পর সন্ধি-সূত্রে সংবদ্ধ। এই মন্ত্র বা সংহিতারই ব্যাখ্যাকে 'ব্রাহ্মণ' বলা হয়।

আরণ্যক ও উপনিষদ্

চারি বেদের পুনরায় আরণ্যক ও উপনিষৎ ভাগ আছে। অরণ্যে যাহা সৃষ্ট হইয়াছিল বা অরণ্যে যে অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের সন্ধান আর্যঋষিগণ জীবনের শেষভাগে পাইতেন তাহাই আরণ্যক। আর ব্রহ্মবিদ্যার সন্ধান লাভ বা আলোচনার নাম উপনিষদ্। যে গ্রন্থে এই বিদ্যা লিপিবদ্ধ করা হইত, তাহাকেও উপনিষদ্ বলা হইয়াছে।

বেদের আরণ্যকভাগের মধ্যে ঐতরেয় ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ঈশা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক—উপনিষৎসাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী বলেন:—'প্রতিপাদ্য বিষয় অনুসারে বেদকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কিন্তু এই দুই নামে কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ নাই। বৈদিক যে কোন গ্রন্থে বা তাহার অংশবিশেষে কর্ম ও জ্ঞানের আলোচনা আছে তাহাকেই যথাক্রমে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া মনে করা হয়।"[১] সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সাধারণভাবে কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত, আর আরণ্যক ও উপনিষৎ জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

বেদাঙ্গ

অত্যন্ত গূঢ় বেদ-শাস্ত্রের অর্থ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য শিক্ষাদি ষড়ঙ্গ সৃষ্ট হইয়াছিল। ইহারা বেদাঙ্গ বা বেদের অঙ্গীভূত অবশ্য প্রয়োজনীয় অংশ নামে বিখ্যাত। বেদাঙ্গ পুরুষ কর্তৃক রচিত অর্থাৎ পৌরুষেয়। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই ছয়টি অঙ্গ বেদপাঠোদ্ধারে যথেষ্ট সাহায্য করে।

১। উপনিষদ্—লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা, সংখ্যা ৫৮

দুই

ঋগ্বেদ

ঋগ্বেদ কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল জানিবার জন্ম পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতবর্গ যে গভীর আলোচনায় লিপ্ত হইয়াছেন, তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে বলিয়া রাখা দরকার যে ঋগ্বেদ কোন একখানি গ্রন্থ মাত্র নয়, কিন্তু ইহা গ্রন্থাকারে অনেকগুলি দৃষ্ট মন্ত্রের সমষ্টি মাত্র। অধ্যাপক ভি. এস্. ঘাটে (V. S. Ghate) বলিয়াছেন, "আমি আপনাদের সাবধান করিতে চাই এই বলিয়া যে ঋগ্বেদকে আমরা যখন একটি 'গ্রন্থ' বলিব, তখন আমরা যেন কিছুতেই ঐ উক্তিটিকে অক্ষরানুবাদমাত্র না মনে করি। যদি 'গ্রন্থ' বলিতে কোন ব্যক্তিবিশেষের রচনাকে, তাহার কালের বা সময়ের এবং ধারণাগুলির ঐক্যকে বুঝায় তবে ঋগ্বেদ এধরণের গ্রন্থ মোটেই নয়। তাহার চেয়ে ইহাকে 'সংকলন' বলাও ভাল।"[১]

সংকলন কাল

আস্তিক মতে ঋগ্বেদ অনাদি ও অপৌরুষেয়। শুধু ঋগ্বেদ কেন, ঋগ্বেদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া উপনিষদ্ যুগের শেষভাগ পর্যন্ত যতগুলি গ্রন্থ পাওয়া যায়, সবগুলিই অনাদি ও অপৌরুষেয়, তাহা প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি, কারণও কিছু প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক মতে ঋগ্বেদ পৃথিবীর আদিম গ্রন্থ। খ্রীষ্টজন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে ইহা রচিত হইয়াছিল। ভৌগোলিক বিবরণ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিচার এবং ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে ঋগ্বেদ সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাচীনতম গ্রন্থ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ইহা লোকমুখে চলিয়া আসিতেছিল, লিপিবদ্ধ হয় নাই, কারণ প্রাচীন ভারত লিপির অপেক্ষা স্মৃতিকেই বেশী প্রাধান্ত দিয়াছিল। যাহা হউক, আধুনিক বিচারে ঋগ্বেদের রচনাকাল আনুমানিক কোন সময় তাহাই নিম্নে সংক্ষেপে বলিব।

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার সর্বপ্রথম বেদের রচনাকাল বা সংকলনকাল স্থির করার চেষ্টা আরম্ভ করেন। তাঁহার মতে ঋগ্বেদ আনুমানিক ১২০০-১০০০,

১। Ghate's Lectures on Rigveda—Sukthankar, p. 58.

খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রচিত বা সংগৃহীত হয়। পরবর্তী কালের গবেষণায় এই মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ম্যাক্‌ডোনেলের মতে ঋগ্বেদ ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রচিত। দার্শনিক রাধাকৃষ্ণন ও ভাষাবিৎ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ঋগ্বেদ যথাক্রমে দর্শন ও ভাষার ভিত্তিতে ১৫০০ খ্রীষ্ট পূঃ অব্দে রচিত। ভিণ্টারনিৎস্ সব সময়েই মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। তাঁহার মতে ঋগ্বেদের রচনাকাল ২৫০০-২০০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দ। মহারাষ্ট্রকেশরী বালগঙ্গাধর তিলকের মতে ঋগ্বেদ এবং অপর কয়েকটি বৈদিক গ্রন্থের কাল খ্রীঃ পূঃ ৬০০০ অব্দ। কিন্তু জার্মান জ্যোতির্বিদ জেকবির মতে ঋগ্বেদের রচনাকাল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০। তাঁহার মতে ঋগ্বেদের সভ্যতার কাল সাধারণভাবে খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০-২৫০০ অব্দ।[১] দেশমুখ তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে আর্যসভ্যতা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতা সমসাময়িক।[২]

ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস ঋগ্বেদের রচনাকাল ১৬০০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দ বলিয়া মনে করেন এবং সে সম্পর্কে তাঁহার সহিত ভিণ্টানিৎস্এর যথেষ্ট মতান্তর ঘটে। আমাদের মতে, ভিণ্টারনিৎস্এর মত অধিকাংশেই যুক্তিসহ, যদিও ঋগ্বেদের রচনাকাল কখনও নিশ্চিতভাবে জানা যাইবে কিনা সেই বিষয়ে অধ্যাপক হুইট্‌নে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।[৩]

ঋগ্বেদের বিষয়বস্তু—প্রাচীন আর্যগণের সাধনা, কৃষ্টি ও দেবদেবীগণের প্রতি তাঁহাদের ভক্তিমিশ্রিত ও বিস্ময়বিহ্বল স্তবস্তুতি। আর্যগণ যখন প্রথম ভারতে আগমন করেন, তখন এই সুবিশাল দেশের বিরাট রূপ ও বৈচিত্র্য তাঁহাদিগকে বিস্ময়ে বিমোহিত করিয়া দিয়াছিল। প্রকৃতির ধ্যানগম্ভীর রূপ, ঋতুতে ঋতুতে তাহার বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন, তাহার রুদ্র ও শান্ত সুন্দর পরিবেশ তাঁহাদের আকৃষ্ট করিয়াছিল, এবং প্রকৃতির মূলে যে সকল সনাতনী দেবতা ছিলেন, তাঁহাদের স্তবে আর্যগণ নিজেদের বিলীন করিয়া দিয়াছেন। বিশাল অরণ্যানী, অতল সমুদ্র, অনন্ত আকাশ, অসীম

১। Winternitz—A History of Indian Literature, Vol. 1, p. 296.

২। The Indus Civilisation in the Rigveda—P. R. Deshmukh.

৩। 'বেদের কাল ও সংস্কৃতি' অধ্যায় দ্রঃ।

শক্তিশালী মরুৎগণ, বজ্রমেঘ ও বারিবর্ষণের মূলে যে প্রকৃতি, হাস্যময়ী উষা, জ্যোতির্ময় শক্তির উৎস আদিত্য তাঁহাদের মনে বিস্ময়-মিশ্রিত ভক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন বলিয়া অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত মনে করেন। যাহা হউক, ঋগ্বেদের মধ্যে আমরা ভারতে আর্যযুগের প্রাচীনতম সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন পাই। ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিলে মনে হয়, সেই সুপ্রাচীন যুগেও আর্যগণ সভ্যতার উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন কি করিয়া! অল্প কথায়, ঋগ্বেদে আর্যদের ভারতে রাজ্যবিস্তারের প্রথম প্রয়াস বর্ণিত আছে। সেই প্রসঙ্গে ত্রিৎসু-গোষ্ঠীর সুদাসের সহিত দশজাতির রাজগণের যুদ্ধ, আর্য অনার্যের সংঘর্ষ, দেবদেবীগণের নিকট আর্যদের ধনধান্য হস্তীঅশ্বহিরণ্যক্ষেত্রপুত্রপৌত্রাদি প্রার্থনা, দার্শনিক ও যাজ্ঞিক মতের সমর্থনে রচিত মন্ত্রাদি ঋগ্বেদের বিষয়বস্তুর অন্তর্গত।

বিষয়বস্তু

ঋগ্বেদের বিষয়বস্তুকে দুইভাগে ভাগ করার প্রথা প্রচলিত। এক হিসাবে ঋগ্বেদ অষ্টক, অধ্যায় এবং বর্গে ও ঋকে বিভক্ত। অপর মতে, ঋগ্বেদ মণ্ডল, অনুবাক সূক্তে ও ঋকে বিভক্ত। প্রথম মত একমাত্র ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত—অধ্যয়নের সুবিধা অনুসারেই এই প্রকার ভাগ করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ঋগ্বেদ আটটি অষ্টক, চৌষট্টি অধ্যায় এবং অনেকগুলি বর্গে বিভক্ত। যাজ্ঞিকগণ সাধারণতঃ অষ্টক, অধ্যায় ও বর্গগত বিভাগই গ্রহণ করেন। অধ্যাপক ঘাটের মতে "এরূপ বিভাগ কেবলমাত্র নিয়মমাফিক এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক।" দ্বিতীয় মতে ঋগ্বেদ মণ্ডল, অনুবাক ও সূক্তে বিভক্ত। ব্রাহ্মণ-যুগ হইতে এই মত চলিয়া আসিতেছে। এই মতের মূলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে দশটি মণ্ডল আছে। প্রথম মণ্ডলে ২৪টি অনুবাক (খণ্ড), দ্বিতীয়ে ৪টি; তৃতীয়, চতুর্থ প্রত্যেকটিতে ৫টি; পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রত্যেকটিতে ৬টি; অষ্টমে ১০টি; নবমে ৭টি ও দশমে ১২টি অনুবাক আছে। প্রত্যেকটি অনুবাক আবার কতগুলি সূক্তের সমষ্টি এবং প্রত্যেকটি সূক্ত কতকগুলি ঋক্ বা বৈদিক শ্লোকের সমষ্টি। ঋগ্বেদে মোট ১০২৮টি সূক্ত আছে। ইহার মধ্যে ১১টি সূক্ত 'খিল' নামে অভিহিত, 'খিল' শব্দের অর্থ 'পরিশিষ্ট'। ভিণ্টারনিৎস্এর মতে খিল

অষ্টক ও মণ্ডল গত বিভাগ

খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রচিত বা সংগৃহীত হয়। পরবর্তী কালের গবেষণায় এই মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ম্যাক্‌ডোনেলের মতে ঋগ্বেদ ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রচিত। দার্শনিক রাধাকৃষ্ণন ও ভাষাবিৎ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ঋগ্বেদ যথাক্রমে দর্শন ও ভাষার ভিত্তিতে ১৫০০ খ্রীষ্ট পূঃ অব্দে রচিত। ভিণ্টারনিৎস্ সব সময়েই মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। তাঁহার মতে ঋগ্বেদের রচনাকাল ২৫০০-২০০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দ। মহারাষ্ট্রকেশরী বালগঙ্গাধর তিলকের মতে ঋগ্বেদ এবং অপর কয়েকটি বৈদিক গ্রন্থের কাল খ্রীঃ পূঃ ৬০০০ অব্দ। কিন্তু জার্মান জ্যোতির্বিদ জেকবির মতে ঋগ্বেদের রচনাকাল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০। তাঁহার মতে ঋগ্বেদের সভ্যতার কাল সাধারণভাবে খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০-২৫০০ অব্দ।[১] দেশমুখ তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে আর্যসভ্যতা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতা সমসাময়িক।[২]

ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস ঋগ্বেদের রচনাকাল ১৬০০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দ বলিয়া মনে করেন এবং সে সম্পর্কে তাঁহার সহিত ভিণ্টানিৎস্‌এর যথেষ্ট মতান্তর ঘটে। আমাদের মতে, ভিণ্টারনিৎস্‌এর মত অধিকাংশেই যুক্তিসহ, যদিও ঋগ্বেদের রচনাকাল কখনও নিশ্চিতভাবে জানা যাইবে কিনা সেই বিষয়ে অধ্যাপক হুইট্‌নে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।[৩]

ঋগ্বেদের বিষয়বস্তু—প্রাচীন আর্যগণের সাধনা, কৃষ্টি ও দেবদেবীগণের প্রতি তাঁহাদের ভক্তিমিশ্রিত ও বিস্ময়বিহ্বল স্তবস্তুতি। আর্যগণ যখন প্রথম ভারতে আগমন করেন, তখন এই সুবিশাল দেশের বিরাট রূপ ও বৈচিত্র্য তাঁহাদিগকে বিস্ময়ে বিমোহিত করিয়া দিয়াছিল। প্রকৃতির ধ্যানগম্ভীর রূপ, ঋতুতে ঋতুতে তাহার বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন, তাহার রুদ্র ও শান্ত সুন্দর পরিবেশ তাঁহাদের আকৃষ্ট করিয়াছিল, এবং প্রকৃতির মূলে যে সকল সনাতনী দেবতা ছিলেন, তাঁহাদের স্তবে আর্যগণ নিজেদের বিলীন করিয়া দিয়াছেন। বিশাল অরণ্যানী, অতল সমুদ্র, অনন্ত আকাশ, অসীম

১। Winternitz—A History of Indian Literature, Vol. 1, p. 296.

২। The Indus Civilisation in the Rigveda—P. R. Deshmukh.

৩। 'বেদের কাল ও সংস্কৃতি' অধ্যায় দ্রঃ।

শক্তিশালী মরুৎগণ, বজ্রমেঘ ও বারিবর্ষণের মূলে যে প্রকৃতি, হাস্তময়ী উষা, জ্যোতির্ময় শক্তির উৎস আদিত্য তাঁহাদের মনে বিস্ময়-মিশ্রিত ভক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন বলিয়া অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত মনে করেন। যাহা হউক, ঋগ্বেদের মধ্যে আমরা ভারতে আর্যযুগের প্রাচীনতম সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন পাই। ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিলে মনে হয়, সেই সুপ্রাচীন যুগেও আর্যগণ সভ্যতার উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন কি করিয়া! অল্প কথায়, ঋগ্বেদে আর্যদের ভারতে রাজ্যবিস্তারের প্রথম প্রয়াস বর্ণিত আছে। সেই প্রসঙ্গে ত্রিৎসু-গোষ্ঠীর সুদাসের সহিত দশজাতির রাজগণের যুদ্ধ, আর্য অনার্যের সংঘর্ষ, দেবদেবীগণের নিকট আর্যদের ধনধান্য হস্তীঅশ্বহিরণ্যক্ষেত্রপুত্রপৌত্রাদি প্রার্থনা, দার্শনিক ও যাজ্ঞিক মতের সমর্থনে রচিত মন্ত্রাদি ঋগ্বেদের বিষয়বস্তুর অন্তর্গত।

বিষয়বস্তু

ঋগ্বেদের বিষয়বস্তুকে দুইভাগে ভাগ করার প্রথা প্রচলিত। এক হিসাবে ঋগ্বেদ অষ্টক, অধ্যায় এবং বর্গে ও ঋকে বিভক্ত। অপর মতে, ঋগ্বেদ মণ্ডল, অনুবাক সূক্তে ও ঋকে বিভক্ত। প্রথম মত একমাত্র ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত—অধ্যয়নের সুবিধা অনুসারেই এই প্রকার ভাগ করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ঋগ্বেদ আটটি অষ্টক, চৌষট্টি অধ্যায় এবং অনেকগুলি বর্গে বিভক্ত। যাজ্ঞিকগণ সাধারণতঃ অষ্টক, অধ্যায় ও বর্গগত বিভাগই গ্রহণ করেন। অধ্যাপক ঘাটের মতে "এরূপ বিভাগ কেবলমাত্র নিয়মমাফিক এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক।" দ্বিতীয় মতে ঋগ্বেদ মণ্ডল, অনুবাক ও সূক্তে বিভক্ত। ব্রাহ্মণ-যুগ হইতে এই মত চলিয়া আসিতেছে। এই মতের মূলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে দশটি মণ্ডল আছে। প্রথম মণ্ডলে ২৪টি অনুবাক (খণ্ড), দ্বিতীয়ে ৪টি; তৃতীয়, চতুর্থ প্রত্যেকটিতে ৫টি; পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রত্যেকটিতে ৬টি; অষ্টমে ১০টি; নবমে ৭টি ও দশমে ১২টি অনুবাক আছে। প্রত্যেকটি অনুবাক আবার কতগুলি সূক্তের সমষ্টি এবং প্রত্যেকটি সূক্ত কতকগুলি ঋক্ বা বৈদিক শ্লোকের সমষ্টি। ঋগ্বেদে মোট ১০২৮টি সূক্ত আছে। ইহার মধ্যে ১১টি সূক্ত 'খিল' নামে অভিহিত, 'খিল' শব্দের অর্থ 'পরিশিষ্ট'। ভিন্টারনিৎস্‌এর মতে খিল

অষ্টক ও মণ্ডল গত বিভাগ

সূক্তগুলি ঋগ্বেদ রচনার দীর্ঘকাল পরে আদি অংশের সহিত সংযোজিত হইয়াছিল।

শাস্ত্র মতে ঋগ্বেদের কোন সূক্তের পঠন-পাঠনের জন্য সেই সূক্তের ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞানের অভাব থাকিলে পাঠক ও শ্রোতা উভয়ের পক্ষেই সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। সেজন্য :—

অবিদিত্বা ঋষিং ছন্দো দৈবতং যোগমেব চ।
যোঽধ্যাপয়েজ্জপেদ্বাপি পাপীয়াঞ্জায়তে তু সঃ॥

কাত্যায়নের সর্বানুক্রমণীর মতে—'যস্য বাক্যং স ঋষিঃ' অর্থাৎ যিনি মন্ত্র দর্শন করিয়াছেন তিনিই ঋষি; যিনি মন্ত্রে ঋষি কর্তৃক উক্ত বা স্তুত হইয়াছেন তিনিই দেবতা। অক্ষরের পরিমাণে যে মন্ত্র রচিত হয় তাহাই ছন্দ। যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকলাপের সহিত যাহার সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহাই বিনিয়োগ।[১]

ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগ

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় হইতে সপ্তম মণ্ডল আর্য মণ্ডল নামে প্রথিত। যথাক্রমে গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ ও বশিষ্ঠ এই মণ্ডলগুলির স্রষ্টা। ইহারা নিজেই অথবা বংশপরম্পরায় এক একটি মণ্ডলের সূক্তগুলি লাভ করিয়াছিলেন। 'দর্শনাদৃষিত্বম্'— দেখিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা ঋষি। এই 'দর্শন' ধ্যানযোগেই লাভ করা যায়। পাপ বা অপঘাত মৃত্যু প্রভৃতি হইতে যাহা রক্ষা করে তাহাই ছন্দ। মন্ত্রে স্তুত ব্যক্তিই দেবতা। ঋগ্বেদে প্রধানতঃ ৭টি ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহারা গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী। গায়ত্রী অষ্টাক্ষর বিশিষ্ট ত্রিপাদ সমন্বিত। উষ্ণিক্ ২৮ অক্ষর সম্বলিত। অনুষ্টুপ্ ৩২, বৃহতী ৩৬, পংক্তি ৪০, ত্রিষ্টুপ, ৪৪ ও জগতী ৪৮ অক্ষরে রচিত। ঋগ্বেদে দ্যৌঃ, পৃথিবী, বরুণ, ঋত, মিত্র, সূর্য, সবিতৃ, বিষ্ণু, পূষন্, উষস্, অশ্বিদ্বয়, অদিতি, অগ্নি, সোম, পর্জন্য, ইন্দ্র, বায়ু, মরুৎ, রুদ্র প্রভৃতি দেবদেবীগণ স্তুত হইয়াছেন। প্রত্যেকটি মন্ত্র ও সূক্তকে যজ্ঞের

১। [বিনিয়োগঃ নাম কর্মভিঃ সম্বন্ধঃ।] Vedic Selection (C. U.) edited by Dr. Kshitish Chatterjee, p. 1 (foot note) দ্রষ্টব্য।

কোন না কোন প্রক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে। কেহ কেহ ইহা ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থান্বেষণের ফল বলিয়া মনে করেন। মনে হয়, ঋগ্বেদে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই যজ্ঞের বিকাশ দেখা যায়। যেমন ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্রেই যজ্ঞের অঙ্গগুলি ধরা যাউক। অগ্নি দেবতা, তাঁহাকে পূজা করা হইতেছে, তিনি যজ্ঞের দেবতা—এখানে বিষয় ও বিষয়ের অধিষ্ঠাতা, ঋত্বিক্ বা ঋতুতে যে যজ্ঞের প্রথা ছিল অর্থাৎ চাতুর্মাস্য যাগ প্রভৃতি, তাহার পুরোহিত, হোতা বা ঋগ্বেদীয় পুরোহিত, রত্নপ্রসবিনী দেবতা, অর্থাৎ দেবতার নিকট ফলপ্রাপ্তির ইচ্ছা—সকলই বর্তমান রহিয়াছে। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলিকে পরবর্তী কালে সোমযাগ, রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ ও অগ্নিহোত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া তাহাদের বিনিয়োগ প্রদর্শন করা হইয়াছে।[১]

ঋগ্বেদ দশটি মণ্ডলে বিভক্ত পূর্বেই বলিয়াছি। ইহাদের মধ্যে ভাষা, ছন্দ ও দার্শনিক বিচারে, পাশ্চাত্ত্য ও আধুনিক মতে, কোন কোন অংশ সুপ্রাচীন, কোন কোন অংশ আবার অর্বাচীন। ঋষিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মণ্ডলগুলি (২-৭ মণ্ডল) প্রাচীন অংশ বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। ইহাদের ছন্দ ও ভাষা সুপ্রাচীন। সোমযজ্ঞের সহিত কোন পরিচয়ই এগুলিতে নাই। প্রথম, অষ্টম, নবম ও দশম মণ্ডলকে অর্বাচীন বলিয়া মনে করিবার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ আছে। অষ্টম মণ্ডল ঋষিগোষ্ঠী কর্তৃক দৃষ্ট মণ্ডল নহে। এই মণ্ডলে আর্ষ মণ্ডলের ন্যায় রচনাপ্রক্রিয়ায় কোন বিশিষ্ট নিয়ম রক্ষিত হয় নাই। নবম মণ্ডল সোম পবমানের স্তব-স্তুতিতেই পূর্ণ। এই সোম পবমানের স্তুতি থাকার জন্য, ঋগ্বেদকে পরবর্তী কালে যজ্ঞের সহিত সংশ্লিষ্ট করার চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। বৈদিক যজ্ঞের মধ্যে সর্বপ্রধান গুরুত্বপূর্ণ যাগ সোমযাগ। সামবেদের উদ্ভবও এই ঋগ্বেদের নবম মণ্ডল হইতে—ইহা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথম মণ্ডলও ভাষা ও ছন্দের ভিত্তিতে ঋগ্বেদের আদিম অংশ বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া, ঋগ্বেদের সহিত অন্যান্য যজ্ঞপ্রধান বেদের সামঞ্জস্য রাখিবার উদ্দেশ্যে

১। "Sacrifice in the Rigveda"—K. T. Potdar দ্রষ্টব্য।

সূক্তগুলি ঋগ্বেদ রচনার দীর্ঘকাল পরে আদি অংশের সহিত সংযোজিত হইয়াছিল।

শাস্ত্র মতে ঋগ্বেদের কোন সূক্তের পঠন-পাঠনের জন্য সেই সূক্তের ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞানের অভাব থাকিলে পাঠক ও শ্রোতা উভয়ের পক্ষেই সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। সেজন্য :—

অবিদিত্বা ঋষিং ছন্দো দৈবতং যোগমেব চ।
যোঽধ্যাপয়েজ্জপেদ্বাপি পাপীয়াঞ্জায়তে তু সঃ॥

কাত্যায়নের সর্বানুক্রমণীর মতে—'যস্য বাক্যং স ঋষিঃ' অর্থাৎ যিনি মন্ত্র দর্শন করিয়াছেন তিনিই ঋষি· যিনি মন্ত্রে ঋষি কর্তৃক উক্ত বা স্তুত হইয়াছেন তিনিই দেবতা। অক্ষরের পরিমাণে যে মন্ত্র রচিত হয় তাহাই ছন্দ। যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকলাপের সহিত যাহার সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহাই বিনিয়োগ।[১]

ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগ

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় হইতে সপ্তম মণ্ডল আর্য মণ্ডল নামে প্রথিত। যথাক্রমে গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ ও বশিষ্ঠ এই মণ্ডলগুলির স্রষ্টা। ইহারা নিজেই অথবা বংশপরম্পরায় এক একটি মণ্ডলের সূক্তগুলি লাভ করিয়াছিলেন। 'দর্শনাদৃষিত্বম্'—দেখিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা ঋষি। এই 'দর্শন' ধ্যানযোগেই লাভ করা যায়। পাপ বা অপঘাত মৃত্যু প্রভৃতি হইতে যাহা রক্ষা করে তাহাই ছন্দ। মন্ত্রে স্তুত ব্যক্তিই দেবতা। ঋগ্বেদে প্রধানতঃ ৭টি ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহারা গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী। গায়ত্রী অষ্টাক্ষর বিশিষ্ট ত্রিপাদ সমন্বিত। উষ্ণিক্ ২৮ অক্ষর সম্বলিত। অনুষ্টুপ্ ৩২, বৃহতী ৩৬, পংক্তি ৪০, ত্রিষ্টুপ, ৪৪ ও জগতী ৪৮ অক্ষরে রচিত। ঋগ্বেদে দ্যৌঃ, পৃথিবী, বরুণ, ঋত, মিত্র, সূর্য, সবিতৃ, বিষ্ণু, পূষন্, উষস্, অশ্বিদ্বয়, অদিতি, অগ্নি, সোম, পর্জন্য, ইন্দ্র, বায়ু, মরুৎ, রুদ্র প্রভৃতি দেবদেবীগণ স্তুত হইয়াছেন। প্রত্যেকটি মন্ত্র ও সূক্তকে যজ্ঞের

১। [বিনিয়োগঃ নাম কর্মভিঃ সম্বন্ধঃ।] Vedic Selection (C. U.) edited by Dr. Kshitish Chatterjee, p. 1 (foot note) সায়ণ।

কোন না কোন প্রক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে। কেহ কেহ ইহা ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থান্বেষণের ফল বলিয়া মনে করেন। মনে হয়, ঋগ্বেদে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই যজ্ঞের বিকাশ দেখা যায়। যেমন ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্রেই যজ্ঞের অঙ্গগুলি ধরা যাউক। অগ্নি দেবতা, তাঁহাকে পূজা করা হইতেছে, তিনি যজ্ঞের দেবতা—এখানে বিষয় ও বিষয়ের অধিষ্ঠাতা, ঋত্বিক্ বা ঋতুতে যে যজ্ঞের প্রথা ছিল অর্থাৎ চাতুর্মাস্য যাগ প্রভৃতি, তাহার পুরোহিত, হোতা বা ঋগ্বেদীয় পুরোহিত, রত্নপ্রসবিনী দেবতা, অর্থাৎ দেবতার নিকট ফলপ্রাপ্তির ইচ্ছা—সকলই বর্তমান রহিয়াছে। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলিকে পরবর্তী কালে সোমযাগ, রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ ও অগ্নিহোত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া তাহাদের বিনিয়োগ প্রদর্শন করা হইয়াছে।[১]

ঋগ্বেদ দশটি মণ্ডলে বিভক্ত পূর্বেই বলিয়াছি। ইহাদের মধ্যে ভাষা, ছন্দ ও দার্শনিক বিচারে, পাশ্চাত্ত্য ও আধুনিক মতে, কোন কোন অংশ সুপ্রাচীন, কোন কোন অংশ আবার অর্বাচীন। ঋষিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মণ্ডলগুলি (২-৭ মণ্ডল) প্রাচীন অংশ বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। ইহাদের ছন্দ ও ভাষা সুপ্রাচীন। সোমযজ্ঞের সহিত কোন পরিচয়ই এগুলিতে নাই। প্রথম, অষ্টম, নবম ও দশম মণ্ডলকে অর্বাচীন বলিয়া মনে করিবার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ আছে। অষ্টম মণ্ডল ঋষিগোষ্ঠী কর্তৃক দৃষ্ট মণ্ডল নহে। এই মণ্ডলে আর্ষ মণ্ডলের ন্যায় রচনাপ্রক্রিয়ায় কোন বিশিষ্ট নিয়ম রক্ষিত হয় নাই। নবম মণ্ডল সোম পবমানের স্তব-স্তুতিতেই পূর্ণ। এই সোম পবমানের স্তুতি থাকার জন্য, ঋগ্বেদকে পরবর্তী কালে যজ্ঞের সহিত সংশ্লিষ্ট করার চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। বৈদিক যজ্ঞের মধ্যে সর্বপ্রধান গুরুত্বপূর্ণ যাগ সোমযাগ। সামবেদের উদ্ভবও এই ঋগ্বেদের নবম মণ্ডল হইতে—ইহা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথম মণ্ডলও ভাষা ও ছন্দের ভিত্তিতে ঋগ্বেদের আদিম অংশ বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া, ঋগ্বেদের সহিত অন্যান্য যজ্ঞপ্রধান বেদের সামঞ্জস্য রাখিবার উদ্দেশ্যে

১। "Sacrifice in the Rigveda"—K. T. Potdar দ্রষ্টব্য।

ইহার কয়েকটি সূক্ত রচিত বলিয়া অনেকে মনে করেন। দশম মণ্ডল যে নিশ্চয়ই ঋগ্বেদের অর্বাচীন অংশ, ইহা অনেকেই একবাক্যে স্বীকার করেন। ডঃ বটকৃষ্ণ ঘোষ বলেন[১] যে দশম মণ্ডলের ভাষা, ছন্দ, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক সূক্তনিচয় ও যজ্ঞের সার্থকতা বা দেবতার সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ প্রভৃতি ইহার অর্বাচীনতা স্পষ্টতঃই প্রমাণ করিয়া দেয়। 'ক' সূক্তে "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ?" কিংবা দেবীসূক্তে যে সন্দেহ অথবা ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা করা হইয়াছে, ঋগ্বেদের অপর কোন মণ্ডলে এ তত্ত্ব বা সন্দেহ দেখিতে পাই না। দশম মণ্ডলে বর্ণিত সামাজিক অবস্থাও অন্যান্য মণ্ডলস্থিত সমাজের রীতিনীতি অপেক্ষা অনেক উন্নততর। এই মণ্ডলে জাতিভেদের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। দশম মণ্ডলের পুরুষ-সূক্তে বলা হইয়াছে যে বিরাট পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাহু হইতে রাজন্য, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মিয়াছিলেন।[২] পারিবারিক জীবনের পরিচয়ও কিছু কিছু পাওয়া যায়।[৩] এই বেদের অক্ষসূক্তে দ্যূতাসক্তের শোচনীয় পরিণতির অনুতাপের মধ্যে তৎকালীন সামাজিক কথাই নিহিত আছে।[৪] দশম মণ্ডলের ভাষা পরবর্তী ক্লাসিক্যাল যুগের ভাষার ন্যায়। ত্রিষ্টুপ্ জগতী প্রভৃতি ছন্দে ইহার অনেকগুলি সূক্ত রচিত। ছন্দের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বৃহদাকারের ছন্দ ভাষার উন্নতি এবং অগ্রগতি সূচনা করে। তাই, অনেকে এই মণ্ডলের ছন্দ বিচারে ইহাকে পরবর্তী কালে ঋগ্বেদের সহিত যুক্ত করা হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন।

প্রাচীন ও অর্বাচীন অংশ

ঋগ্বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। পৃথিবীর তমসাচ্ছন্ন যুগে ইহার আবির্ভাব। ডঃ ম্যাক্সম্যুলার তাঁহার "India : What can she teach us ?" গ্রন্থে ঋগ্বেদকে পৃথিবীর আদিম গ্রন্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিলেও ঋগ্বেদের অপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রন্থ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায় না।

পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ

১। Vedic Age, p. 339. ২। ঋগ্বেদ ১০।৯০।১২ ।৩। ঋগ্বেদ ১।২৪।১২-১৫ ; ৫।২।৭, ১।১১৬।১৩। ৪। ঋগ্বেদ ১০।৩৪।

সমগ্র ঋগ্বেদ পদ্যে রচিত। এই পদ্য বা ছন্দোবদ্ধ পদসমষ্টি সাধারণতঃ সাতটি প্রধান ছন্দে রচিত। ঋগ্বেদের ভাষা কবিত্বময় ও তাহার মধ্যে অনুপ্রাস, উপমা ও রূপক প্রভৃতি সরল শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের বিকাশ দেখা যায়। 'সর্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ', উপমার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। উষার বর্ণনা প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের ঋষিগণ যে অনুপ্রেরিত ছন্দ ও ভাষার অবতারণা করিয়াছেন, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা করিয়াছেন।[১]

সংহিতাপাঠ ও পদপাঠ

ঋগ্বেদের প্রতিটি সূক্তের সাধারণতঃ দুইটি করিয়া পাঠ পাওয়া যায়—সংহিতা-পাঠ ও পদপাঠ। সংহিতাপাঠে শব্দগুলি সংঘবদ্ধ আকারে সমাস, সন্ধি প্রভৃতির নিয়মানুসারে সজ্জিত দেখা যায়। পদপাঠে প্রত্যেকটি পদকে সন্ধি, সমাস প্রভৃতির নিয়ম হইতে বিযুক্ত করিয়া পৃথগাকারে পাওয়া যায়। উভয়ক্ষেত্রেই পদসমুচ্চয়কে উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, প্রচিত, কম্প প্রভৃতি স্বরসম্বলিত দেখা যায়। ঋগ্বেদের কয়েকটি সূক্ত মাত্র স্বরবিহীন অবস্থায় পাওয়া যায়। শাকল্য নামক ঋষি অতি প্রাচীনকালে এই পদপাঠ রচনা করিয়াছিলেন, অতএব ইহা পৌরুষেয়। কিন্তু নিরুক্তকার যাস্কেরও বহু পূর্ববর্তী এই শাকল্য। তাঁহার পদপাঠ ঋগ্বেদের পাঠোদ্ধারের একমাত্র উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।[২] পদপাঠ পূর্বে না সংহিতাপাঠ পূর্বে ইহা লইয়া যথেষ্ট বাদবিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। এখনও নিশ্চিতরূপে কিছুই স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে মনে হয় ঋষিগণ যে সকল মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন বা ধ্যানযোগে দর্শন করার পর তাঁহাদের মুখ হইতে যে সকল মন্ত্র নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়ই সংঘবদ্ধ ছিল, কারণ সাধারণ মানুষ কখনই সন্ধি বিযুক্ত করিয়া শব্দরাশি উচ্চারণ করে না। সংহিতাপাঠে সন্ধি ও সমাস সাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আসিয়াছে—ইহাদের জন্য বিশেষ কোন বৈয়াকরণ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় নাই। ভাষা আগে, তারপর ব্যাকরণ—এই মূলনীতি স্বীকার করিয়া লইলে ঋগ্বেদের পদপাঠ সংহিতাপাঠের পরবর্তী বলিয়া বিশ্বাস করিতেই হইবে।

১। ঋগ্বেদ ৪।৮০।৫,৬ ; ৬।৪৬।

২। পদপাঠের গুরুত্ব সম্পর্কে দ্রঃ On the Veda—Sri Aurobindo, p. 21.

পাণিনির বৈদিক প্রক্রিয়ার সূত্রাদির সাহায্যে সংহিতাপাঠকে পদপাঠে ও পদপাঠকে সংহিতাপাঠে পরিবর্তিত করা যায়।[১]

ঋগ্বেদীয় সংহিতাপাঠ যাহাতে উত্তরকালে বিকৃত না হইয়া যায় তাহার জন্য বৈদিক ঋষিগণ যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা ঐ উদ্দেশ্যে জটাপাঠ, ক্রমপাঠ ও ঘনপাঠের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। যেমন :—

সংহিতামন্ত্র

ওষধয়ঃ সংবদন্তেসোমেন সহ রাজ্ঞা।
যস্মৈকৃণোতিব্রাহ্মণস্তংরাজন্ পারয়ামসি॥ (ঋগ্বেদ ১০।৯৭।২২)

মন্ত্রপাঠ

ওষধয়ঃ সং বদন্তে সোমেন সহ রাজ্ঞা।
যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্ তং রাজন্ পারয়ামসি॥

পদপাঠ

ওষধয়ঃ। সং। বদন্তে। সোমেন। সহ। রাজ্ঞা।
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
যস্মৈ। কৃণোতি। ব্রাহ্মণঃ। তং। রাজন্। পারয়ামসি॥
৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

ক্রমপাঠ

ক্রমপাঠ, জটাপাঠ ও ঘনপাঠ

ওষধয়ঃ সং। সং বদন্তে। বদন্তে সোমেন। সোমেন সহ।
১ ২ ২ ৩ ৩ ৪ ৪ ৫
সহ রাজ্ঞা। রাজ্ঞেতি রাজ্ঞা॥
৫ ৬ ৬ ৬
যস্মৈ কৃণোতি। কৃণোতি ব্রাহ্মণঃ। ব্রাহ্মণস্তং। তং রাজন্।
৭ ৮ ৮ ৯ ১০ ১০ ১১

১ দুই একটি সূত্র যেমন :—'অনুদাত্তং পদমেকবর্জম্। উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিতঃ। স্বরিতাৎ সংহিতায়ামনুদাত্তানাম্। উদাত্তস্বরিতপরস্য সন্নতরঃ।'

রাজন্ পারয়ামসি। পারয়ামসীতি পারয়ামসি ॥

১১ ১২ ১২ ১২

জটাপাঠ

ওষধয়স্ সং, সমোষধয়, ওষধয়স্ সম্

১ ২ ২ ১ ১ ২

সং বদন্তে, বদন্তে সং, সং বদন্তে।

২ ৩ ৩ ২ ২ ৩

বদন্তে সোমেন, সোমেন বদন্তে, বদন্তে সোমেন।

৩ ৪ ৪ ৩ ৩ ৪

সোমেন সহ, সহ সোমেন, সোমেন সহ।

৪ ৫ ৫ ৪ ৪ ৫

সহ রাজ্ঞা, রাজ্ঞা সহ, সহ রাজ্ঞা ॥ রাজ্ঞেতি রাজ্ঞা ॥

৫ ৬ ৬ ৫ ৫ ৬ ৬ ৬

যস্মৈ কৃণোতি, কৃণোতি যস্মৈ, যস্মৈ কৃণোতি।

৭ ৮ ৮ ৭ ৭ ৮

কৃণোতি ব্রাহ্মণো, ব্রাহ্মণঃ কৃণোতি, কৃণোতি ব্রাহ্মণঃ।

৮ ৯ ৯ ৮ ৮ ৯

ব্রাহ্মণস্তং, তং ব্রাহ্মণো, ব্রাহ্মণ স্তম্।

৯ ১০ ১০ ৯ ৯ ১০

তং রাজন্, রাজংস্তং, তং রাজন্।

১০ ১১ ১১ ১০ ১০ ১১

রাজন্ পারয়ামসি, পারয়ামসি রাজন্, রাজন্ পারয়ামসি ॥

১১ ১২ ১২ ১১ ১১ ১২

পারয়ামসীতি পারয়ামসি ॥

১২ ১২

রাজ্ঞেতি রাজ্ঞা। সহ রাজ্ঞা। সোমেন সহ। বদন্তে সোমেন। সং বদন্তে। ওষধয়ঃ সং। সং বদন্তে। বদন্তে সোমেন। সোমেন সহ। সহ রাজ্ঞা। রাজ্ঞেতি রাজ্ঞা।

পারয়ামসীতি পারয়ামসি। রাজন্ পারয়ামসি। ত্বং রাজন্।
ব্রাহ্মণস্ত্বং। কৃণোতি ব্রাহ্মণঃ। যস্মৈ কৃণোতি। কৃণোতি ব্রাহ্মণঃ।
ব্রাহ্মণস্ত্বং। ত্বং রাজন্। রাজন্ পারয়ামসি। পারয়ামসীতি পারয়ামসি॥

সূত্র :—(ক) পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা (পাণিনি ১।৪।১০৯)

(খ) পদবিচ্ছেদোঽসংহিতঃ (কাত্যায়নীয় প্রাতিশাখ্য)

(গ) ক্রমেণ পদদ্বয়স্য পাঠঃ (" " ৪।১৮),

(ঘ) ক্রমে যথোক্তে পদজাতমেব দ্বিরভ্যসেদুত্তরমেব পূর্বম্।
অভ্যস্য পূর্বঞ্চ তথোত্তরে পদেঽবসানমেবং হি জটাঽভিধীয়তে।

(ঘ) অন্তাৎ ক্রমং পঠেৎ পূর্বমাদিপর্যন্তমানয়েৎ।
আদিক্রমং নয়েদন্তং ঘনমাহুর্মনীষিণঃ।'

পদপাঠের পর ক্রমপাঠ রচিত হয়। 'ঐতরেয় আরণ্যকে' ক্রমপাঠের উল্লেখ আছে। ইহাতে প্রত্যেক পদটি দ্বিরুক্ত হইয়াছে। পূর্বপদের সহিত পরপদ এবং পরপদের সহিত পরপদ সম্বদ্ধ হয়।

ঋগ্বেদের একটি নাম হৌত্রবেদ। ঋগ্বেদীয় পুরোহিতের নাম পরবর্তী কালে হোতা বলিয়া প্রচলিত হইয়াছিল। যজ্ঞে ঋগ্বেদীয় পুরোহিতের কাজ ছিল আহুতি দেওয়া বা সায়ণের অনুযায়ী মতান্তরে যজ্ঞস্থলে যজ্ঞের লক্ষীভূত দেবতাকে আবাহন করিয়া আনা। তাই

হোতার সহিত সম্বন্ধ

হোতার সহিত ঋগ্বেদ সংহিতার সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। হোতার প্রসঙ্গ ঋকের মধ্যেই আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন—কারণ 'অগ্নির্বৈ দেবানাং হোতা'। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তে অগ্নিকে হোতা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তিনিই যজ্ঞের দেবতা, হোতা ও ঋত্বিক্।

ঋগ্বেদের ব্যাখ্যাপদ্ধতি সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। ভিণ্টারনিৎস্ বলিয়াছেন, "অনেকগুলি স্থলের মধ্যে ঐটি একটি যেখানে ঋগ্বেদ-"ব্যাখ্যাকার'গণের মধ্যে পরস্পর যথেষ্ট মতানৈক্য ঘটিয়াছে।" আর একথা স্মরণ রাখা দরকার যে ঋগ্বেদের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা আজও পাওয়া

১ দ্রঃ সাতবালেকর : ঋগ্বেদ, পৃঃ ৮০৫-৮০৬।

যায় নাই এবং কোন কালে পাওয়া যাইবে কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অনেক ঋকেরই হয়ত নিশ্চিত ব্যাখ্যা পাওয়া দুষ্কর নহে, কিন্তু আবার এমন অনেক ঋক্‌ও আছে যাহাদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ উপস্থিত হয়। কেন এমন হয় সে সম্বন্ধে ভিণ্টারনিৎস্ বলেন, "তাহার কারণ এই সূক্তগুলির সুপ্রাচীনতা। অতি প্রাচীনকালে ভারতীয়গণের নিকটেই উহারা দুর্বোধ্য হইয়া উঠে।" বৈদিক সাহিত্যের যুগেই ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রের অর্থ রহস্যময় ও দুর্বোধ্য হইয়া গিয়াছিল। অতি প্রাচীন কালে ভারতীয় মনীষিগণ নিঘণ্টু বা বৈদিক শব্দসমুদায়ের সাহায্যে ঋগ্বেদের মন্ত্রার্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাস্কই ঋগ্বেদের প্রথম ব্যাখ্যাতা। নিরুক্তের মধ্যে বহুস্থলে তিনি তৎকালেই দুর্বোধ্য ঋক্‌গুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যাস্কের পরবর্তী অনেক ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যাই পাওয়া যায় না। বিজয়নগর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আচার্য সায়ণ ঋগ্বেদের অন্বয়মুখ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাই বিখ্যাত সায়ণভাষ্য। উইল্‌সন্ তাঁহার ঋগ্বেদ-অনুবাদে সায়ণকে অনুসরণ করিয়াই উহার অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণ অনেকেই কিন্তু ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করিয়াছেন। রুডল্‌ফ রোট্ ও এইচ্ গ্র্যাসম্যান্ লুড্‌উইগ তাঁহাদের অন্যতম। আবার অনেক গবেষক ঋগ্বেদের ব্যাখ্যার বিষয়ে মধ্যপন্থী। গেল্‌ড্‌নার ও পিশেল তাঁহাদের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। "আমরা কিছুতেই দেশীয় ব্যাখ্যাতৃগণকে অনুসরণ করিব না—একথা স্বীকার করা সত্ত্বেও তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে দেশীয় লেখকেরা অন্তত কিছু পরিমাণেও সনাতন চিন্তাধারার অনুবর্তন করিয়াছেন এবং সেজন্যই তাঁহাদের অগ্রাহ্য করা অনুচিত; আবার ভারতীয় বলিয়াই এবং তাছাড়াও, ভারতীয় পরিবেশের সঙ্গে প্রতীচীর পণ্ডিতবর্গ অপেক্ষা তাঁহাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হওয়ায় তাঁহারা অনেক সময়েই নির্ভুল অর্থ করিতে পারিয়াছেন।"

ঋগ্বেদ-ব্যাখ্যার পদ্ধতি

ঋগ্বেদ তথা অন্যান্য বেদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রণালী প্রচলিত। তন্মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ সাধারণভাবে বৈদিক সাহিত্যকে অনুপ্রেরিত দৈববাণী বলিয়া

১। H I L p. 68 ; দ্রঃ বেদ মীমাংসা—অনির্বাণ; আরকথন—On the Veda—Sri

মনে করিয়াছেন। তাই তিনি বৈদিক সাহিত্যের তথা গ্রন্থের সাংকেতিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পণ্ডিত কপালী শাস্ত্রীও ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা অরবিন্দ মতানুসারেই করিয়াছেন।[১] স্বামী দয়ানন্দ (আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা) নূতনভাবে বেদের ব্যাখ্যা ও বেদচর্চা আরম্ভ করেন এবং তাঁহার ব্যাখ্যায় এক অভিনবপন্থায় বৈদিক সাহিত্যের মূলতত্ত্বগুলির আলোচনা হয়। অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় সীতারাম শাস্ত্রী সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের সূর্যপরত্বে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[২] তাঁহার মতে অতি প্রাচীনকাল হইতেই বেদে সূর্যই একমাত্র দেবতা রূপে স্তুত হইয়াছেন, এই ধারণা প্রচলিত ছিল। গণিত ও জ্যোতিষের সাহায্যে তিনি নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করিয়াছেন যে সূর্যই একমাত্র দেবতা। সূর্যের বিভূতি তিন প্রকার:—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। জ্যোতিষ্মান্ পদার্থের মধ্যে সূর্যই বৃহত্তম ও প্রত্যক্ষ দৃশ্য। তিনি হিরণ্ময় পাত্র। তিনিই সত্য বা ধ্রুবলোকের পথ আচ্ছন্ন করিয়া থাকেন ইত্যাদি। 'ঐতরেয় আরণ্যকে'র বিভিন্ন স্থলে সূর্যপরত্বে বৈদিক ঋষি, ছন্দ প্রভৃতির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।[৩]

ঋগ্বেদে উত্তরকালের কাব্য, নাটক, দর্শন প্রভৃতির পূর্বাভাস দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্তী সংস্কৃতে ক্লাসিকাল যুগের যে কাব্যগুলি তাহাদের মধ্যে অনেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঋগ্বেদ এবং বৈদিক সাহিত্যের কাছে ঋণী। এই সমস্ত কাব্য, পুরাণ প্রভৃতিতে যে সকল অলৌকিক কাহিনী বা রসঘন রহস্যের অবতারণা করা হইয়াছে তাহার সূচনা ঋগ্বেদে।[৪] পরবর্তী যুগে যে সকল কিংবদন্তী উপাখ্যান সৃষ্ট হইয়াছে সে সম্পর্কে ভিণ্টারনিৎস্ বলেন, "আমাদের নিকট এই সূক্তগুলি মূল্যবান বলিয়া বোধ হওয়ার কারণ এগুলিতে আমরা একটি নির্মীয়মাণ দেবতত্ত্বের বিকাশ দেখিতে পাই (পৃঃ ৭৫)।" সত্যই দেখা যায়, পরবর্তী যুগের কাহিনীগুলিতে সূর্য, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, যম, অগ্নি, অদিতি, পৃথিবী প্রভৃতিকে লইয়া যে সকল মনোরম উপাখ্যান

১। Lights on the Veda. ২। Indian Research Institute, Vol 1, Introduction এবং 'বেদার্থবিচার'—ম. ম. সীতারাম শাস্ত্রী সম্পাদিত। ৩। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লেখককে জানাইয়াছেন যে 'মিত্রাবরুণ'কে কেহ কেহ H_2O অর্থাৎ জল বলিয়াও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ৪। দ্রঃ 'Rigvedic legends through the ages'.

সৃষ্ট হইয়াছিল, সেই সকল উপাখ্যানের নায়ক নায়িকা ঋগ্বেদের যুগেই ঋষিগণের মানসচক্ষে আবির্ভূত হইয়াছেন যেমন সীতা এই বেদের চতুর্থ মণ্ডলে দেখা দিয়াছেন।[১] দৃশ্যকাব্য বা নাটকের উপরে ঋগ্বেদের প্রভাব সুপরিস্ফুট। ঋগ্বেদীয় সংবাদ বা আখ্যান সূক্তকে (যেমন যম-যমী সংবাদ, পুরূরবা-উর্বশী সংবাদ ইত্যাদি) কেন্দ্র করিয়া অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার[২] দৃশ্যকাব্যের মূল অন্বেষণ করিবার জন্য যে আখ্যানমত প্রচার করিয়াছিলেন তাহা কিয়ৎ পরিমাণে আজও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ওল্ডেনবার্গের মতে ঋগ্বেদ হইতে কবিতা ভাগ নাটকের মধ্যে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। 'আখ্যান-মতে' ঋগ্বেদের গদ্যাংশ কালক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কবিতাভাগ মাত্র অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই মত অবশ্য বিচারসহ নহে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে দার্শনিক মতবাদের অস্পষ্ট পূর্বাভাস পাওয়া যায়। নিরুক্তকার হিরণ্যগর্ভ ও দেবী প্রভৃতি সূক্তকে আধ্যাত্মিক সূক্ত বলিয়াছেন। পুরুষসূক্তে বিরাট পুরুষের আবির্ভাব ও তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে চতুর্বর্ণের সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। দৈর্ঘতমস সূক্তে বহু দার্শনিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বৎসর যে ছয়ঋতুসমন্বিত ও দ্বাদশমাস-বিশিষ্ট—ইহার সুস্পষ্ট ধারণা এই সূক্তে আছে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে সূর্যকে স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক বিশ্বের আত্মা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে—"সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ"। এই মত আরণ্যক ও উপনিষদে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। ঐতারেয়ারণ্যকে ঋষিগণের নামও সূর্যপরত্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেজন্য অনুক্রমণিককার বলিয়াছেন—"একৈব বা মহানাত্মা দেবতা স সূর্য ইত্যাচক্ষতে স হি সর্বভূতাত্মা"। অর্থাৎ সমগ্র বেদে দেবতা মাত্র একটিই আছেন, তিনি সূর্য, তিনি সর্বভূতের আত্মস্বরূপ। প্রথম মণ্ডলের আর এক স্থলেও একদেবতাবাদ ধ্বনিত হইয়াছে—"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ"[৩]। হিরণ্যগর্ভসূক্তে কোন্

ঋগ্বেদে উত্তরকালের কাব্যনাটকের উপাদান

১। ৪।৫৭।৬

২। লেখক তাঁহার গবেষণা "Germs of Philosophy in Vedic Literature"-এ এই মত প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

৩। ১।১৬৪।৪৬

দেবতাকে পূজা করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। সায়ণ "ক" শব্দের অর্থ প্রজাপতি ধরিয়াছেন। প্রজাপতি শব্দের অর্থ ব্রহ্মা।[১]

ভিণ্টারনিৎস্‌ বলেন, "ঋগ্বেদে প্রায় বারটির কাছাকাছি সূক্ত আছে সেগুলিকে আমরা দার্শনিক সূক্ত বলিতে পারি। সেখানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং সৃষ্টিরহস্য আলোচনার প্রসঙ্গে বিশ্বের সহিত একীভূত বিশ্বাত্মা সম্পর্কে মহৎ সর্বেশ্বরবাদের সর্বপ্রথম পরিচয় মিলিবে[২]। আর ঐ ধারণাটি তখন হইতেই সমগ্র ভারতীয় দর্শনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।"[৩] "These philosophical hymns form, as it were, a bridge to the philosophical speculations of the Upanisads."

ঋগ্বেদে দেবতার সংখ্যা এবং তাঁহাদের রূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করার প্রয়োজন। "দেব" শব্দের অর্থ কি প্রথমতঃ তাহাই দেখা যাক্‌। 'নিরুক্ত'কার বলেন, "দেবো দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানো বা ভবতি।"[৪] দীপ্তিমান্‌ যিনি তিনিই দেবতা। যিনি মুক্তহস্তে দান করেন তিনিই দেবতা। সূর্য, চন্দ্র ও দ্যৌঃ দেবতা, কারণ তাঁহারা সমস্ত বিশ্বকে আলো দান করেন। ডঃ রাধাকৃষ্ণনের মতে "মানুষের মনের কারখানায় দেবতাসৃষ্টির প্রক্রিয়া ঋগ্বেদে যেমন অতি সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, এমনটি আর অন্য কোথাও যায় না।"[৫] বৈদিকযুগের প্রাচীনতম মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মন প্রকৃতির উন্মাদয়িতৃ রূপ দেখিয়া উল্লাসে নাচিয়া উঠিত। প্রকৃতির মধ্যে তাঁহারা প্রাণের স্পর্শ অনুভব করিতেন। প্রকৃতিকে ভালবাসা ও তাহার সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করার অর্থ যে কি ঋষিগণ তাহা ভালভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। "তাঁহাদের কাছে প্রকৃতি ছিল একটি জীবন্ত সত্তা; তাহার সঙ্গে তাঁহারা সদালাপ এবং কথোপকথন করিতে পারিতেন। প্রকৃতির কয়েকটি গৌরবময় দিক্‌ স্বর্গের গবাক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল—তাহাদের মাধ্যমে দেবতা ঈশ্বরবর্জিত জগতের দিকে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন।"[৬]

দেবতা

১। ১০।১২১; ঋগ্বেদে দার্শনিকতত্ত্ব সম্বন্ধে দ্রঃ History of Philosophy: Eastern and Western, Vol. I, pp. 71-63, 80-105

২। পৃ. ৯৭ ৩। পৃ. ১০০ ৪। ৭।১৫ ৫। Radhakrishnan, Indian Philosophy Vol. I, p. 73 ৬। ঐ p. 73

বৈদিক যুগের দেবতার আবেস্তীয় যুগের দেবতার সহিত বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ডাঃ মিলস্ বলেন, "মহাকাব্যের সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বৈদিক ভাষার যে মিল, তাহার অপেক্ষা বেশী মিল বেদের সঙ্গে আবেস্তার।" ঋগ্বেদের 'সুর' বা দেবতা আবেস্তায় 'অসুর' আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদের 'মিত্র' আবেস্তায় 'মিথ্র'। ঋগ্বেদের 'সোম' আবেস্তায় 'হাউমো'।[১] সেই সুপ্রাচীন যুগে মানবমনে অসীম আকাশের ন্যায় অন্য কিছুই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। আকাশ অনাদি, অনন্ত, অসীম; চিরন্তন কাল ও নিরুপাধিক ব্রহ্মের প্রতিমূর্তি। পৃথিবীও মানবজীবনের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন; তিনি ধরিত্রী, তিনি ধাত্রী। তাই তিনিও দেবতারূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। দিবস্পৃথিবী, দ্যাবাপৃথিবী শুধু ঋগ্বেদে কেন পরবর্তী যুগেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

বরুণ আকাশের দেবতা; √বৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন এই নামের অর্থ সমস্ত জিনিসের আবরক। তিনি বিশাল আকাশকে সমাবৃত করিয়া আছেন। মিত্র তাঁর নিত্যসঙ্গী। ঋগ্বেদের শেষভাগে বরুণকে আমরা নিষ্ঠাবান্ নৈতিক নিয়মাবলীর দেবতা হিসাবে দেখি। তিনি অলক্ষ্যে জগৎ পর্যবেক্ষণ করেন, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন। অপরাধী দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি ক্ষমা করেন। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল বলেন, "বরুণের চরিত্রের সঙ্গে উন্নতধরণের একেশ্বরবাদে উপলভ্য স্বর্গীয় 'শাসকে'র মিল দেখা যায়।"[২]

বরুণ ঋতের রক্ষক। ঋত শব্দের অর্থ ধর্ম, নিয়ম, বিচার। 'ঋত' বলিতে ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম বা শৃঙ্খলাকে বুঝায়। বরুণ এবং মিত্র 'আদিত্য' নামেও প্রসিদ্ধ।

সূর্যই সবিতা। তিনি দশটি সূক্তে স্তুত হইয়াছেন। প্লেটো তাঁহার Republic গ্রন্থে সূর্য-পূজার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সূর্য মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষুঃ স্বরূপ। তিনি জগতের স্রষ্টা ও বিধাতা। তিনি মানুষের পাপপুণ্যের সাক্ষী।[৩] সবিতাও একজন সৌর দেবতা। তিনি একাদশটি সূক্তে স্তুত হইয়াছেন। সবিতা শুধু দিবসের সূর্যই নহেন, তিনি রাত্রিরও

১। দ্রঃ 'জরথুশ্‌ত্রধর্ম'—যোগীরাজ বসু।
২। Vedic Mythology, p. 3.
৩। ঋগ্বেদ ৭।৬০।

সূর্য। আমাদের বহুপঠিত পবিত্র গায়ত্রী সবিতারূপ সূর্যেরই স্তব, "আসুন আমরা সবিতার সেই বরেণ্য তেজঃপুঞ্জের ধ্যান করি; তিনি আমাদের অন্তর উদ্ভাসিত করুন"।[১]

বিষ্ণুরূপী সূর্য ত্রিজগৎ ধারণ করিয়া আছেন।[২] তিনি ত্রিপাৎ। ঋগ্বেদে বিষ্ণুর স্থান গৌণ। ঋগ্বেদের ১।১৫৫ ও সূক্তে বৈষ্ণবধর্মের ভিত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

পূষন্ আর এক সৌর দেবতা। তিনি মানবের উপকারী সুহৃৎ এবং পথ ও পশুর রক্ষক। তিনি দন্তবিহীন, পশুপালক এবং পথভ্রষ্টের রক্ষক ও দেবতা।

প্রভাতকালই ঋগ্বেদে দেবী উষার স্থান লাভ করিয়াছে। বাস্তিনের মতে উষাকালের প্রভাব মানবমনের উপর অপরিসীম। "যাহা হইতে প্রতিদিন প্রাতে আলোক এবং জীবন উজ্জ্বল হইয়া উঠে সেই অসীম উষাই দেবী উষা হইলেন। তিনি প্রভাতের অনূঢ়া কন্যা। অশ্বিদ্বয় এবং সূর্য তাঁহার প্রেমিক; অথচ সূর্য তাঁহাকে সোনালি রশ্মি দ্বারা আলিঙ্গন করার পূর্বেই তিনি তাহার সম্মুখেই অদৃশ্য হইয়া যান।"[৩] (রাধাকৃষ্ণন)

অশ্বিদ্বয় প্রায় পঞ্চাশটি সূক্তে স্তুত হইয়াছেন। তাঁহারা যমজ ও উজ্জ্বল তেজঃপুঞ্জের আধার, চিরসুন্দর ও চিরযুবা, দেববৈদ্য এবং দ্রুতগামী। "গোধূলির আবির্ভাবকেই তাঁহাদের প্রাকৃতিক ভিত্তি বলিয়া ধরা হয়। সেকারণেই আমরা উষা এবং গোধূলির প্রতিরূপ দুইজন অশ্বীকে পাইয়াছি।' মিত্র, বরুণ, সূর্য, বিষ্ণু, পূষা, ভগ, অশ্বিদ্বয় প্রভৃতি সকলেই সৌরদেবতা। নিরুক্তকারও এই মতই সমর্থন করিয়াছেন।

অদিতি দ্বাদশ আদিত্যের জননী। অদিতি শব্দের অর্থ অনন্ত বিস্তার বা অসীমতা। অদৃশ্য শক্তির অধিকারিণী এই দেবতা। ইনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্ত শক্তির আধার। ইনিই আকাশ। "অদিতিই আকাশ, অদিতিই অন্তরিক্ষ, অদিতিই পিতা, মাতা ও পুত্র, অদিতিই বিশ্বদেবগণ, অদিতিই পঞ্চজন, যাহা কিছু জাত, যাহা কিছু জনিষ্যমাণ—সবই অদিতি।"[৪] সাংখ্যদর্শনে ইনি 'প্রকৃতি' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন।

প্রকৃতিপূজার একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত অগ্নি। ইন্দ্রের পরেই ঋগ্বেদের দেবগণের মধ্যে অগ্নির স্থান। ন্যূনাধিক দুইশত সূক্তে ইনি স্তুত হইয়াছেন।

১। ১।১৫৪।১-২ ২। ১।১৫৪,১-২ ৩। Indian Philosophy. Vol. I ৪। ঐ ৫।১।৮৯।

ইনি দেবগণের হোতা। "অগ্নিমুখা বৈ দেবা" অর্থাৎ দেবগণ অগ্নির মুখে বা মাধ্যমে ভোজন করেন। যে সূর্য তাঁহার উত্তাপের দ্বারা দাহ্য পদার্থকে প্রজ্বলিত করেন, সেই সবিতা হইতেই অগ্নির কল্পনা জন্মলাভ করে।"[১]

সোমদেব আর্যদের প্রিয়তম দেবতা। ইনি অমরত্ব দান করেন, মানব মনে প্রেরণা জাগাইতে পারেন। "যাহাকে আমরা আত্মিক দর্শন, সহসা আলোকপ্রাপ্তি, গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি, মহত্তর বদান্যতা এবং ব্যাপকতর বোধ বলিয়া থাকি, সে সবগুলিই আত্মার অনুপ্রেরিত অবস্থার সহচরী। সেজন্য যে পানীয় কল্পনা উদ্দীপিত করিত, তাহা অনায়াসেই দেবতায় পরিণত হইল।" সোমরস আর্যদের মস্তিষ্কে ও কল্পনায় অগ্নি সঞ্চার করিত, তাঁহারা ইহজগতের দুঃখ, ক্লান্তি, বেদনা ও জড়তা অন্তত ক্ষণকালের জন্যও ভুলিয়া যাইতেন।

যম মৃত্যু ও মৃতের দেবতা। তিনি বিবস্বানের পুত্র। ঋগ্বেদে তিনটি সূক্তে তাঁহার কথা বলা হইয়াছে। তিনি মৃতের সম্রাট্। তিনিই প্রথম দেহত্যাগ করেন এবং পিতৃলোকে তিনিই সর্বপ্রথম গমন করেন। তিনিই প্রেতলোকের অধিপতি।

পর্জন্য আকাশের দেবতা। বাত বা বায়ু মানবের মনে ভয় সঞ্চার করেন। মরুৎগণও অনুরূপ স্বভাববিশিষ্ট।

ইন্দ্রই বেদের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দেবতা। ভারতে আর্যগণ প্রবেশ করিয়াই বুঝিতে পারেন যে এদেশের সবকিছুই নির্ভর করে উপযুক্ত বর্ষণের উপর। তাই বৃষ্টির দেবতা স্বভাবতই :আর্যগণের জাতীয় দেবতারূপে সম্মানিত হন। ইন্দ্র অন্তরিক্ষের দেবতা। "এই বীরদেবতা সর্বোচ্চ ঐশী-গুণাবলীতে বিভূষিত হইলেন; আকাশ, পৃথিবী, জলরাশি এবং পর্বতরাজির উপর শাসনের ক্ষমতা পাইলেন এবং ধীরে ধীরে বৈদিক দেবজগতের সর্বময় কর্তৃত্ব হইতে বরুণকে সরাইয়া দিলেন।" (রাধাকৃষ্ণন) ঋগ্বেদের সজনীয় সূক্তে ইন্দ্রের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।[২] তিনি আর্যগণের যুদ্ধেরও দেবতা।

ইহা ছাড়া, সিন্ধু, প্রভৃতি নদনদী, সরস্বতী, বাক্, অদিতি, উষস্, রাত্রি,

---

১। [illegible]

পৃথিবী প্রভৃতি দেবীগণ ঋগ্বেদে স্তুত হইয়াছেন। ঋগ্বেদের দেবতা সম্বন্ধে গবেষণামূলক আলোচনা করিয়াছেন ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ।[১]

ঋগ্বেদের যুগে যে সকল দেবতার সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে, তাঁহারা কি করিয়া উদ্ভূত হইয়াছিলেন, সে সম্পর্কে ভিণ্টারনিৎস্ বলেন যে এই দেবগণ যেন ধীরে ধীরে ঋষিগণের মানসনেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। প্রচণ্ড মার্তণ্ড, স্নিগ্ধ চন্দ্রমা, দীপ্তিমান্ অগ্নি, হাস্যময়ী ঊষা, অনন্ত আকাশ, চপলা বিদ্যুৎ, ক্ষমাশীলা ধরিত্রী, নদনদী, সাগর, গ্রহনক্ষত্রতারকা—এই সকল প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীই স্তুত, পূজিত ও আহূত হইয়াছেন। অতি ধীরে ক্রমশঃ ঋগ্বেদে প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ দেবতার রূপ গ্রহণ করিয়াছে। সূর্য, সোম, চন্দ্র, অগ্নি, দ্যৌঃ, মরুদ্‌গণ, বায়ু, অপ্, উষস্, পৃথিবী প্রভৃতির নাম ইহাদের আদি স্বভাবের দ্যোতনা করে। রাধাকৃষ্ণন বলিয়াছেন—"জগতের সর্বত্র অনুন্নত মানুষের ধর্মে দেবতায় মনুষ্যরূপাদির আরোপ ঘটিয়াছে।······ অতএব আমরা আমাদের মননক্রিয়াকেই কল্পনা করি এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে তাহাদের অমূর্ত কারণাবলীর সাহায্যে ব্যাখ্যা করিয়া থাকি।"[২]

ঋগ্বেদের যুগে আমরা মাত্র তেত্রিশটি দেবতার সন্ধান পাই। পৌরাণিক যুগে এই তেত্রিশ দেবতাই শেষ পর্যন্ত সম্ভবতঃ তেত্রিশ কোটি দেবতাতে পরিণত হইয়াছেন বলিয়া অনেকের ধারণা। নিরুক্তকার যাস্কও এই সকল দেবতার সংবাদ জানিতেন। যাস্ক ঋগ্বেদের দেবতাসমূহকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাই তিনি বলিয়াছেন—তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ। অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো, বায়ুর্বেন্দ্রো বা অন্তরিক্ষস্থানঃ, সূর্যো দ্যুস্থানঃ। তাসাং মাহাভাগ্যাদেকৈকস্যা অপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি। অপি বা কর্মপৃথক্ত্বাৎ।[৩] অর্থাৎ ঋগ্বেদে দেবতা আসলে তিনটি বা তিনজন। তাঁহাদের উপাধিভেদে বা কর্মভেদে তাহারা বিভিন্ন দেবতা বলিয়া প্রতিভাত হন। দেবগণ ভূলোক, দ্যুলোক এবং অন্তরিক্ষলোকের অধিবাসী। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ঋগ্বেদের শাখা একুশটি বলিয়া জানিতেন।

ঋগ্বেদের শাখা

ইদানীং কিন্তু মাত্র দুইটি পাওয়া যায়—(১) শাকল (২) বাষ্কল।

১। পৃঃ ৭৩।

২। Studies on Rigvedic Deities in their astronomical and meteoro-

তিন

সামবেদ

ম্যাক্সমূলার সংহিতাযুগের সময় নির্ধারিত করিয়াছেন কমপক্ষে আনুমানিক ১২০০-১০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ। ভিন্টারনিৎসের মতে সংহিতা-যুগ আনুমানিক ২৫০০-২০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ। সামবেদ সংহিতা নিশ্চয়ই ঋগ্বেদ সংহিতার পরবর্তী। কিন্তু ইহা সংহিতাযুগেই রচিত হইয়াছিল। সামবেদের কোন কোন অংশ ঋগ্বেদ অপেক্ষাও অতি প্রাচীন।[১]

সংকলনকাল

সামবেদ দুইভাগে বিভক্ত—পূর্বার্চিক ও উত্তরার্চিক, "প্রকৃত সামবেদ অর্থাৎ আর্চিক কেবল ৫৮৫টি 'যোনি'র সংকলন মাত্র। পূর্বার্চিক আরণ্যক-সংহিতা ও উত্তরার্চিক লইয়াই মূল সামবেদ। গ্রামগেয়গান, অরণ্যগেয়গান, উহগান এবং উহ্যগান উহার দ্বিতীয় ভাগ।[২] পূর্বার্চিকে কেবল যোনি বা শ্লোকগুলি আছে। এই যোনির প্রত্যেকটির সঙ্গে একটি সাম বা সুর (melody) সংযোজিত হইয়াছে। সেই সাম আবার যে ঋষির আবিষ্কার তাঁহার নামানুসারে তাহার নামকরণ হইয়াছে। এই সামগুলি গ্রামগেয়গান এবং অরণ্যগেয়গান খণ্ডে পাওয়া যায়। পূর্বার্চিকের যোনিগুলি তিন অংশে বিভক্ত :—১-১১৪ শ্লোকে অগ্নির আবাহন আছে। ১১৫-৪৬৬ শ্লোকে ইন্দ্র স্তুত হইয়াছেন এবং ৪৬৭-৫৮৫ শ্লোকে সোম পবমানের স্তব আছে। উত্তরার্চিকে প্রায়ই তৃচ ও প্রগাথ শ্লোক দেখা যায়। তৃচ শব্দের অর্থ তিনটি ঋক্ বা মন্ত্রের সমষ্টি। আর প্রগাথ দুইটি মন্ত্রের সমষ্টি। উত্তরার্চিক খণ্ডে কখনই একটি মন্ত্রকে একাকী দেখিতে পাওয়া যায় না। সামবেদের প্রায় সমস্ত মন্ত্রই ঋক্‌সংহিতা হইতে গৃহীত।

আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু

---

[১] 'স্তোভ' প্রভৃতি গানের অংশ প্রাগৈতিহাসিক।

ঋক্ মন্ত্রের উপর সুর বসাইয়া সামসঙ্গীত গীত হইত।[১] উদ্গীথ কথাটি সামসঙ্গীতেরই অপর একটি নাম। বৈদিক যজ্ঞগুলিতে যে পুরোহিত সামগান করিতেন তাঁহার নাম উদ্গাতা। সাহিত্যিক মূল্য এই বেদের বিশেষ না থাকিলেও শ্রৌত যজ্ঞ প্রভৃতিতে ইহা একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ।

উদ্গাতা, ঋগ্বেদের সহিত সম্বন্ধ

সামবেদের প্রধান সার্থকতা গানেই। সামসংহিতা মূলতঃ কতকগুলি গানেরই সমষ্টি। নানাপ্রকার সুরের কথা এবং চিহ্ন আমরা সামবেদে বা সামসংহিতায় দেখিতে পাই। এখনও দাক্ষিণাত্যের সামবেদী ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণ নির্ভুল-ভাবে এই সংগীত অভ্যাস করিয়া থাকেন।

গানেই প্রধানতঃ সার্থকতা

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে সামবেদ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। সঙ্গীতের ইতিহাসের আদিম অধ্যায় সামসঙ্গীত ও তাহার বিশ্লেষণ। এই যে melody বা যোনিগত সুরের কথা ও দৃষ্টান্ত সামবেদে আছে ও যে সপ্ত সুরের সৃষ্টি এই বেদে দেখা যায়, তাহাই পরবর্তী যুগে পল্লবিত আকারে সঙ্গীতের বিশাল ধারার সৃষ্টি করিয়াছে। পৃথিবীর সঙ্গীতের ইতিহাসেও সামসঙ্গীত সম্ভবতঃ আদিম অধ্যায়েরই সূচনা করে। ঋক্‌সংহিতায় আমরা দেখি উদাত্ত-অনুদাত্তাদি স্বরের প্রাধান্য, সামসংহিতায় কিন্তু ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি সুরের প্রাধান্য।

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে ইহার স্থান

বৈদিকযুগে যজ্ঞকর্ম ব্যতীত সামবেদের কোন সার্থকতা না থাকিলেও পরবর্তীযুগে চারিবেদের মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছে। গীতার দশম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"বেদানাং সামবেদোঽস্মি।"[২] গদ্য বা কবিতার অপেক্ষা গানের সম্মোহনী শক্তি অনেক বেশী বলিয়াই হয়ত সামবেদ পরবর্তীযুগে নিজের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ইহার সম্বন্ধে গীতা

ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি সপ্তসুরের সৃষ্টি সামসংহিতার যুগেই

১। সামবেদকে ঋগ্বেদের একটি অতিপ্রাচীন আংশিক রূপ বলা হয়, কারণ ইহার প্রায় সব

হইয়াছিল। সামসঙ্গীতের এই স্তোত্রগুলি বৈদিকযুগে বিশেষ হেয় ছিল। কুকুরের চীৎকারের সহিত এই স্তোভের' তুলনা সে যুগে করা হইয়াছে।

স্তোভ—আর্যদের উহার বিরুদ্ধে স্বাভাবিক অশ্রদ্ধা

বৈদিকযুগে সামবেদ যে "ত্রয়ী"র মধ্যে নিকৃষ্ট ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সভ্যতা বা ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গীতে কিন্তু সামবেদের বিশেষ সার্থকতা আছে। ভারতীয় যজ্ঞ, ইন্দ্রজাল ও গানের ইতিহাসে ইহা একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

সভ্যতা ও ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহার সার্থকতা

সামবেদের একসহস্রটি শাখা ছিল, পুরাণে এইরূপ বলা হইয়াছে। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—সহস্রবর্ত্মা সামবেদঃ। ইহাদের মধ্যে আমরা মাত্র তিনটি শাখার সন্ধান পাই। তাহাদের মধ্যে সর্বজনবিদিত হইতেছে সামবেদের কৌথুমীয় শাখা। ইহাই বর্তমানে প্রসিদ্ধ সামসংহিতা।

শাখা

চার

যজুর্বেদ

যজুর্বেদের দুইটি রূপ দেখা যায়—শুক্ল ও কৃষ্ণ। শুক্ল যজুর্বেদের সমগ্র অংশই পদ্যে রচিত। কৃষ্ণ যজুর্বেদ কেবল গদ্য।

ইহার দুই রূপ: শুক্ল ও কৃষ্ণ

শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুইভাগে যজুর্বেদ অতি প্রাচীনকালেই বিভক্ত হইয়াছিল। বেদব্যাস বেদকে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া স্বীয় শিষ্য পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ ও সুমন্তকে অথর্ববেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন।[২] কি করিয়া বৈশম্পায়নকে প্রদত্ত যজুর্বেদ পুনরায় দ্বিধাবিভক্ত হইল সে সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে।

দ্বিধা বিভক্ত হওয়ার আখ্যান

"বৈশম্পায়ন-শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য অত্যধিক বিদ্যাভিমানের ফলে গুরুকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া লব্ধ বেদবিদ্যা উদ্গীরণ করেন এবং উপাসনা দ্বারা সূর্যকে

তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পুনরায় বেদ গ্রহণ করেন। ইহাই শুক্ল যজুর্বেদ। যাজ্ঞবল্ক্যের দ্বারা পরিত্যক্ত বেদ কৃষ্ণযজুর্বেদ নামে পরিচিত। বৈশম্পায়নের অপর শিষ্যগণ তিত্তিরিপক্ষিরূপে উক্ত পরিত্যক্ত বেদকে পুনর্গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উহা তৈত্তিরীয় নামেও প্রসিদ্ধ।"[১]

বিভিন্ন শাখা

যজুর্বেদের অনেকগুলি শাখা আছে। পাণিনি একশত শাখার নাম করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ পাঁচখানি—কাঠকসংহিতা, কপিষ্ঠল-কঠসংহিতা, মৈত্রায়ণী সংহিতা, তৈত্তিরীয়সংহিতা ও বাজসনেয়ী সংহিতা। ইহাদের মধ্যে শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতার কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন—এই দুইটি রূপ আছে।

সংকলনকাল

যজুর্বেদের সংকলনকাল সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় না। তবে নিঃসংশয়ে ইহা যে ঋগ্বেদের পরবর্তী, ভৌগোলিক বিবরণ, আর্যসভ্যতাবিস্তার, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিচয় ও যাগযজ্ঞ প্রভৃতির প্রাধান্য দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। যজুর্বেদ সংহিতাযুগেই সৃষ্ট হইয়াছিল এবং কালনির্ণয়ের দিক হইতে ঋগ্বেদের রচনাকালের কিছু পরেই ইহা রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

যজ্ঞযজ্ঞ

যজুর্বেদের বর্ণনীয় বিষয় বিভিন্ন শ্রৌতযজ্ঞ। কোন্ যজ্ঞ কোন্ তিথিতে কিরূপ অবস্থায় কিভাবে কাহার দ্বারা করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও বিশদ নির্দেশ এই বেদের সংহিতাগুলিতে আছে। ইহাকে সায়ণ 'আধ্বর্যব বেদ' বলিয়াছেন। যজুর্বেদের পুরোহিতের নাম অধ্বর্যু। তিনিই যজ্ঞের কর্তা। এই কারণেই সায়ণ প্রথমে যজুর্বেদের ভাষ্য লিখিতে আরম্ভ করেন, কারণ "যজ্ঞার্হত্বাদ্ যজুর্বেদস্যৈব প্রাধান্যম্।"[২] বাজসনেয়িসংহিতা যজুর্বেদের শাখাগুলির মধ্যে সর্বশেষ রচিত হইয়াছিল, সেজন্য বাজসনেয়িসংহিতায় যজুর্বেদের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। ভিণ্টারনিৎস্ তাঁহার *History of Indian Literature*) Vol. I-এ বাজসনেয়ী সংহিতার একটি পূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন। এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। যজুর্মন্ত্রের সাহিত্যিক মূল্য কিছুই নাই।

১। উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—প্রথম ভাগ পৃঃ ৬।

২। "আনুপূর্ব্যাৎ কর্মণাং যরূপং যজুর্বেদে সমাম্নাতম্। তস্মাৎ কর্মসু যজুর্বেদস্যৈব

ঋগ্বেদের সহিত যজুর্বেদের সম্পর্ক বিশেষ কিছুই নাই। তবে যজ্ঞে উভয়েরই সার্থকতা আছে। যজ্ঞব্যতিরিক্তিও ঋগ্বেদের সার্থকতা আছে। কিন্তু যজুর্বেদের নাই। ঋগ্বেদ পদ্যে রচিত, যজুর্বেদের শুক্লা শাখাও পদ্যে, কিন্তু কৃষ্ণশাখা গদ্যে। হোতা ঋগ্বেদের পুরোহিত; তিনি যজ্ঞস্থলে দেবতার আবাহন করেন: অধ্বর্যু যজুর্বেদের পুরোহিত, তিনি যজ্ঞের সমস্ত ক্রিয়াকলাপের পুরোধা।

ঋগ্বেদের সহিত সম্পর্ক

যজ্ঞস্থলে ঋগ্বেদ অপেক্ষাও যজুর্বেদের প্রাধান্য সুস্পষ্ট। ঋগ্বেদে যজ্ঞের সম্বন্ধে বা তাহার উপাদান ও বিধান সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই নাই, যদিও পরবর্তীকালে যজ্ঞের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া তাহার যাজ্ঞিক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু যজুর্বেদ সাক্ষাৎভাবে যজ্ঞের সহিত যুক্ত। যাগযজ্ঞের শাস্ত্রীয় বিচার ও মূল ইহাতেই আছে।

ঋগ্বেদ অপেক্ষা ইহার প্রাধান্য

অধ্বর্যু'র কাজ কি এবং তিনি কে সে সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। অধ্বর্যু শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অধ্বর অর্থাৎ হিংসারহিত যজ্ঞের যিনি পুরোধা। বৈদিক যজ্ঞে যজ্ঞীয় পশুবধকে হিংসাত্মক কার্য বলিয়া স্বীকার করা হয় না। সেইজন্যই ইঁহার এই নাম।

অধ্বর্যু

যজুর্বেদ প্রাচীনতম গদ্যের এবং গদ্যশৈলীর নিদর্শন। যে বিশাল গদ্যসাহিত্য পরবর্তী যুগে নানা শাখাপ্রশাখায় নিজেকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল তাহার মূল এই যজুর্বেদেই।[১] এই গদ্য অতি প্রাচীন বলিয়া পরবর্তী যুগের সংস্কৃত গদ্যের সহিত তাহার মিল কিছুই নাই বলিলেই চলে।

প্রাচীনতম গদ্য শৈলী

যজুর্বেদের কৃষ্ণশাখাই পরবর্তী যুগের ব্রাহ্মণগুলির জনক, ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নানাদিকে ইহাদের সামঞ্জস্য দেখা যায়। প্রথমতঃ, কৃষ্ণযজুর্বেদেই ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম গদ্যের নিদর্শন রহিয়াছে। ব্রাহ্মণগুলিও সকলেই গদ্যে লিখিত। দ্বিতীয়তঃ, কৃষ্ণ যজুর্বেদে বৈদিক যজ্ঞের সাধারণ ও বিশেষ প্রক্রিয়াগুলি

যজুর্বেদ ও ব্রাহ্মণ

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগুলিরও মূল বক্তব্য যজ্ঞপ্রক্রিয়া। সামবেদে একমাত্র সোমযজ্ঞের কথাই আছে; কিন্তু যজুর্বেদে সকল যজ্ঞেরই প্রণালী পাওয়া যায়। ভাষাগত ও বিষয়গত সাদৃশ্য ব্রাহ্মণগুলির সঙ্গে যজুর্বেদের যত বেশী, অন্য বেদের সহিত কিন্তু তত দেখা যায় না।

যজুর্বেদের যুগে ঋগ্বেদের আদর্শবাদ ও গভীর দর্শনের একান্ত অভাব লক্ষিত হয়। এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য—যজ্ঞাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জটিল ব্যবস্থাপ্রণালী, অধ্বর্যুগণের ও সাধারণভাবে শ্রৌতযজ্ঞের ঋত্বিক্‌গণের ক্রমশঃ প্রাধান্য প্রভৃতি। নির্দোষ ও পূর্ণাঙ্গ যজ্ঞদ্বারা অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে —এই বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ়ীভূত হইতে থাকে। "ফলে ঋগ্বেদের যুগের দেবগণের প্রতি সরল ও অটল বিশ্বাস, ভক্তি, নির্ভরতা ও দেবগণের প্রীত্যর্থে ত্যাগশীলতা প্রভৃতির অবসান হইয়াছিল। তৎপরিবর্তে মন্ত্রশক্তি, যজ্ঞক্রিয়ার অলৌকিক ও অতিমানবীয় ক্ষমতা প্রভৃতি মানবহৃদয় অধিকার করিতেছিল।"[১]

এই যুগে ঋগ্বেদের আদর্শবাদ ও গভীর দর্শনের একান্ত অভাব

যজ্ঞের প্রাধান্যের জন্য এই যুগের যজ্ঞকর্তা বা যজ্ঞের পুরোহিত ব্রাহ্মণ-গণের প্রাধান্য যে ক্রমশঃই বর্ধিত হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। রাজার অভিষেক হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ উচ্চবর্ণের অতিতুচ্ছ কার্যাবলীতেও ব্রাহ্মণদের প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকে। ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিলেই যে পৃথিবী সকলপ্রকার মঙ্গল লাভ করিতে পারে—এই বিশ্বাস জনসাধারণের চিত্তে ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হইতে থাকে।

ব্রাহ্মণদের ক্রমশঃ প্রাধান্য

যজুঃসংহিতায় আমরা দর্শপূর্ণমাস (অর্থাৎ অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ) ও অশ্বমেধ, রাজসূয়, বাজপেয়, চাতুর্মাস্য প্রভৃতি বৃহৎ যজ্ঞের পরিচয় পাই। এই যজ্ঞগুলি অতি দুরূহ, ইহাদের নিষ্পাদন বহুক্লেশসাধ্য। আর্যগণ এই যুগে সাম্রাজ্য বিস্তারের পর্ব শেষ করিয়া ধীরে ধীরে সামাজিক

বৃহৎ যজ্ঞের সহিত পরিচয়

জীবনের কর্তব্যগুলি সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বহুদিনব্যাপী বহু ব্যয় ও ক্লেশসাধ্য যজ্ঞগুলি তাই আর্যগণের নিরবচ্ছিন্ন, নির্বাধ জীবনেরই পরিচায়ক।

যজুর্বেদের সহিত শ্রৌতসূত্রের সম্পর্ক অন্য যে কোন বেদ অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ। শ্রৌতসূত্র পরবর্তী যুগে শ্রৌতযজ্ঞের বিধিব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান এবং প্রাধান্যেরই সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছে। আর যজুর্বেদে শ্রৌতযজ্ঞের বিভিন্ন প্রকারের বিশদ বর্ণনা দেওয়া আছে। যজুর্বেদ এক কথায় যজ্ঞের বেদ। সেজন্য ধর্মের ইতিহাসে যজুর্বেদের স্থান অতি উচ্চে।

শ্রৌতসূত্রের সহিত সম্পর্ক

পাঁচ

অথর্ববেদ

অথর্ববেদের সংকলন কাল সম্বন্ধে ভিণ্টারনিৎস বলিয়াছেন, "অন্যান্য তথ্যও আছে যাহাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে অথর্ববেদ সংহিতা ঋগ্বেদ সংহিতার পরবর্তী।" প্রথমতঃ অথর্ববেদে যে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নিঃসন্দেহেই ঋগ্বেদীয় যুগের পরবর্তী। বৈদিক আর্যগণ এখন দক্ষিণ ও পূর্বে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন এবং গঙ্গাতীরবর্তী দেশসমূহে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অথর্ববেদে বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাঘ্রেরও পরিচয় আছে। অথর্ববেদ শুধু জাতিভেদের কথাই অবগত নহে, ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যও এই যুগে সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল। অথর্ববেদের যুগে ব্রাহ্মণগণ প্রায় দেবগণের তুল্য বলিয়া বিবেচিত হইতেন। দ্বিতীয়তঃ "অথর্ববেদে বৈদিক দেবগণ যে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে উঁহার উদ্ভবকালের পরবর্তীত্বই সূচিত হয়।" অথর্ববেদেও আমরা ঋগ্বেদের যুগের অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাকে দেখিতে পাই, কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। তাঁহাদের পরস্পরের পার্থক্য আর বোঝা

সংকলন কাল

যায় না। সর্বশেষে, অথর্ববেদে যে সব দার্শনিক ও ধর্মের তত্ত্বের কথা দেখা যায়, তাহাতে স্পষ্টই সূচিত হয় যে এই সংহিতা সংহিতাযুগের সর্বশেষেই সংকলিত হইয়াছিল। এখানে আমরা বহু দার্শনিক শব্দ ও তাহাদের উন্নততর ব্যাখ্যা দেখিতে পাই, যাহার নিদর্শন একমাত্র উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বগুলির মধ্যে পাওয়া যায়।[১] তথাপি অথর্ববেদের সকল অংশই যে অন্যান্য সংহিতার সকল অংশ অপেক্ষা প্রাচীন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

অথর্ববেদের বিষয়বস্তুর একটি প্রধান অংশ ব্যাধি দূর করিবার জন্য গান এবং মন্ত্রের ব্যবহার। এগুলিকে ভৈষজ্য বলা হয়। এই ঐন্দ্রজালিক সঙ্গীত এবং ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকাণ্ডাদি ভারতের চিকিৎসাশাস্ত্রের আদিম রূপ। এই সকল ঐন্দ্রজালিক সঙ্গীতের মধ্যে অনেকগুলিতে গীতিকাব্যের উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণতঃ ইহারা একঘেয়ে। একই কথা এবং একই শব্দের পুনরাবৃত্তি মনে বিরক্তির সঞ্চার করে। এই সকল শব্দের অর্থও ইচ্ছা করিয়াই স্পষ্ট করা হয় নাই। নানা প্রকার দৈত্যদানবের বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের প্রয়োগও এই বেদে করা হইয়াছে। ইহারা নানাপ্রকার অসুখের সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহারা রাক্ষস ও পিশাচ নামে এই বেদে অভিহিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, স্ত্রী এবং পুরুষ দৈত্য, অপ্সর এবং গন্ধর্বের কথাও দেখা যায়। ইহারা নদী এবং বৃক্ষে সাধারণতঃ বসবাস করিয়া থাকে। সুন্দর স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ জীবনের কামনায় এই বেদে "আয়ুষ্যাণি সূক্তানি" প্রবর্তিত হইয়াছে। কৃষক, বণিক্ ও গোপালকগণের শান্তি, সমৃদ্ধি ও সাফল্যের জন্য "পৌষ্টিক সূক্ত" সৃষ্ট হইয়াছিল। প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থার জন্য "প্রায়শ্চিত্তানি" নামে কতকগুলি সূক্ত পাওয়া যায়। মানবজীবনের পারিবারিক অশান্তির কারণ অনেক সময়েই কুগ্রহ। সেজন্য পরিবারস্থ লোকের মধ্যে লুপ্ত ঐক্য ফিরাইয়া আনিবারজন্য অনেকগুলি সূক্ত দেখা যায়। অথর্ববেদের অনেকাংশে বিবাহ এবং প্রেমমূলক অনেকগুলি ইন্দ্রজালাত্মক গান আছে। রাজগণের জন্যও এরূপ অনেকগুলি ঐন্দ্রজালিক গানের সন্ধান পাওয়া যায়। ভিন্টারনিৎস্ সেজন্য অথর্ববেদের সহিত

বিষয়বস্তু

১। দ্রঃ Germs of Philosophy in Vedic Literature কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে P. R. S. thesis রূপে প্রদত্ত।

ক্ষত্রিয়গণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করেন। ব্রাহ্মণদের স্বার্থ সিদ্ধ করিবার উপযুক্ত মন্ত্রও এই বেদে রহিয়াছে। অথর্ববেদের মধ্যে দুইটি "আপ্রী" সূক্ত আছে। বোধহয় পরবর্তী যুগে যজ্ঞের সহিত এই বেদকে সম্পর্কিত করিবার জন্যই এইগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল। এই বেদে নূতন ধরণের কয়েকটি সূক্ত দেখা যায়। তাহাদের নাম 'কুন্তাপ' সূক্ত। ইহা ছাড়াও কতকগুলি দার্শনিক তথ্যের অবতারণা কয়েকটি সূক্তে করা হইয়াছে।

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

এই বেদের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। অথর্ববেদীয় পুরোহিত সাধারণতঃ দরিদ্র ও অজ্ঞ গ্রামবাসীর পূজা-পার্বণাদিতে অতি প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করিতেন। তিনি তাহাদের সরল ও অনাড়ম্বর প্রাচীন সংস্কারগুলি যথাযথ মানিয়া লইয়া পূজার্চনাদির বিধান দিতেন এবং নিজেই তাহার অনুষ্ঠান করিতেন। কিন্তু যেহেতু রাজধর্মেরও কতকগুলি নির্দিষ্ট সংস্কার ছিল, অথর্ববেদীয় পুরোহিত সেজন্যই রাজার একমাত্র বিশ্বস্ত ও হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া রাজার অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকাণ্ডে গণ্য হইতেন। অথর্ববেদীয় পুরোহিত রাজাকে জীবনের তুচ্ছ ঘটনাগুলির জন্যও উপদেশ দিতেন। তিনি ছিলেন একাধারে বন্ধু, ধর্ম ও দর্শনের উপদেষ্টা, নীতিজ্ঞ, চিকিৎসক ও ঐন্দ্রজালিক। সেইজন্য অন্যান্য বেদের পুরোহিত অপেক্ষা রাজার উপর এই বেদের পুরোহিতের প্রাধান্য ছিল অনেক বেশী। এই বেদে অনেক ঔষধ ও চিকিৎসার কথা বলা আছে, যাহা চিকিৎসা ও ঔষধের ইতিহাসে অতি প্রয়োজনীয় তথ্য। ঋগ্বেদের পরেই সংহিতাযুগে অথর্ববেদ স্বীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য সাধারণের নিকট যথেষ্ট প্রাধান্য ও খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল।[১]

সংস্কৃতির সংঘর্ষ

অথর্ববেদে আমরা আর্য-অনার্যের সংঘর্ষের একটা সুস্পষ্ট পরিচয় পাই। অথর্ববেদ ছিল জনসাধারণের বেদ। অতি প্রাচীনকালে অথর্ববেদ যে আস্তিক বেদত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল না সে কথা পরে বলা হইবে। এস্থলে শুধু ইহাই জানা প্রয়োজন যে অথর্ববেদ অনার্য-ধর্ম বা প্রাক্-আর্য ধর্ম ও কৃষ্টির একটি দর্পণ-স্বরূপ। যজ্ঞের সহিত প্রথমে ইহার সম্বন্ধ ছিল না বলিয়াই মনে হয়। অগ্নি উপাসনার উপরেই অথর্ববেদ বেশী প্রাধান্য দিয়াছে, যেমন দিয়াছে ইরাণীয় আবেস্তা। কিন্তু অন্য বেদত্রয়,

১। অথর্ববেদ ও ভারতীয় সংস্কৃতির সম্পর্কে লেখক এখনও গবেষণা করিতেছেন।

সোমযজ্ঞের প্রাধান্যই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। দীর্ঘদিন পর ধীরে ধীরে অথর্ববেদ বৈদিক সমাজে আসন লাভ করিয়াছে।

অথর্ববেদীয় ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হইতেছে যে ইহা অতি প্রাচীন বা আদিম (primitive)। ঋগ্বেদেও আমরা এই আদিম ধর্মের সন্ধান পাই না।[১] অথর্ববেদ জনসাধারণের বেদ, পূর্বেই বলিয়াছি। এই বেদে জনসাধারণের সরল ও কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাস, পূজার্চনাদির বিবিধ বৈশিষ্ট্য বিবৃত হইয়াছে। অথর্ববেদীয় ধর্মের প্রধান লক্ষ্য—("দানবগণকে) শান্ত করা, (বন্ধুগণকে) আশীর্বাদ করা এবং অভিশাপ বর্ষণ করা।"[২] অন্য কোন বেদে এগুলি দেখা যায় না, অথচ এগুলি প্রত্যেক জাতির ধর্মের ইতিহাসে আদিম ধর্মের প্রকৃতিরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ইহাতে আদিম ধর্ম

অথর্ববেদে ইন্দ্রজাল ও রহস্য পূর্ণমাত্রায় দেখা যায়। ভারতীয় magic বা যাদুবিদ্যার মূল এই বেদে রহিয়াছে। "শত্রুমারণাদি, হিংস্র জন্তু হইতে ত্রাণ, অভিসম্পাত বা দুর্দৈব হইতে রক্ষা প্রভৃতি ঐহিক ফলপ্রদ, যজ্ঞাদিতে ব্যবহার্য মন্ত্র" অথর্ববেদের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।[৩] ঋগ্বেদেও আমরা মন্ত্রতন্ত্রের ও ইন্দ্রজালের সন্ধান পাই। ঋগ্বেদের মূল বিষয়বস্তু কিন্তু শুধু এইগুলিই নহে। অথর্ববেদে ইন্দ্রজাল ও মন্ত্রতন্ত্রই মূল জ্ঞাতব্য বিষয়।

ইন্দ্রজাল ও রহস্য

অথর্ববেদে কাল, কাম, স্কম্ভ প্রভৃতির আরাধনা করা হইয়াছে। স্কম্ভই এই বেদে প্রজাপতি, পুরুষ ও ব্রহ্মন্। তিনি সর্বভূতে অধিষ্ঠিত, অধিদেব, বেদপুরুষ এবং নৈতিকশক্তির উৎস। রুদ্র পশুর দেবতা।[৪] প্রাণকে প্রকৃতিপ্রদ ও জীবনীশক্তির উৎস বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।[৫] গোজাতির পবিত্রতা স্বীকৃত হইয়াছে এবং ব্রহ্মলোক, নরক প্রভৃতির পরিচয়ও এখানে আছে।

দেবতা

১। ম্যাকডোনেল এই বেদে প্রাগৈতিহাসিক ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিচয় পাইয়াছেন।

২। Vedic Age, p. 438। ৩। ঋগ্বেদ ৭।৫৫; ১০।১২২; ১০।১৬৩।

৪। অথর্ববেদ ১০।৭।, ১৩, ১৭।৫ ১০।৭।

অথর্ববেদের ভাষাগত বিচার করা সত্যই দুরূহ, কারণ অতি প্রাচীন বিষয়ের বর্ণনা অনেক সময় ইহাতে অতি আধুনিক ভাষায় করা হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহার ভিতরে এমন অনেক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, যাহা ঋগ্বেদেও প্রাচীন বলিয়া গণ্য হইতে পারিত। অথর্ববেদের মন্ত্রাংশ ভাষাতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে সর্বশেষে সংকলিত হইয়াছিল এবং তাহার অজস্র প্রমাণ এই সংহিতাতে আছে। এই বেদের পদ্য ও গদ্যময় অংশগুলি প্রায় একই ভাষায় রচিত।

ভাষা

এই বেদের প্রাচীন নাম ছিল "অথর্বাঙ্গিরস্" অর্থাৎ অথর্বন্ ও অঙ্গিরাঃ। অথর্বন্ শব্দের অর্থ magic formula; অঙ্গিরস্ প্রাগৈতিহাসিক যুগের অগ্নি প্রজ্বালনার্থ পুরোহিতগণের নাম। ইহারও অর্থ মন্ত্রতন্ত্র ও ইন্দ্রজাল। কিন্তু দুইটি শব্দের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। " 'অথর্বন্' ও 'অঙ্গিরস্' শব্দদ্বয় অবশ্য কুহক সূত্রের দুইটি বিভিন্ন ধারাকে বুঝায়; অথর্বন্ শুভংকর ইন্দ্রজাল বিশেষ—সুখপ্রদ ও সুখবর্ধক; অথচ অঙ্গিরস্ ক্ষতিকর ইন্দ্রজাল (কৃত্যা)-কেই বুঝায়।...এইরূপে প্রাচীন নাম অথর্বাঙ্গিরস্ অথর্ববেদের (আলোচ্য) বিষয়বস্তু এই দুইপ্রকার কুহককেই বুঝাইয়া থাকে।"[১]

'অথর্বাঙ্গিরস' শব্দের অর্থ

অথর্ববেদে মোট ৭৩১টি সূক্ত আছে। এই সূক্তগুলিতে প্রায় ৬০০০ মন্ত্র আছে (শৌনকীয় রূপে)। ইহাতে কুড়িটি কাণ্ড বা অধ্যায় আছে। ৬০০০ মন্ত্রের মধ্যে প্রায় ১২০০ মন্ত্র ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল হইতেই অধিক ঋক্ সঙ্কলিত হইয়াছে। অথর্ববেদের ১৩টি কাণ্ডই প্রাচীন সংগ্রহ বলিয়া বোধ হয়। ইহার বিংশ কাণ্ড অবিসংবাদিতভাবে পরবর্তী। এই বেদের দুইটি শাখা—শৌনক ও পৈপ্পলাদ। পৈপ্পলাদ শাখা অসম্পূর্ণ।[২]

ঋগ্বেদের সহিত অথর্ববেদের সম্বন্ধ; সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য কতখানি দেখা যাউক। ভিণ্টারনিৎসের ভাষায় "মোটের উপর অথর্ববেদীয় কুহকসংগীত

১। Winternitz, Vol I, p 120. ২। অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য কিছুদিন হইল এই লুপ্তপ্রায় সম্পূর্ণ শাখার গ্রন্থ উদ্ধার করিয়াছেন।

হইতে যে সুর ধ্বনিত হয় তাহা ঋগ্বেদীয় সূক্তগুলি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের। এস্থলে আমরা যেন এক সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে বিচরণ করি।[১] ঋগ্বেদের সুর ভিক্ষার এবং অনুনয়-বিনয়ের অথর্ববেদের সুর কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যপ্রকার। এখানে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত তাঁহার অপেক্ষা সামাজিক পদমর্যাদায় নিম্নস্তরের ব্যক্তিবর্গকে যেন অভিভাষণ দিতেছেন, যাহাদের নিকট তাঁহার স্বীয় চরিত্রের অস্পষ্ট কুহেলিভরা দিক গোপন করার কোনই প্রয়োজন হয় নাই।[২] যেমন

ঋগ্বেদের সহিত সম্বন্ধ

ব্রহ্মজায়া সূক্ত[৩] ঋগ্বেদে দানস্তুতি প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণগণের অনুনয় বিনয় দেখা যায়, ব্রাহ্মণের সুবিধার কথা জোর গলায় কোথাও বলা হয় নাই অথর্ববেদে কিন্তু ব্রাহ্মণের সম্ভাব্য সুখ সুবিধা অধিকারের কথা নির্লজ্জভাবে বলোহিত হইয়াছে কিন্তু তাহার কর্তব্য বা দায়িত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ নাই বলিলেই চলে। ঋগ্বেদে দেবগণ অপেক্ষা যজমানের অনুগ্রহ লাভের জন্য ব্রাহ্মণগণকে যেন বেশী আকাঙ্ক্ষিত দেখা যায়। অথর্ববেদীয় পুরোহিত ত্রিবেদজ্ঞ, ইহা ছাড়া অথর্ববেদ তিনি জানিতেনই। তাঁহার নাম ব্রহ্মা। তিনি যজ্ঞের সর্বাধিনায়ক ঋত্বিকগণের কাহারও মন্ত্র পাঠে কোন ভুল হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন। ঋগ্বেদে যে ইন্দ্রজাল ও ঈর্ষ্যাত্মক বীজ উপ্ত হইয়াছিল অথর্ববেদে তাহাই আভিচারিক সূক্তরূপে (অর্থাৎ কৃত্যানামে) বিবর্তিত হইয়াছে। অথর্ববেদে ব্রাত্য একজন প্রধান দেবতা যাহার উল্লেখ ঋগ্বেদে নাই। ইনি ব্রহ্মের প্রতিভূ। ইনি সমগ্র পঞ্চদশ কাণ্ডে কীর্তিত হইয়াছেন। রুদ্র এই বেদে শর্ব, ভব, ঈশান, পশুপতি ও মহাদেব আখ্যা লাভ করিয়াছেন, বিধবাবিবাহ এখানে স্বীকৃত হইয়াছে।[৪] ঋগ্বেদীয় দর্শন এই যুগে উন্নততর রূপ লাভ করিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, অথর্ববেদের প্রথম উনিশটি কাণ্ডের অংশ ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত। ঋগ্বেদ হইতে অথর্ববেদের ভাষাগত পার্থক্যও কিছু আছে। ঋগ্বেদ পদ্যময়, অথর্ববেদে গদ্য ও পদ্য—উভয়েরই সমাবেশ। ঋগ্বেদের ভাষা অপেক্ষা অথর্ববেদের ভাষা সুখবোধ্য। এই যুগে ঋগ্বেদের যুগ অপেক্ষা সামাজিক

১। Winternitz, Vol 1, p. 127.
২। Vedic Age, p. 408.
৩। অথর্ববেদ ৫।১৭।৮
৪। ঐ ১৫।৫।৭-১৮

পরিবর্তন ও উন্নতি অনেক বেশী লক্ষিত হয়। ঋগ্বেদকে কেহ কেহ শ্রৌতমন্ত্রপাঠ ও অথর্ববেদকে গৃহ্যমন্ত্রপাঠ বলিয়া মনে করেন।

অথর্ববেদের সহিত গৃহ্যসূত্রের সম্পর্ক অতি নিবিড়।[১] পুরোহিত গৃহ্যকর্মগুলি সম্পন্ন করিতেন। এগুলি ছিল সরল ও অনাড়ম্বর এবং অগ্নির সহিত সংশ্লিষ্ট। শ্রৌতযজ্ঞে সোমাভিষব ও পশুবধেরই প্রাধান্য ছিল, গৃহ্যযজ্ঞে এই দুইটির প্রাধান্য একেবারেই নাই। দৈনন্দিন জীবনের ছোট-খাট বিপদ্ আপদকে দূর করিয়া শান্তি ও সুখ লাভের কামনাই গৃহ্যকর্ম ও গৃহ্যসূত্রগুলির উদ্দেশ্য। অথর্ববেদের মূলবস্তু ইহাই। সেজন্য অথর্ববেদ গৃহ্যসূত্রের জনক, যে হিসাবে যজুর্বেদ ও সামবেদ যথাক্রমে শ্রৌতসূত্রের জনক।

গৃহ্যসূত্রের সহিত সম্পর্ক

আবেস্তা ও অথর্ববেদে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। আবেস্তায় প্রাচীন অংশগুলিতে আদিম ধর্মের ছাপ আছে। পূর্বেই দেখাইয়াছি, অথর্ববেদেও ইহা পরিস্ফুট। অথর্ববেদ ব্যতীত আবেস্তার সহিত ঋগ্বেদ ও অন্যান্য বেদের যেন একটা রেশারেশি আছে। অথর্ববেদও এই কারণেই দীর্ঘদিন ত্রয়ীর বহির্ভূত ছিল। অথর্ববেদ ও আবেস্তা —উভয় গ্রন্থেই অগ্নি-উপাসনা আছে। ইন্দ্রজাল ও অতিমানবীয় শক্তিতে উভয়েই আস্থাবান্। সংকলনের সময়ের দিক্ দিয়াও উভয়ই পরস্পরের নিকটবর্তী।[২]

আবেস্তা ও অথর্ববেদ

এই বেদের অথর্বমন্ত্রগুলিতে শুভংকর রূপের পরিচয় মিলে। এই মন্ত্রগুলি মানব সমাজের কল্যাণ বিধানে নিরন্তর ব্যাপৃত। চিকিৎসা ও তন্ত্র এবং আয়ুর্বিদ্যার ইতিহাসে অথর্ববেদ অক্ষয় স্থান চিরদিনই অধিকার করিবে। ভারতীয় যাদুবিদ্যার বীজও যে অথর্ববেদে তাহাও পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

প্রয়োজনীয়তা

অথর্ববেদ প্রথম হইতে বৈদিক সাহিত্যে একটি অদ্ভুত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ইহাতে একদিকে যেরূপ উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব রহিয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ রাজোচিত বিভিন্ন কর্ম এবং মারণ, উচাটন প্রভৃতিও

১। **Grihya Rites in the Atharvaveda—Shende দ্রঃ।**
২। **Atharvaveda and Avesta—Karambelkar.**

রহিয়াছে। শাস্ত্রে বহুস্থলে বেদকে ত্রয়ী নামে উল্লেখ করায় অনেকের ভ্রান্ত ধারণা এই যে, ত্রয়ী শব্দে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়কে বুঝায়; সুতরাং অথর্ববেদ বেদবহির্ভূত। বস্তুতঃ, অথর্ববেদের যজ্ঞে ব্যবহার নাই বলিয়াই উহা ত্রয়ীর মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। ইহাতে অথর্ববেদের অবেদত্ব প্রমাণিত হয় না। অথবা এইরূপও হইতে পারে যে, ত্রয়ী শব্দে বেদবিভাগ লক্ষিত না হইয়া মন্ত্রবিভাগই লক্ষিত হইয়াছে এবং মন্ত্রসমূহ তিন শ্রেণীতে (ঋক্, যজুঃ, সাম—পদ্য, গদ্য ও গীতি) বিভক্ত বলিয়া বেদসমূহ ত্রয়ী নামে অভিহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, অথর্ববেদ যে বেদেরই অন্তর্ভুক্ত তাহার প্রমাণ বেদমধ্যেই রহিয়াছে।

ত্রয়ী ও অথর্ববেদ

ছয়

ব্রাহ্মণ

"বেদের যে ভাগে যাগ-যজ্ঞাদির বিবরণ ও মন্ত্রের নানারূপ ব্যাখ্যা আছে, তাহার নাম ব্রাহ্মণ। এক হিসাবে ইহাকে বেদের আদিম ব্যাখ্যা বা বিবরণ বলা যাইতে পারে। ব্রহ্ম (ন্) শব্দের অর্থ বেদ। তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় ইহা ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই আলোচনা আছে।"

অর্থ

"ব্রাহ্মণগ্রন্থ বৈদিক যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের উপদেশে পূর্ণ। ঐ সকল অনুষ্ঠান এত জটিল যে, যাজ্ঞিকের হস্তে এই সকল কর্ম অনুষ্ঠিত না দেখিলে, উহা হৃদ্গত করা প্রায় অসাধ্য। সংহিতা বা মন্ত্রের ব্যাখ্যা করাই ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য। বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয়, সংহিতাগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য যজ্ঞ করাই ছিল না, যজ্ঞ ব্যতিরিক্তও তাহাদের পৃথক্ সত্তা নিশ্চয়ই ছিল। একমাত্র যজুর্বেদই সে হিসাবে যজ্ঞের

সংহিতার সহিত সম্বন্ধ

১। উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, গম্ভীরানন্দ, পৃঃ ৭, ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৭।১।২

সহিত প্রধানতঃ সংশ্লিষ্ট। কিন্তু 'ব্রাহ্মণযুগে' ইচ্ছা করিয়াই সকল সংহিতাকে কোন না কোন প্রকারে যজ্ঞের সহিত সংশ্লিষ্ট করিবার দুর্বার প্রচেষ্টা দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণগ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন সংহিতান্বিত মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে, কোন্ মন্ত্র কোন্ ঋত্বিক্ কর্তৃক কোন্ কর্মে কিরূপে বিনিযুক্ত হইবে, তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, কোন্ কারণে কোন্ মন্ত্র কোন্ নির্দিষ্ট কর্মের উপযোগী, তাহার হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে এবং প্রসঙ্গক্রমে নানা আখ্যায়িকাদি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।"

ম্যাক্সমূলারের মতে ব্রাহ্মণগণের রচনা বা সংকলনকাল কমপক্ষে আনুমানিক ৮০০-৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। সংহিতাযুগের পরই ব্রাহ্মণযুগ, এবং ব্রাহ্মণযুগ নিশ্চয়ই সূত্রযুগের পূর্ববর্তী। ভিণ্টারনিৎসের মতে ব্রাহ্মণগণের রচনাকাল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২০০০-১৫০০ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

সংকলন

ব্রাহ্মণগুলি গদ্যে রচিত। ক্বচিৎ কোথাও কোথাও পদ্য আছে। কর্মকাণ্ডের উপরেই ব্রাহ্মণ লিখিত। কখন কি প্রকারে যজ্ঞে অগ্নি জ্বালাইতে হইবে, কুশ কি প্রকারে কোথায় রাখিতে হইবে, কোন্ যজ্ঞে কি আহুতি কি প্রকারে দিতে হইবে—এই সকল কথাই ব্রাহ্মণগণের বিষয়বস্তু। আর সেই সময়ের প্রচলিত এবং লোকপরম্পরায় আগত অনেক গল্প ও উপাখ্যান এইগুলিতে আছে। এই সকল উপাখ্যানই পরবর্তী যুগের পুরাণ ও ইতিহাসের আদি পুরুষ। "যদিও ব্রাহ্মণগুলির প্রধান লক্ষ্য কর্মকাণ্ডের উপর, তবুও এইগুলিতে ব্যাকরণ, দর্শন, আয়ুর্বেদ প্রভৃতির অস্পষ্ট আলোচনা আছে।"

বিষয়বস্তু

ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ দুইটি—ঐতরেয় এবং কৌষীতকি (অথবা শাঙ্খায়ন)। ব্রাহ্মণদ্বয়ের মধ্যে ঐতরেয় প্রাচীনতর এবং আকারে বৃহত্তর। কৌষীতকিতে বিষয়বস্তু আছে অনেক বেশী। "ঐতরেয় স্পষ্টই একটি সংমিশ্রিত রচনা—ইহার প্রথম পাঁচটি পঞ্চিকা শেষ তিন পঞ্চিকা অপেক্ষা প্রাচীনতর।"[১] সামবেদের আটটি ব্রাহ্মণের নাম পাওয়া যায়। তাণ্ড্য, ষড়্বিংশ, মন্ত্রদৈবত, আর্ষেয়,

১। Vedic Age, p. 234.

সামবিধান, সংহিতোপনিষদ্, বংশ এবং জৈমিনীয়। ইহাদের মধ্যে কেবল জৈমিনীয় এবং তাণ্ড্য ব্রাহ্মণই বর্তমানে পাওয়া যায়। আকারে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ "তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ" নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পঁচিশটি অধ্যায় থাকায় ইহা আবার "পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ" নামেও প্রসিদ্ধ। পরে আবার একটি অধ্যায় যোগ করিয়া ইহাকে ষড়্‌বিংশ নামেও অভিহিত করা হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। এই মত কতদূর বিচারসহ তাহা গবেষণার বিষয়। কৃষ্ণ-যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখায় আছে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। শুক্ল যজুর্বেদের একমাত্র ব্রাহ্মণ শতপথ। ইহাতে একশতটি অধ্যায় আছে। অথর্ববেদের একটিই মাত্র ব্রাহ্মণ—গোপথ।

কোন্ বেদের কোন ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণগুলির উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিন্টারনিৎস বলেন, "যজুর্বেদের সংহিতাগুলি যেরূপ প্রার্থনার ইতিহাসের পক্ষে অমূল্য দলিল, সেরূপই ব্রাহ্মণগুলি ধর্মজিজ্ঞাসুর, যজ্ঞের ইতিহাসের এবং পৌরোহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে অমূল্য।"[1] যজ্ঞের সহিত ব্রাহ্মণগুলির সম্পর্ক যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। ইহা ছাড়া, ব্রাহ্মণগুলিতেই পরবর্তী বেদাঙ্গসমূহের ভিত্তিস্থাপন হইয়াছিল বলিয়া পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন।

ইহাদের প্রয়োজনীয়তা।

ব্রাহ্মণযুগের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি বলিতে বুঝায় যে এই যুগের ধর্ম কতকগুলি যজ্ঞ এবং স্তব ও প্রার্থনার সমষ্টিমাত্র। স্বর্গকামনা করিয়া যজমান যজ্ঞ করিলে দেবতা তুষ্ট হন ও প্রার্থিত বর দান করেন। গৃহপতি অগ্নিই যজ্ঞের পুরোহিত। দেবগণ অগ্নির মুখেই আহুতি গ্রহণ করেন। মানবের জীবন জন্ম হইতে কতকগুলি কর্মের বন্ধনে জড়িত। মানুষ কতকগুলি কর্তব্য ও দায়িত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং ইহ জীবনে সেগুলি যথাযথভাবে পালন করাই তাহার ধর্ম।

ইহাদের প্রকৃতি

এই যুগে ঋত্বিক্‌গণ বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। অগ্নিহোত্র, উপসদ্, ইষ্টি প্রভৃতি ছোটখাট যাগ ছাড়াও, গবাময়ন, চাতুর্মাস্য, অশ্বমেধ,

১। দ্রঃ A History of Indian Literature, Vol I, p. 187.

রাজসূয়, বাজপেয় ও সোমযজ্ঞ প্রভৃতিতে ঋত্বিক্‌গণ প্রায় সারা বৎসর ধরিয়া যাগযজ্ঞের কাজ পাইতেন এবং ধর্মপ্রাণ ক্ষত্রিয়রাজগণ তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণের সম্পূর্ণ ভার লইয়াছিলেন বলিয়া যাবজ্জীবন তাঁহারা এই সমস্ত কর্মেই লিপ্ত থাকিতেন। ব্রাহ্মণ অবধ্য, ব্রাহ্মণ ক্ষমার্হ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করিলে অক্ষয় পুণ্য ও স্বর্গলাভ হয় বলিয়া ব্রাহ্মণগুলিতে বলা আছে। রাজার অভিষেকের সময় ঋত্বিক্ এবং পুরোহিতের প্রাধান্য অপরিসীম।[১]

ঋত্বিকগণের প্রাধান্য

অগ্নি, আদিত্যগণ, অদিতি, অশ্বিদ্বয়, ইড়া, সোম, ইন্দ্র, উষা, ঋতুগণ, তার্ক্ষ্য, ত্বষ্টা, দ্যাবাপৃথিবী, দ্যৌঃ, পিতৃগণ, পূষা, পৃথিবী, প্রজাপতি, বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতি, ভারতী, মরুদ্‌গণ, মাতরিশ্বা, মিত্রাবরুণ, রুদ্র, বরুণ, বসুগণ, বায়ু, বিশ্বকর্মা, বিশ্বদেবগণ, বিষ্ণু, বৃষাকপি, সরস্বতী, সবিতা, সাবিত্রী, রাকা ও সিনীবালী, সূর্য প্রভৃতি দেবতার আরাধনা এই যুগের যজ্ঞগুলিতে দেখা যায়।

ব্রাহ্মণযুগের আদের দেবতা

ব্রাহ্মণযুগের ভিতর প্রাচীনতম অতি প্রাচীন এবং ব্রাহ্মণগুলি সকলেই গদ্যে রচিত। অতি সরল গদ্য এবং প্রাচীন আর্যপ্রয়োগ ইহাদের মধ্যে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়।

ইহাদের ভাষা ও রচনারীতি

ব্রাহ্মণগুলির সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ কিছু না থাকিলেও, ইহারা যে কথা, উপাখ্যান ও আখ্যায়িকার আকর বা খনিবিশেষ সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। পরবর্তী যুগে যে সকল মহাকাব্য, উপাখ্যান, পুরাণ প্রভৃতি রচিত হইয়াছিল, তাহাদের প্রায় সকলেরই বীজ ব্রাহ্মণগুলিতে পাওয়া যায়। লৌকিক সাহিত্যের অনেক শাখারই মূল যে দুই বৃহৎ মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত তাহাদেরও বীজ এই ব্রাহ্মণগুলিতে। অতএব পুরাণ ও মহাকাব্যযুগে যে সকল উপাখ্যান সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহারা সকলেই অবিসংবাদিতভাবে ব্রাহ্মণগুলির নিকট ঋণী। বিখ্যাত শুনঃশেপ ও রন্তিদেবের উপাখ্যান প্রভৃতি ব্রাহ্মণযুগের সাহিত্যের অপূর্ব সৃষ্টি।

কিংবদন্তী ও উপাখ্যানের অফুরন্ত উৎস

১। এ বিষয়ে দ্রঃ ডঃ উপেন্দ্রনাথ ঘোষালের—A History of Hindu Public Life, Part I.

ব্রাহ্মণযুগের সাহিত্যকে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়—বিধি, অর্থবাদ ও উপনিষদ্। বিধি শব্দের অর্থ নিয়ম। অর্থবাদ বলিতে অর্থের ব্যাখ্যাকেই বুঝায়। আর উপনিষদ্ শব্দের অর্থ কি তাহা উপনিষদ্ অধ্যায়ে বিশদ্ভাবে বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণগুলি প্রথমতঃ পৃথক পৃথক্ ভাবে যজ্ঞগুলির নিয়ম কি বলিয়া গিয়াছে; তাহার পর যজ্ঞের কার্যাবলীর ও প্রার্থনাগুলির ব্যাখ্যা ও অর্থ কি তাহা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছে। সর্বশেষে উপনিষদ্ বা রহস্যের আবরণ উন্মোচিত হইয়াছে।

বিধি, অর্থবাদ ও উপনিষদ্ ক্রমে ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তু বিভাগ

কৃষ্ণযজুর্বেদের সহিত ব্রাহ্মণগুলির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। কৃষ্ণযজুর্বেদের মধ্যে মন্ত্র বা প্রার্থনার অতিরিক্ত যজ্ঞের ব্যাখ্যা, আলোচনা ও বিভিন্ন মতের সমাবেশ আছে। ব্রাহ্মণগুলিরও লক্ষ্য একমাত্র যাগ-যজ্ঞের বিষয় বিবৃত করা। ইহা ছাড়াও কৃষ্ণযজুর্বেদের অধিকাংশই গদ্যে রচিত, ব্রাহ্মণগুলির রচনাও গদ্যেই।

কৃষ্ণযজুর্বেদের সহিত সম্পর্ক

'ব্রাহ্মণ' গার্হস্থ্যাশ্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া অনেকে মনে করেন। সংহিতা বা মন্ত্র মুখস্থ করিয়া ছাত্রগণ গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য আশ্রম সমাপ্ত হইত। অতঃপর বিবাহ সমাপনান্তে পত্নীর সহিত আহিতাগ্নি হইয়া এই গার্হস্থ্যাশ্রমের সময় তাঁহারা বিভিন্ন যাগযজ্ঞ করিতেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য তিন আশ্রমের যথাযথ ভরণপোষণের ভারও এই দ্বিতীয় আশ্রমস্থ নরনারীর উপর অর্পিত থাকিত।

গার্হস্থ্যাশ্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট

উত্তরকালে গীতায় কর্মকাণ্ডস্থ ব্রাহ্মণগুলির নির্দিষ্ট যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানাদি ও ক্রিয়াবিশেষবাহুল্যের তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে। 'স্বর্গকামো জ্যোতিষ্টোমেন যজেত', ইত্যাদির লক্ষ্য হইতেছে স্বর্গলাভ, পুত্র, পৌত্র, অশ্ব, রথ, পদাতি, ধন, ধান্য ও হিরণ্য লাভ। নিষ্কাম কর্মের উপাসনা ব্রাহ্মণে দেখা যায় না। কামনা ও বাসনা লইয়াই আর্যগণ যজ্ঞারম্ভ করিতেন এবং যজ্ঞের ফলাকাঙ্ক্ষাও ঐজন্য তাঁহাদের তীব্র ছিল। 'সুবীরাসো ভবেম', 'রত্নধাতমমগ্নিমীড়ে' ইত্যাদির মধ্যে লিপ্সা সুপরিস্ফুট।

গীতায় কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে যুক্তি

ব্রাহ্মণগুলির উক্তি ও যুক্তির সমর্থনেই মীমাংসাদর্শন সৃষ্ট হইয়াছিল, মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে।[১] বিধি ও অর্থবাদের ব্যাখ্যাতেই মীমাংসা দর্শন ব্যাপৃত হইয়াছে। মীমাংসা শব্দের অর্থ 'পূজা বিচার'। "নিখিল-কলাকলাপস্যাপি মূলভূতস্য বেদস্য নিকৃষ্টবাক্যার্থবর্ণনব্যাজেনাশেষপুরুষার্থরক্ষা-করস্য ভগবতো ধর্মস্য বাস্তবিকং তত্ত্বমবগময়িতুং প্রবৃত্তেয়ং দ্বাদশলক্ষণী ভগবতী মীমাংসা।"[২] ব্রাহ্মণের অর্থ যেখানে পরিস্ফুট নয়, কিংবা যেখানে বৈদিক মন্ত্রের কোন যুক্তিসহ যাজ্ঞিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব হইতেছে না, মীমাংসা সেখানেই বৈদিক সাহিত্যকে বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণগুলিকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। যজ্ঞাচার্যগণের মতে মীমাংসাদর্শনের সম্যক্ জ্ঞান ভিন্ন বৈদিক কর্মকাণ্ডের জ্ঞান অসম্ভব। সায়ণাচার্য এইজন্যই প্রত্যেক বেদের ভাষ্যভূমিকায় স্বপক্ষসমর্থনে মীমাংসা মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মীমাংসাদর্শনের সহিত সম্পর্ক

সাত

আরণ্যক

ব্রাহ্মণগুলির "যে অংশে কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই সাঙ্কেতিক বা আধ্যাত্মিক আলোচনা আছে, তাহাকে আরণ্যক বলা হয়, কেননা ইহা অরণ্যে অর্থাৎ বনে পাঠ করা হইত, কারণ, এই সব কথা দুরূহ বলিয়া যেখানে-সেখানে যাহাকে-তাহাকে শেখানো হইত না, এবং ইহা অবধারণ করিবার জন্য অতি নির্জন স্থান আবশ্যক হইত।"[৩] আমাদের অনেক উপনিষদ্‌ই এই আরণ্যকের অন্তর্ভুক্ত।

অর্থ

আরণ্যকগুলির সংকলন-কাল ঠিক কোন সময় বলা কঠিন। ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে আরণ্যক সন্নিবিষ্ট। ইহারই শেষভাগ আবার উপনিষদ্। যাহা

১। দ্রঃ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৪৫।
২। তন্ত্রসিদ্ধান্তরত্নাবলিঃ—সম্পাদকীয় পট্টভিরাম শাস্ত্রী।
৩। বিধুশেখর শাস্ত্রী—উপনিষদ্ : লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা।

হউক, আরণ্যক যুগ উপনিষদ্‌যুগের পূর্ববর্তী বলিয়া অনেকে মনে করেন।

সংকলনকাল ও বিষয়বস্তু

আরণ্যকের ভাষাও সুপ্রাচীন। ইহাদের মধ্যে বৈদিক ক্রিয়াকর্মের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদের আভাস পাওয়া যায়। ঐতরেয় আরণ্যকে দেখা যায়, ঋগ্বেদের আর্ষ-মণ্ডলের ঋষিগণের নাম সুর্যপরত্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে প্রাণ প্রভৃতির আলোচনা বৈজ্ঞানিকভাবে করা হইয়াছে। উপনিষদে যে দার্শনিক তথ্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সূচনা আরণ্যকে।

আরণ্যকের উদ্ভবের কারণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উক্তি প্রণিধানযোগ্য— "ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে (বিবৃত) যাগযজ্ঞের প্রতি অত্যধিক আসক্তির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। বাধ্যতামূলক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান—যাহা ব্রাহ্মণের যুগে ভয়াবহ বিশাল আকার ধারণ করিয়াছিল—যে নির্ভুলভাবে করা যুবা বৃদ্ধ সকলের পক্ষে (সমান ভাবে) সম্ভব হইবে এরূপ আশা করাও চলে না; আরণ্যকগুলি প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়েরই স্বীকৃতি মাত্র।....ইহা ছাড়া যজ্ঞ-বিজ্ঞানের কিয়দংশ রহস্যময় ও আধ্যাত্মিক ধরণের ছিল; সেগুলিকে অরণ্যের নিঃস্তব্ধতা ও গোপনতার মধ্যেই প্রকাশ করা চলিত। আরণ্যকগুলি প্রধানতঃ যজ্ঞ-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের দর্শন লইয়াই ব্যস্ত।"[১] এক কথায়, ব্রাহ্মণোক্ত যাগযজ্ঞাদির রহস্যময় ও দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদর্শনের জন্যই আরণ্যক উদ্ভূত হইয়াছিল।

আরণ্যকে যাজ্ঞিক আচারের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া আছে, প্রসঙ্গক্রমে তাহা পূর্বেই দেখাইয়াছি। আরণ্যকে মানসিক ধ্যান বা মানস যজ্ঞের

যাজ্ঞিক আচারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

উপরই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। কর্মযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই যে অধিকতর উপাদেয় ও শ্রেয়—বৈদিক ঋষিগণ এই যুগে তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই দিক্ দিয়া দেখিলে আরণ্যক কর্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গের মধ্যে সংযোগসেতু রচনা করিয়াছে নিঃসংশয়ে বলা যায়।

১। Vedic Age, p. 447.

আরণ্যক এক হিসাবে আর্যদের তৃতীয়াশ্রমের সহিত সম্পর্কিত। এই আশ্রমে ঋষিগণ ক্রিয়াকলাপের অপেক্ষা ধ্যান ও তত্ত্বান্বেষণেই অধিকতর শান্তিলাভ করিতেন। অরণ্যের শান্ত সমাহিত পরিবেশ সংসারের কলকোলাহল হইতে বহুদূরে অবস্থিত। সেই পরিবেশে সংসারের মায়া ও বন্ধন হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া তত্ত্বচিন্তার প্রকৃষ্ট অবসর পাওয়া যাইত।

আর্যদের বানপ্রাস্থিক আশ্রমের সহিত সম্পর্ক

আরণ্যক আপামর সাধারণের নিকট প্রকাশিত করিবার উপায় ছিল না। এই জ্ঞানের উপযুক্ত আধার না পাইলে ইহা প্রকাশ করা যাইত না।

ইহাদিগকে গোপন বা রহস্যাবৃত রাখিবার কারণ

একমাত্র প্রধান শিষ্য বা উপযুক্ত জ্যেষ্ঠপুত্রের নিকট এই রহস্য প্রকাশ করিবার প্রথা ছিল। ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ঐতরেয় আরণ্যকের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে খুব সম্ভব এই জন্যই বহু আরণ্যক উপযুক্ত আধারের অভাবে কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

প্রধান শিষ্য ও জ্যেষ্ঠপুত্র ইহাদিগকে জানিবার অধিকারী

আরণ্যক কাহারো কাহারো মতে কর্মকাণ্ডের শেষ অংশ, আবার কাহারো মতে জ্ঞানকাণ্ডের প্রথম অংশ। শেষ মতটিই বিচারসহ বলিয়া মনে হয়। আরণ্যক এবং উপনিষদ্‌কে একসঙ্গে আমরা বেদান্ত বলিয়া থাকি। প্রথমে বেদান্ত শব্দের অর্থও তাহাই ছিল, বেদের শেষভাগ—কোন দর্শনবিশেষ নহে।

জ্ঞানকাণ্ডের প্রথম অংশ

আরণ্যকের ভাষা ব্রাহ্মণযুগের ভাষার ন্যায়ই অতি প্রাচীন। ছোট ছোট শব্দের যোগে বাক্য রচনা আরণ্যকের রচনাশৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ব্রাহ্মণের ভাষা অপেক্ষা আরণ্যকের ভাষা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু তাহাদের অন্তর্নিহিত অর্থ উপনিষদের মন্ত্রগুলির ন্যায় রহস্যপূর্ণ। ব্রাহ্মণের ন্যায় আরণ্যকও গদ্যে রচিত।

ভাষা ও রচনাশৈলী

আরণ্যকে বৈদিক দেবগণের সাংকেতিক ব্যাখ্যা দেওয়া আছে, পূর্বেই বলিয়াছি। ঋষি এবং যজ্ঞের ব্যাখ্যাও সাংকেতিক। অর্থাৎ আরণ্যকে

সংহিতা ও ব্রাহ্মণোক্ত ক্রিয়াকাণ্ডের একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণগুলির যতপ্রকার শাখা আছে, আরণ্যকেরও শাখা ঠিক ততগুলিই। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শেষাংশ ঐতরেয় আরণ্যক। ইহাতে পাঁচটি ভাগ আছে এবং প্রত্যেকটিকেই পৃথক্ পৃথক্ আরণ্যক নামে অভিহিত করা হয়। শাঙ্খায়ন অথবা কৌষীতকি আরণ্যক ঋগ্বেদের কৌষীতকি ব্রাহ্মণের উপসংহার মাত্র। ঐতরেয় আরণ্যকের সহিত ইহার বিষয়বস্তুরও ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যক তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের প্রসারণ মাত্র। ইহাতে দশটি অধ্যায়, 'অরণ' বা 'প্রপাঠক' আছে। শুক্ল যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণের চতুর্দশ খণ্ড প্রকৃতপক্ষে একটি আরণ্যক—বৃহদারণ্যক। সামবেদের আরণ্যক একটিই—জৈমিনীয় বা তলবকারশাখার অন্তর্ভুক্ত।

কোন্ বেদের কোন্ আরণ্যক

আরণ্যকগুলির মধ্যে ঐতরেয় আরণ্যকেই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহার পাঁচটি ভাগের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। প্রথমভাগে সোমযজ্ঞের যাজ্ঞিক ব্যাখ্যা আছে। দ্বিতীয়ভাগে প্রাণ ও পুরুষ তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা আছে। ইহার প্রকৃতি অনেকটা উপনিষদের ন্যায়। তৃতীয় ভাগে সংহিতা, পদ এবং ক্রমপাঠের রূপকাত্মক এবং নিগূঢ় অর্থ দেওয়া আছে। শেষ দুইভাগে বিবিধ বিষয়ের আলোচনা দেখা যায়—যেমন নিষ্কেবল্য শস্ত্রের বিবরণ, মহানাম্নী শ্লোকের অর্থ ও ব্যাখ্যা ইত্যাদি। বৃহদারণ্যক ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকও নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়াছে।

দুই একটি প্রসিদ্ধ আরণ্যকের বিবরণ

আরণ্যক ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।[১] আরণ্যকগুলি পরমাত্মাকে জানিবার জন্য কয়েকটি প্রতীকের উপাসনা এবং তপস্যাপদ্ধতির নির্দেশ দিয়াছে; এই উপাসনা এযুগে ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও উপনিষদ্-গুলিতে উক্ত 'স্বর্গ'কে বাতিল করিয়া দিয়াছে; কারণ স্বর্গাকাঙ্ক্ষা

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে ইহাদের স্থান

১। লেখক 'Germs of Philosophy in Vedic Literature' নামক গবেষণাত্মক প্রবন্ধে ইহাদের আলোচনা করিয়াছেন।

যজ্ঞানুষ্ঠান হইতেই জন্মে। শেষে জ্ঞান ও কর্ম-মার্গের মধ্যে মীমাংসা সমাপ্ত হয়।"[১]

রহস্যবাদ

আরণ্যকেই ভারতীয় গুহ্যরহস্যবাদের সূত্রপাত বলা যাইতে পারে। আরণ্যক ও উপনিষদে যাহার সূচনা, দর্শনগুলিতে তাহার বিকাশ এবং পরবর্তীকালে তন্ত্রশাস্ত্রে তাহার পরিণতি দেখিতে পাই। আরণ্যকের ন্যায় তন্ত্রেরও সংকেতগুলি রহস্যময়। আজও আরণ্যকের অনেক সংকেতের প্রকৃত অর্থ জানা যায় নাই।

আট

উপনিষদ্

কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড

পূর্বেই বলিয়াছি বেদকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়—জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড। কিন্তু এই দুই বিষয়ে কোন পৃথক্ গ্রন্থ পাওয়া যায় না। বৈদিক গ্রন্থে কর্ম বা জ্ঞানের আলোচনার ন্যূনাধিক্যে এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। ক্রমে আর্য চিন্তার পরিবর্তন সূচিত হইতে থাকে। কিছু না কামনা করিয়া তাঁহারা যজ্ঞ করিতেন, কিন্তু উহাতে উত্তরোত্তর কামনার বৃদ্ধিই হয়—দুঃখের অবসান হয় না, শান্তিও আসে না। তাই অনেকের ধারণা হইল কর্মের দ্বারা সংসারের দুঃখ অতিক্রম করিতে পারা যায় না। আবার অনেক বৈদিক কর্মে পশুহিংসা থাকায় অনেকেরই তাহা ভাল লাগিল না। মানবের কল্যাণের অন্য পথ নিশ্চয়ই আছে ভাবিয়া অনেকে জ্ঞানের পথের অন্বেষণে ব্যাপৃত রহিলেন। এই জ্ঞানবাদীদেরই উক্তি জ্ঞানকাণ্ড। আমাদের উপনিষদ্ যে এই জ্ঞানকাণ্ডেরই অন্তর্গত তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। আবার উপনিষদ্গুলি ব্রাহ্মণাত্মক বেদের শেষভাগও বটে। বহু উপনিষদ্ আরণ্যকের অন্তর্গত। কেবল একখানি মাত্র উপনিষদ্ মন্ত্র বা সংহিতার মধ্যে। ইহার নাম ঈশোপনিষদ্—শুক্ল যজুর্বেদের চত্বারিংশৎ অধ্যায়।

১। Vedic Age, p 448

বেদান্ত

উপনিষদের এক নাম বেদান্ত (বেদ-অন্ত), বেদের শেষ অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত। কাহারো কাহারো মতে, বেদের শেষ লক্ষ্য বা প্রতিপাদ্য বা শেষ সিদ্ধান্ত ইহাতে সংগৃহীত, সেইজন্য ইহা বেদান্ত।

উপনিষদ শব্দের অর্থ

উপনিষদ্ শব্দের অর্থ নানা প্রকার। (১) যাহারা ব্রহ্মবিদ্যার নিকটে উপস্থিত হইয়া ("উপ"-) নিশ্চয়ের সহিত ("নি-") ইহার অনুশীলন করেন, ইহা তাঁহাদের সংসারের বীজস্বরূপ অবিদ্যা প্রভৃতিকে নাশ করে ("√সদ্")। এইজন্য ব্রহ্মবিদ্যার নাম উপনিষদ্। (২) যেখানে লোকেরা চারিদিকে ("পরি-") বসে ("√ সদ্") তাহাকে আমরা বলি পরিষদ্। ঠিক সেইরূপ শিষ্যেরা গুরুর নিকটে ("উপ") গিয়া যেখানে বসিতেন ("নি-√ সদ্") মূলতঃ সেই ছোট-ছোট বৈঠকের নাম ছিল উপনিষদ্। কালক্রমে এই সকল উপনিষদে বা বৈঠকে যে বিদ্যার (অর্থাৎ ব্রহ্ম বিদ্যার) আলোচনা হইত তাহারও নাম হইল উপনিষদ্। (৩) উপনিষদ্ শব্দের আর একটি অর্থ হইতেছে "রহস্য"। অতি গম্ভীর

অতি গম্ভীর এই

ও দুর্গম বলিয়া এই উপনিষদ্ বা ব্রহ্মবিদ্যাকে সাধারণ বিদ্যার ন্যায় নির্বিচারে যেখানে-সেখানে সকলের নিকট প্রকাশ করা হইত না বলিয়া ইহা ছিল রহস্য। পৃথিবীরাজ্য দান করিলেও উপনিষদ্ অতিপ্রিয় শিষ্য বা জ্যেষ্ঠপুত্র ভিন্ন আর কাহাকেও দান করা হইত না।[১]

চারি বেদেরই উপনিষদ্ আছে

ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব চারি বেদেরই উপনিষদ্ আছে। ঐতরেয় উপনিষদ্ ঐতরেয়ারণ্যকের মধ্যে। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের মধ্যে। কেন উপনিষদ্ জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে। অথর্ববেদের সহিত মুণ্ডক ও প্রশ্নোপনিষদের পরম্পরা সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

উপনিষদ্গুলির মধ্যে কতক প্রাচীন, কতক বা পরবর্তী। ভাষা, রচনার রীতি ও আলোচ্য বিষয় প্রভৃতি বিচার করিয়া দেখিলে কোন্ উপনিষদ্

১। শ্বে. উ. ৬।২২—'নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায় শিষ্যায় বা পুনঃ।'

২। অথর্ববেদীয় উপনিষৎ সাহিত্যের জন্য দ্রঃ Shende—The Religion and Philosophy of the Atharvaveda, p. 225—246.

প্রাচীন ও কোনটি পরবর্তী বুঝা শক্ত হয় না—উহাদের মধ্যে কতক পদ্যে, কতক গদ্যে, আবার কতক গদ্য ও পদ্য উভয়েই রচিত।

দশোপনিষদ্'

১। ঈশা—ঈশা (অর্থাৎ ঈশ্বরের দ্বারা) শব্দটি আরম্ভে থাকায় ইহার নাম এইরূপ। ইহা আকারে খুবই ছোট ও ইহার দুইটি মন্ত্র ছাড়া সবই পদ্যে রচিত।

২। কেন—কেন শব্দটি আরম্ভ থাকায় নাম এইরূপ—আকারে খুবই ছোট—গদ্য ও পদ্য উভয়ই আছে।

৩। কঠ—কৃষ্ণযজুর্বেদের কঠশাখার সহিত সম্বন্ধ আছে—পদ্যে রচিত।

৪। প্রশ্ন—ছয়টি প্রশ্নের সমাধান করার জন্য এই নাম—গদ্য ও পদ্য উভয়ই আছে।

৫। মুণ্ডক—ইহার ৩।২।১০এ বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি যথাবিধি "শিরোব্রত" করে, তাহাকেই ইহার আলোচিত ব্রহ্মবিদ্যা দান করিতে পারা যায়। মুণ্ডের ব্রতের সহিত সম্বন্ধ থাকায় এই নাম। শিরোব্রতে মাথায় অগ্নিধারণ করিতে হয়। ইহাতে গদ্য ও পদ্য দুইই আছে।

৬। মাণ্ডুক্য—মণ্ডূক ঋষি ইহাকে প্রকাশ করায় ইহার এই নাম।

৭। তৈত্তিরীয়—কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের যে অংশ 'তৈত্তিরীয় আরণ্যক' ইহা তাহারই অন্তর্গত—গদ্যে রচিত।

৮। ঐতরেয়—ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অন্তর্গত—গদ্যে রচিত।

৯। ছান্দোগ্য—ছান্দোগ্য বা সামবেদের ব্রাহ্মণের প্রথম অংশ আরণ্যক বলিয়া গণ্য হয়। এই উপনিষদ্খানি ইহারই অন্তর্গত। আকারে ইহা বেশ বড়, গদ্যে রচিত; মাঝে মাঝে পদ্যও আছে।

১০। বৃহদারণ্যক—শুক্ল যজুর্বেদের সুপ্রসিদ্ধ শতপথ ব্রাহ্মণের এক অংশকে আরণ্যক বলা হয়। ইহারই শেষভাগ এই উপনিষদ্। ইহা আকারে বৃহৎ এবং প্রধানতঃ আরণ্যক বলিয়া ইহার এই নাম—অধিকাংশই গদ্য, তবে মধ্যে মধ্যে পদ্যও আছে।

১১। কৌষীতকি—ঋগ্বেদেরই অন্য একটি ব্রাহ্মণ কৌষীতকি। কৌষীতকি আরণ্যক তাহারই অন্তর্গত এবং এই আরণ্যকের একটি অংশ এই উপনিষদ্।

১২। শ্বেতাশ্বতর—কৃষ্ণ যজুর্বেদের শ্বেতাশ্বতর শাখার সহিত সম্বন্ধ আছে। ইহার সমগ্রই পদ্যে।

১৩। মৈত্রায়ণী—কৃষ্ণ যজুর্বেদের মৈত্রায়ণী শাখার অন্তর্গত। ইহা মৈত্রী উপনিষদ্ নামেও প্রসিদ্ধ। ইহা গদ্যে রচিত, তবে মধ্যে মধ্যে পদ্যও দেখা যায়।

প্রসিদ্ধ দশোপনিষদ্ বলিতে উল্লিখিত প্রথম দশখানি উপনিষদ্ই বুঝিতে হইবে। আচার্য শঙ্কর মাত্র এই দশখানি উপনিষদের উপরই ভাষ্য লিখিয়াছেন

আত্মবিচার

"উপনিষদের প্রথম ও প্রধান কথা হইতেছে সমগ্র মানবের প্রথম ও প্রধান কথা, আর তাহা হইতেছে তাহার আত্মাকে বা নিজেকে লইয়া। এই আমি আছি, ইহার পর আর থাকিব না, এই চিন্তা সে সহিতে পারে না। সে চায়—যে প্রকারে হউক, তাহাকে থাকিতেই হইবে। দুঃখের, অশান্তির তো তাহার ইয়ত্তা নাই। কিরূপে ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়? পরম সম্পদ্, পরম আনন্দ, পরম শান্তি কি পাওয়া যায়? আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিরা এইসব বিষয়ে কিরূপ চিন্তা করিয়াছেন তাহা প্রধানতঃ উপনিষদ্গুলিরই মধ্যে পাওয়া যায়।"[২]

'পরা' ও 'অপরা' বিদ্যা

উপনিষদে বিদ্যাকে দুইরকমের বলা হইয়াছে, 'অপরা' অর্থাৎ নিকৃষ্ট, আর 'পরা' অর্থাৎ উৎকৃষ্ট। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ প্রভৃতি বিদ্যার নাম অপরা বিদ্যা, আর যাহা দ্বারা অক্ষর অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা। উপনিষদে এই পরা বিদ্যাই আলোচিত হইয়াছে।

উপনিষদ্ গম্ভীর, অথচ অতি উপাদেয়। ভাববিশালতায় ইহা অতুলনীয়। ভারতের সমস্ত ধর্মের মূল উপনিষদ্। ইহাদের মূল তত্ত্বটি লওয়া হইয়াছে

১। উপনিষদ্গুলির বিষয়বস্তু জানিবার জন্য দ্রঃ বেদমীমাংসা—অনির্বাণ, পৃঃ ১০৪-২২২।

২। বিধুশেখর ভট্টাচার্য—উপনিষদ্, পৃঃ ১২-১৩

উপনিষদ্ হইতেই। ভারতীয় দর্শনসমূহের মূল তত্ত্বগুলির অধিকাংশেরই স্ফুরণ হইয়াছে উপনিষদ্ হইতে। তাই উপনিষদ্ শুধু ভারতেরই নহে, সমস্ত জগতেরই অমূল্য সম্পদ্। ভিণ্টারনিৎস্ যথার্থ ই বলিয়াছেন—"প্রকৃতপক্ষে ভারতীয়গণের পরবর্তী যুগের সকল দর্শনেরই মূল রহিয়াছে উপনিষৎ সাহিত্যে।"[১]

ভাববিশালতায় অতুলনীয়

পূর্বে বলা হইয়াছে, মানবের প্রথম ও প্রধান কথা হইতেছে তাহার আত্মার বা নিজের কথা। সমস্তকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে বলিয়া আত্মাকে 'আত্মা' বলা হয়। পরে আমরা দেখিতে পাইব এই আত্মাই হইতেছে বিশ্বাত্মা। এই আত্মাই সব। তাই এই সমস্তকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে বলিয়াও ইহা আত্মা। আর এই জন্যই ইহার একটি নাম ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ

আত্মা = ব্রহ্ম

আমরা দেখিয়াছি, আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যাই হইতেছে উপনিষদের আলোচ্য। এই আত্মবিদ্যা কি এবং কেনই বা আলোচ্য, বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ী ও যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে তাহার বিশদ আলোচনা আছে।[২] ছান্দোগ্য উপনিষদেও নারদ ও সনৎসুজাত সংবাদে এই তত্ত্বই আলোচিত হইয়াছে।[৩] মৈত্রেয়ী বলিয়াছেন, "যাহাতে অমৃত হইতে পারিব না তাহার দ্বারা আমি কি করিব?"[৪] সনৎসুজাত বলিয়াছেন—"তাহাই প্রভূত, মানুষ যেখানে অন্য কিছু দেখে না, অন্য কিছু শোনে না, অন্য কিছু জানে না। আর যেখানে অন্য কিছু দেখে, অন্য কিছু শোনে, অন্য কিছু জানে তাহা অল্প।[৫] যাহা প্রভূত তাহা অমৃত, আর যাহা অল্প তাহা মরণশীল।" মুণ্ডক বলিয়াছেন—"ইহা অমৃত ব্রহ্মই; সম্মুখে ব্রহ্ম, পশ্চাতে ব্রহ্ম, দক্ষিণে উত্তরে উপরে নীচে ব্রহ্মই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই বিস্তীর্ণ বিশ্ব ব্রহ্মই।"[৬]

আত্মবিদ্যা কি

১। A History of Indian Literature, Vol I, p. 264.

২। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৩।৬ ; ৩।৮ ; ২।৪ এবং ৪।৫

৩। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৭

৪। 'যেনাহং নামৃতা স্যাং তেনাহং কিং কুর্যাম্?'

৫। ছান্দোগ্য ৭+২৩+১—নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্। ইত্যাদি।

৬। মুণ্ডক ২।২।১১

আমাদের তিনটি অবস্থা প্রসিদ্ধ; জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত বা সুষুপ্তি (অর্থাৎ যে অবস্থায় নিদ্রিত মানুষ কোনরূপ স্বপ্ন না দেখিয়া একেবারে শান্ত হইয়া থাকে)। এই তিন অবস্থার অনুভবের পরস্পর ভেদ আছে। এই তিন অবস্থাতেই যে তিনটি পৃথক্ পৃথক্ স্বতন্ত্র আত্মা, তাহা নহে। একই আত্মার তিন অবস্থায় তিন রকমে অনুভব হইয়া থাকে। এই তিন অবস্থার অতিরিক্ত আর এক অবস্থা আছে, যাহার সহিত পূর্বোক্ত ঐ তিন অবস্থার কোনো সংসর্গ নাই, যাহা উহাদের অতীত। এই অবস্থায় আত্মাকে তুরীয় অথবা উত্তম বা পুরুষোত্তম বলা হয়।[১] এই আত্মাই আসল আত্মা।

প্রসিদ্ধ তিন অবস্থা, তুরীয়

"তরোয়ালের কোশ বা খাপ থাকে। তরোয়াল খাপের মধ্যে থাকিলে খাপখানাই দেখা যায়—আসল তরোয়ালখানা দেখা যায় না, খাপের মধ্যে তাহা ঢাকা থাকে। আত্মারও যেন এইরূপ কোশ আছে। আর এই কোশ একটি মাত্র নয়, পাঁচ পাঁচটি। একটির ভিতর অন্যটি, তার ভিতর অন্য একটি, এইরূপে পরে পরে। আত্মার আসল রূপটি এই কোশগুলির দ্বারা ঢাকা আছে।" ঐ পাঁচটি কোশের প্রথমটি হইতেছে অন্নময়, দ্বিতীয়টি প্রাণময়, তৃতীয়টি মনোময়, চতুর্থটি বিজ্ঞানময় এবং পঞ্চম আনন্দময়। আসল আত্মা হইতেছে এই সমস্ত কোশের অতীত।[২]

পঞ্চকোশাতীত আত্মা

কেনোপনিষদে বলা হইয়াছে ব্রহ্ম হইতেছেন কর্ণেরও কর্ণ, মনেরও মন, বাকেরও বাক্, প্রাণেরও প্রাণ এবং চক্ষুরও চক্ষু। সেখানে চক্ষু যায় না, বাক্ যায় না, মন যায় না। যিনি বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকাশিত হন না, প্রত্যুত বাগিন্দ্রিয়ই যাঁহাদ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে তিনিই ব্রহ্ম। ইহার তাৎপর্য—এই যে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়, ইহাদের সমস্ত শক্তি বস্তুতঃ ব্রহ্মেরই শক্তি, তাহাদের নিজের নহে। মানুষ দেহ বা ইন্দ্রিয়গুলিকেই ব্রহ্ম বলিয়া মনে করে; প্রকৃতপক্ষে যাঁহা হইতে

ব্রহ্মের স্বরূপ

১। "যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥" গীতা ১৫।১৮
মাণ্ডূক্য, ৭।

২। বিধুশেখর ভট্টাচার্য—উপনিষদ্, পৃঃ ২৭-২৮।

উদ্ভব তিনিই ব্রহ্ম। কেনোপনিষদে যক্ষের গল্পে ইহা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

যাঁহার দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে তিনিই ব্রহ্ম। অগ্নি ইহার মস্তক, চন্দ্র সূর্য ইহার চক্ষু, দিক্ ইহার কর্ণ, বায়ু ইহার প্রাণ, বিশ্ব ইহার হৃদয়, পৃথিবী ইহার চরণ, আর ইনি নিজেই হইতেছেন অন্তরাত্মা (মুণ্ডক)। ইনি শুভ্র, জ্যোতিরও জ্যোতি। যাজ্ঞবল্ক্য ও গার্গীর উপাখ্যানেও ব্রহ্মতত্ত্ব বিশদীকৃত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ব্রহ্ম অক্ষর, রসহীন, গন্ধহীন, চক্ষুহীন, কর্ণহীন, বাগিন্দ্রিয়হীন, মনোহীন, তেজোহীন, প্রাণহীন, মুখহীন, মাত্রাহীন। তাঁহার ভিতর নাই, বাহির নাই। সেই অক্ষর একই ও অদ্বিতীয় ("একমেবাদ্বিতীয়ম্")। শ্বেতকেতু-আরুণির উপাখ্যানে 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' বলা হইয়াছে।

ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়

ব্রহ্মসাধনা কি করিয়া করা যাইতে পারে, এখানে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। দম, দান ও দয়া না থাকিলে সাধনমার্গে অগ্রসর হওয়া যায় না। আসক্তি হইতেছে মানবের বন্ধন[১]; অন্য কোনো বন্ধন নাই; ভারতের সমস্ত ধর্মের মূলে ইহাই দেখা যায়। উপনিষদের ধর্মেরও মূলে ইহাই রহিয়াছে। কঠোপনিষদে যম-নচিকেতার উপাখ্যানে কথোপকথনের মধ্য দিয়া কামনা, বাসনা ও আসক্তি ত্যাগ করিতে পারিলে যে ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায় তাহাই বুঝান হইয়াছে। দুইটি জিনিস আছে; একটি শ্রেয় (অর্থাৎ যাহা দ্বারা আমাদের বেশী ভাল হয়), আর অন্যটি হইতেছে প্রেয় (যাহা দ্বারা আমাদের বেশী ভাল লাগে)। ইহাদের প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন। মানুষের কাছে ইহারা উভয়েই আসে। তবে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, তিনিই বুদ্ধিমান্, যোগী। আত্মা বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে তর্ক করা চলে না। ইনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর। যে ব্যক্তির বিজ্ঞান হইতেছে সারথি, আর মন হইতেছে রজ্জু, তিনি বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হন। এই আত্মাকে বেদাধ্যয়নের দ্বারা, মেধা দ্বারা বা বহু শাস্ত্র-শ্রবণের দ্বারা পাওয়া যায় না; সত্যদ্বারা, তপস্যার দ্বারা, সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা ও নিত্য

ব্রহ্মসাধনার উপায়

১। কামাত্মতা ন প্রশস্তা ন চৈবেহাস্ত্যকামতা। কাম্যো হি বেদাধিগমঃ কর্মযোগশ্চ

ব্রহ্মচর্যদ্বারা ইঁহাকে লাভ করা যায়। "প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥"[১] যিনি সমস্ত ভূতের মধ্যে আত্মাকে দেখেন এবং সমস্ত ভূতকে আত্মার মধ্যে দেখেন তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না। যাঁহা হইতে আর উৎকৃষ্ট কিছু নাই, যাঁহা হইতে আর কিছু ক্ষুদ্র বা বৃহত্তর নাই, যিনি দ্যুলোকে বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আছেন, সেই পুরুষই এই সমস্তকে পূর্ণ করিয়া আছেন।[২] সেই পরমাত্মা দৃষ্ট হইলে সাক্ষাৎকারীর হৃদয়ের গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় ও কর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।[৩]

প্রসঙ্গক্রমে পূর্বে উপনিষদের অনেক প্রসিদ্ধ গল্পের উল্লেখ করা হইয়াছে।

উপনিষদের গল্প

গল্পগুলি ভাবগাম্ভীর্যে ও ভাষামাধুর্যে মহীয়ান্।[৪] প্রত্যেকটি গল্পই এক একটি রূপক এবং তাহাদের উদ্দেশ্য কোনো না কোনো তত্ত্ব প্রকাশ করা। সূত্রের অপেক্ষা উদাহরণ অনেক বেশী কার্যকরী। কথাটি যথাযথভাবে উপনিষৎ সাহিত্যে অনুসৃত হইয়াছে।

উপনিষদ্ আর্যজীবনের চতুর্থাশ্রমের সহিত সম্পর্কিত। সন্ন্যাসের সময় আর্যঋষিগণ সংসারের যাবতীয় মোহময় সম্পর্ক হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া অজর অমর সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের চিন্তায় বিলীন হইয়া থাকিতেন। বেদের কর্মকাণ্ডাত্মক কার্যাবলীর বৈফল্য তাঁহাদের ধ্যানী দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হইত। নশ্বর জীবনের পরপারে কি আছে জানিবার জন্য তাঁহাদের ধ্যানী দৃষ্টি তখন সর্বদাই ব্যগ্র হইয়া থাকিত।

চতুর্থাশ্রমের সহিত সম্পর্ক

পরবর্তী যুগের ধর্ম ও দর্শনের উপর উপনিষদের প্রভাব কতখানি, প্রসঙ্গক্রমে পূর্বে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা

১। মুণ্ডক উপনিষদ্, ২।২।৪

২। "বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।"

৩। মুণ্ডক, ২।২।৮

এই ত্রয়ীকে প্রস্থানত্রয় বলা হয়। ইহারাই বেদান্ত-দর্শনের ভিত্তি। ব্রহ্মসূত্রকে ন্যায়-প্রস্থান, গীতাকে স্মৃতি-প্রস্থান এবং উপনিষৎসমূহকে শ্রুতি-প্রস্থান বলে।[১] শ্রুতি অপেক্ষা স্মৃতির প্রামাণ্য দুর্বল এবং বিরোধস্থলে শ্রুতিই গ্রাহ্য। উপনিষদের ভাবমন্দাকিনী সর্বতোভাবে ব্রহ্মসূত্রের মধ্য দিয়া ও আংশিকভাবে গীতায়, প্রবাহিত হইয়াছে।

পরবর্তী যুগের ধর্ম ও দর্শনের উপর ইহাদের প্রভাব

পূর্বেই বলিয়াছি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বেদকে অনাদি অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করেন না। ম্যাক্সমুলারের মতে, "সর্বপ্রাচীন উপনিষৎ অন্ততঃ ৬০০ খ্রী: পূ: অব্দে রচিত হয়।" ম্যাকডোনেলের মতও তাই। ডা: রাধাকৃষ্ণনের মতে খ্রী: পূ: ১০০০ হইতে খ্রী: পূ: ৪০০-৩০০ অব্দের মধ্যে উপনিষৎসমূহ রচিত হয়। ভিণ্টারনিৎসের মতে রচনাকালানুক্রমে উপনিষদের শ্রেণীবিভাগ এইরূপ :— প্রথম—বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, কৌষীতকি ও কেন; দ্বিতীয় :—কঠ, ঈশা, শ্বেতাশ্বতর, মুণ্ডক ও মহানারায়ণ; তৃতীয়—প্রশ্ন, মৈত্রায়ণীয় ও মাণ্ডুক্য এবং চতুর্থ—অবশিষ্ট সমস্ত।

উপনিষদ্ বৈদিক ধর্মের বহির্মুখিতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ, ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন।'[২] কর্মকাণ্ডাত্মক যে বিদ্যা তাহা মানবকে ভোগমুখী করে। কিন্তু ভোগে সুখ নাই, ত্যাগেই সুখ। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।"[৩] উপনিষদের অনেক গল্পেই দেখা যায় বেদশাস্ত্রে পারঙ্গম যাজ্ঞিক বা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের কাছে তর্কে পরাস্ত হইয়া ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করিতেছেন। বহির্মুখী যে বৈদিক ধর্ম তাহা প্রেয়েরই নামান্তর। কিন্তু প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়ই যে নিশ্চিতরূপে আশ্রয় করা উচিত, উপনিষদ্ বারংবারই তাহা জানাইয়াছে।

বৈদিক ধর্মের বহির্মুখিতার বিরুদ্ধে ইহার প্রতিবাদ

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে কৃষ্ণও বেদের এই কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র

১। উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, পৃ: ১১—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত।
২। কঠ উপ ১।২।২৩, মুণ্ডক উপ ৩।২।৩।
৩। ঈশা উপ ১

প্রতিবাদ করিয়াছেন। "বেদ ত্রিগুণাত্মক—অর্জুন, তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও"।[১] অবিবেকী মূঢ়গণ বেদের অর্থবাদেই পরিতুষ্ট, কিন্তু ভোগ ও প্রভুত্বের প্রাপ্তিসাধক নানাবিধ ক্রিয়াবিশেষের বাহুল্যদ্বারা যাহাদের চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়াছে, তাহাদের অন্তঃকরণে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জন্মে না। "ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পর পরিচ্ছিন্ন ফলদায়ক বেদোক্ত কর্মকাণ্ডে ব্রহ্মবিদের আর কোন প্রয়োজন থাকে না—তখন তিনি কর্মকাণ্ডীয় পরিচ্ছিন্ন ফলসমূহের অতীত অখণ্ড পরিপূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধিতেই কৃতার্থ হইয়া যান।"[২]

গীতার যুক্তি

ব্রহ্ম দুই প্রকার—সাকার ও নিরাকার। ঈশোপনিষদে একটি শ্লোকেই উভয় প্রকার ব্রহ্মের কথা সুন্দর ভাবে বিবৃত হইয়াছে—"স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥"[৩] এখানে সর্বব্যাপী, জ্যোতির্ময়, অশরীরী, অক্ষত, শিরাহীন, নির্মল ও অপাপবিদ্ধ যে ব্রহ্ম তিনি নিরাকার আর যিনি সর্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সর্বোত্তম, স্বয়ম্ভূ তিনিই সাকার ব্রহ্ম তিনিই পুরুষ, তিনিই মায়োপহিতচৈতন্যাত্মক ঈশ্বর।

সাকার ও নিরাকার ব্রহ্মবাদ

উপনিষদ্ এক কথায় বলিতে চাহিয়াছে—"বিশ্বই ব্রহ্ম কিন্তু ব্রহ্মই আত্মা।" উপনিষদের সাধারণ শিক্ষা এবং মূল বক্তব্য সম্বন্ধে ডয়সেনের মতানুসারেই বলা যায়[৪]—"(১) আত্মাই জ্ঞাতা, সেজন্য কখনই আমাদের জ্ঞেয় (বস্তু) হইতে পারেন না। এ-কারণে তিনি নিজেই অজ্ঞেয়। তাঁহাকে কেবল 'নেতি' প্রক্রিয়ায় সংজ্ঞিত করা যায়।...(২) যেহেতু আত্মাই সকল ব্যবহারিক 'বহু'র মধ্যে আধ্যাত্মিক ঐক্যরূপে নিজেকে প্রকাশিত করিতেছেন—যে ঐক্য একমাত্র আমাদের চৈতন্যেই অবস্থিত (আত্মজ্ঞান-স্বরূপে)—অতএব তিনিই একমাত্র সত্তা। অতএব

ইহাদের সাধারণ শিক্ষা

১। গীতা ২।৪৫

২। দ্রষ্টব্য অশোকনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত গীতা, ২য় অধ্যায়, পৃঃ ২০৭-৮

৩। ঈশা উপ, ৪

৪। Vedic Age. p. 497।

আত্মাকে জানিলেই সব কিছু জানা হয়। বস্তুত বহুত্ব বলিয়া কিছুই নাই।... (৩) উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদ দুইটি বিরুদ্ধ মতের সমন্বয় ঘটাইয়াছে। একটি আধ্যাত্মিক, যাহা আত্মার বাহিরে কোন কিছুর অস্তিত্ব বা সত্তা স্বীকার করে না—অর্থাৎ চৈতন্য; অপরটি অভিজ্ঞতালব্ধ, যে মতে আমাদের বাহিরে বহুধা প্রকাশিত বিশ্বের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় ...(৪) এরূপে 'বিশ্বই আত্মা' বলিলে (উভয়ের) তাদাত্ম্য একেবারেই দুর্বোধ্য থাকে। এই দুর্বোধ্যতা দূর করার জন্য সুপ্রসিদ্ধ অভিজ্ঞতালব্ধ জাগতিক কারণবাদের আশ্রয় লওয়া হয় এবং আত্মাকে সব সময়েই কারণ ও ব্রহ্মাণ্ডকে তাহার ফল বা সৃষ্টিরূপে বর্ণনা করা হয়।"

উপনিষদে সন্ন্যাস এবং যুক্তির অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। জ্ঞান ও কর্মের বিরোধ লইয়া উপনিষদে যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, পরবর্তী কালে আচার্য শঙ্করের ক্ষুরধার যুক্তিতে জ্ঞানের এবং সন্ন্যাসের প্রাধান্যেই আমরা তাহার ফল দেখি। নিষ্কাম কর্মের যে কথা আমরা গীতায় শুনিতে পাই, তাহার মূলও এই উপনিষদে। ইহাই কর্মসন্ন্যাস। সর্বফল ভগবানে সমর্পণ করাই হইতেছে কর্মযোগ। উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

সন্ন্যাস, যুক্তিবাদ

"সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি, তপাংসি সর্বাণি চ যদ্‌বদন্তি যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি, তত্তে পদং সংগ্রহেণ—ব্রবীমি—ওমিত্যেতৎ।"[১] সাধারণ যুক্তি লইয়া উপনিষদের ব্রহ্ম বা ঔপনিষদপুরুষকে জানা যায় না। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, "অসীমের ক্ষেত্রে যাহা তর্কাধিগম্য, সসীমের বিষয়ে তাহাই ইন্দ্রজালতুল্য।"[২] আচার্য শঙ্করের নেতিবাদও উপনিষদের তত্ত্বের নিকট স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

ঋগ্বেদে যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে, উপনিষদে সেই একেশ্বরবাদ অদ্বৈততত্ত্বে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই পরিণতিরই এক স্তরে দেখা যায় যে দেবতাকে যখন আরাধনা করা হইতেছে তখন তাঁহাকেই একেশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ, এমন কি একমাত্র দেবতা বলিয়া

উপনিষদের অদ্বৈততত্ত্ব

১। কঠ উপ, ১।২।১৫
২। Life Divine, Vol II.

মনে করা হইতেছে; পূর্বেই বলিয়াছি উপনিষদের মূল মন্ত্রই হইতেছে বিশ্বই ব্রহ্ম, আর ব্রহ্মই আত্মা। অর্থাৎ উপনিষৎ খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডকে দেখিয়াছেন, বহুর মধ্যে একককে দেখিয়াছেন, অসংখ্য অল্পের মধ্যে ভূমার উপলব্ধি লাভ করিয়াছেন বিশ্লেষের মধ্যে সংশ্লেষকে জানিবার উপায় উপনিষদে আছে। একোঽহং বহু স্যাং প্রজায়েয়—উপনিষদ্ বিশ্বসৃষ্টির মূলে এই তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন—

"একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।

কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥" (শ্বে. উ. ৬।১১)

আবার পরবর্তী মন্ত্রেই বলা আছে—"একং বীজং বহুধা যঃ করোতি" উপনিষৎ সেই অদ্বৈত সত্যসুন্দরের উপাসনায় ব্যাপৃত।

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥" (শ্বে. উ. ৬।৭)

ব্রহ্মই জগতের পরম কারণ কিনা, শ্বেতাশ্বতরের ব্রহ্মবাদী এই প্রশ্নের সমাধান চাহিয়াছেন। ইহার উত্তরের মধ্যেই উপনিষদ্ অদ্বৈতবাদের সন্ধান আছে।

আস্তিক ও নাস্তিক মতের উপর উপনিষদের প্রভাব সমভাবেই পরিস্ফুট। উপনিষদ্ জ্ঞান, কর্ম ও উপাসনার সমুচ্চয় দেখাইয়াছে।[১] ইহাই পরবর্তী যুগে গীতায় জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি—এই মার্গত্রয়ে বর্ণিত হইয়াছে। ভারতের সকল আস্তিক ধর্মের মূলে রহিয়াছে উপনিষদের কোনো না কোনো বাণী। হিন্দুধর্মের যে নানা শাখা-প্রশাখা, সকলেই উপনিষদ্রূপে বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়াছে। আবার জৈন, বৌদ্ধ ও চার্বাক প্রভৃতি দর্শনের মূলেও এই উপনিষদ্। এমন কি, ইস্লামও উপনিষদের দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হইয়াছে।[২] পাশ্চাত্ত্য মনের উপরেও উপনিষদ্ অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সকল পাশ্চাত্ত্য মনীষীই এক বাক্যে উপনিষদের জয়গান গাহিয়াছেন। অনেকে ইহাকে জ্ঞানের আকর বা খনি আখ্যাতেও অভিহিত করিয়াছেন।

আস্তিক ও নাস্তিক মতের উপর প্রভাব

১। ঈশোপনিষদ্ই ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

২। দ্রঃ Sufism and Vedanta—Rama Chaudhuri.

বিখ্যাত জার্মান মনীষী ও দার্শনিক শোপেনহয়ার উপনিষদ্কে "মানবজ্ঞানের চরমোৎকর্ষের ফল" বলিয়াছেন।[১] তিনি প্রায়ই বলিতেন যে "ইহা (অর্থাৎ উপনিষৎ) আমার জীবনে দিয়াছে সান্ত্বনা এবং মৃত্যুকালেও আমাকে শান্তি দিবে।"[২]

পাশ্চাত্ত্য মনের উপর প্রভাব

উপনিষদের তত্ত্বগুলির মূলে দুঃখবাদ আছে না আশাবাদ আছে বিচার করিয়া দেখা উচিত। ভিণ্টারনিৎস্ বলেন, "প্রাচীন বৈদিক উপনিষদ্গুলিতে বিশ্বসম্পর্কে অসদ্বাদ বা মায়াবাদের বীজ নিহিত আছে। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য; আর তাহাই আত্মা।"[৩] কিন্তু আত্মা বা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অন্য কোন বস্তু বা গুণের অস্তিত্ব উপনিষদ স্বীকার করেন নাই। সেজন্য ক্লেশ, দুঃখ বা বেদনা প্রভৃতি ইহলৌকিক ধর্মের কোন পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। যিনি ব্রহ্মানন্দকে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহার ভয়ের কোন কারণ নাই। কারণ যিনি একত্বকে জানিয়াছেন, দেখিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে মোহই বা কি? শোকই বা কি?[৪] ব্রহ্মের অপর নাম আনন্দ। আত্মা আনন্দময়। ব্রহ্ম আনন্দময়—এই বাণীতেই ঔপনিষদ্ আশাবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে', ইত্যাদি[৫]

উপনিষদ তত্ত্বের মূলে দুঃখবাদ না আশাবাদ?

ভিণ্টারনিৎস্ সেইজন্যই বলিয়াছেন—"এরূপে উপনিষদের বক্তব্যের মূলে দুঃখবাদ নাই।"[৬] কিন্তু যতই উচ্ছ্বাসের সহিত ব্রহ্মানন্দের জয়গান কীর্তিত হইয়াছে, ততই পার্থিব অস্তিত্বের অপূর্ণতা, নশ্বরতা, অসারতা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেজন্য "মোটের উপর, পরবর্তী যুগে ভারতীয় দর্শনের সমস্ত দুঃখবাদের মূল আছে উপনিষদ্গুলিতে।"[৭]

ভিণ্টারনিৎসের মত

১। দ্রষ্টব্য *A History of Indian Literature*, Vol I, p. 20
২। Ibid, p. 267.
৩। *A History of Indian Literature*, Vol I, p. 264.
৪। 'তত্র কো মোহঃ, কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।' (গীতা)।
৫। তৈঃ উপ, ৩৬
৬। *A History of Indian iterature*, Vol I, p. 264.
৭। ঐ। উপনিষদের শিক্ষা সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য রাধাকৃষ্ণনের *Indian Philosophy*, Vol I. 139.

নয়

বেদাঙ্গ

উপনিষদ্ যুগের পর আসিল বেদাঙ্গ যুগ। এই যুগে ঋষিদের দৃষ্টি ছিল নানাদিকে। তাহার ফলেই বেদাঙ্গের উৎপত্তি। বেদের অঙ্গ 'বেদাঙ্গ'। বেদ বুঝিতে গেলে এইগুলির বিশেষ প্রয়োজন বেদাঙ্গ ছয়টি—শিক্ষা, কল্প ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ।

প্রয়োজন, সংখ্যা ও অর্থ

বিশাল বৈদিক সাহিত্যের অভ্রান্তভাবে পঠনপাঠনের ব্যবস্থার জন্যই ছয় বেদাঙ্গের সৃষ্টি।[1]

বেদপন্থীরা বেদকে স্বতঃ-উদ্ভূত বা ঈশ্বর-প্রকাশিত বলিয়া মনে করেন, কিন্তু বেদাঙ্গগুলি মুনি-ঋষিদের রচিত, কাজেই কয়েকজন রচয়িতার নাম পাওয়া যায়। মুনি বা ঋষির অর্থ জ্ঞানী বা পণ্ডিত। সেকালে সমস্ত শাস্ত্রই মুখস্থ করিয়া রাখার প্রথা ছিল, ইহার কারণ লিখিত পুস্তকাদির অভাব। অল্প কথা মনে রাখার পক্ষে সুবিধা। সেজন্য অল্প-কথায় শাস্ত্রের তাৎপর্য রচিত হইত। ইহাদের 'সূত্র' আখ্যা দেওয়া হয়। সূত্র সবগুলিই প্রায় গদ্যে রচিত, কচিৎ পদ্যেও দেখা যায়। সূত্র কাহাকে বলে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলা হইয়াছে—"স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ।"[2]

পৌরুষেয়ত্ব

ম্যাক্সমুলারের মতে সূত্রযুগ বা বেদাঙ্গযুগ উপনিষদ্‌যুগের পরবর্তী, অর্থাৎ তাঁহার মতে আনুমানিক খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ ৬০০—২০০র মধ্যে তাহারা রচিত হইয়াছিল। ভিণ্টারনিৎস্ পাণিনি ব্যাকরণের রচনাকাল আনুমানিক ৪০০

১। দ্রষ্টব্য: V. Varadachari—*A History of Sanskrit Literature*, p. 31.

২। দ্রষ্টব্য: P Chakravarti—*Philosophy of Sanskrit Grammar*.

খ্রীঃ পূর্বাব্দ ধরিয়াছেন।[১] পাণিনি ব্যাকরণ একটি প্রধান বেদাঙ্গ। অতএব তাঁহার মতে বেদাঙ্গের রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ৬০০—৪০০ অব্দই বলা যায়। অনেক লেখকের মতে বেদাঙ্গের রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ১০০০—৪০০ অব্দ। তবে এই মত সম্পূর্ণ বিচারসহ না হইলেও কোন কোন সূত্রগ্রন্থ যে ব্রাহ্মণযুগের সমসাময়িক, ভিন্টারনিৎস নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন।[২]

রচনাকাল

সায়ণ বলিয়াছেন—"অতিগম্ভীরস্য বেদস্যার্থমববোধয়িতুং শিক্ষাদীনি ষড়ঙ্গানি প্রবৃত্তানি।...............সাধনভূতধর্মজ্ঞানহেতুত্বাৎ ষড়ঙ্গসহিতানাং কর্মকাণ্ডানামপরবিদ্যাত্বম্।" অর্থাৎ বেদের অর্থ অতিশয় গম্ভীর বলিয়া তাহা বুঝিবার জন্য শিক্ষা প্রভৃতি ছয়টি বেদাঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে।

সাধারণ বিষয়বস্তু

যাহাতে বর্ণজ্ঞান ও স্বরাদি উচ্চারণের নিয়মাদির উপদেশ আছে তাহা শিক্ষা নামক বেদাঙ্গ। শিক্ষা শব্দে বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল, সাম ও সন্তানের ব্যাখ্যাই বুঝায়। বর্ণ বলিতে অকারাদি বুঝায়। স্বর বলিতে উদাত্তাদি বুঝায়। মাত্রা অর্থে হ্রস্বাদি, বল অর্থে অকারাদি বর্ণসমূহের উচ্চারণপ্রযত্নকে বুঝায়। সাম অর্থে শিক্ষার সাম্য (সমতা) বলা হইয়াছে। অতিদ্রুত, অতিবিলম্বিতাদি গীতিদোষরহিত মাধুর্যাদি গুণযুক্ত উচ্চারণকেই সাম্য বলা হয়। সন্তান শব্দের অর্থ সংহিতা বা সন্ধি। এই সমস্ত বিষয় ব্যাকরণেও বলা হইয়াছে। শিক্ষাকালীন বর্ণস্বরাদির ব্যতিক্রম উপস্থিত হইলে দোষ হয়, তাহা শিক্ষা গ্রন্থেই বলা হইয়াছে—

শিক্ষা

মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।

স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোহপরাধাৎ॥

সেইজন্য মন্ত্রের স্বর ও বর্ণাদি বিষয়ক অপরাধ বা ত্রুটি পরিহারের জন্যই শিক্ষারূপ বেদাঙ্গের অপেক্ষা রহিয়াছে। এই নিমিত্ত বেদার্থবোধের জন্য সর্বাগ্রে শিক্ষারূপ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করা কর্তব্য।[৩] শিক্ষার কতক বিষয়

১। *A History of Indian Literature*, Vol I, p. 42

২। দ্রঃ **Vedic Vge, p. 480.**

৩। ঐ **Paniniya Siksha : M. Ghosh.**

প্রাতিশাখ্য নামক গ্রন্থরাজির অন্তর্ভুক্ত। কয়েকটি বিখ্যাত শিক্ষাগ্রন্থের নাম :— আপিশলি শিক্ষা, ভারদ্বাজ শিক্ষা, নারদীয় শিক্ষা, পাণিনীয় শিক্ষা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় বেদাঙ্গ—কল্প। যাগপ্রয়োগ এই শাস্ত্রে সমর্থিত হয়, এই প্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে কল্প নামক সূত্রগ্রন্থ বেদাঙ্গ হইয়াছে। কল্পসূত্র চারি প্রকার—শ্রৌতসূত্র, ধর্মসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও শুল্বসূত্র।

কল্প : শ্রৌত, ধর্ম, গৃহ্য ও শুল্ব

শ্রৌতসূত্রের মধ্যে আশ্বলায়নের শ্রৌতসূত্রই প্রধান। শ্রৌতসূত্রে বৈদিক যজ্ঞের বিধান প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা আছে; ধর্মসূত্রে ব্রাহ্মণাদির নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠান ও ভক্ষ্যাভক্ষ্য, শুদ্ধাশুদ্ধি আর চতুরাশ্রমের কর্তব্য প্রভৃতির বিধান আছে।[১] এই ধর্মসূত্রকে অবলম্বন করিয়া খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত বহুবিধ পুস্তক প্রণীত হইয়াছে। গৌতম, আপস্তম্ব, বৌধায়ন, বশিষ্ঠ, বৈখানস প্রভৃতির লেখা ধর্মসূত্র সমধিক প্রসিদ্ধ। পরবর্তীযুগে স্মৃতি সংহিতা, স্মৃতির টীকা প্রভৃতি লইয়া এই বিভাগের বহুল প্রচার হইয়াছে। স্মৃতিগুলির অবলম্বন প্রধানত ধর্মসূত্র আর অংশত শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্র[২] গৃহ্যসূত্রে দ্বিজগণের উপনয়নাদি সংস্কার প্রভৃতির বিধান আছে। সে যুগের সামাজিক আদর্শ ও অবস্থা বুঝিতে হইলে গৃহ্য ও ধর্ম সূত্র পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য। ভিন্টারনিৎসের মতে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণেরও গৃহ্যসূত্র বিশেষ প্রয়োজনীয়।[৩] প্রাচীন ভারতের বিধিব্যবস্থা গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্র হইতেই জানা যায়। শুল্বসূত্রগুলি (বা শূল্বসূত্র) শ্রৌতসূত্রের সহিত সংযুক্ত। শুল্ব শব্দের অর্থ 'string' বা সূত্র। ইহাতে যজ্ঞবেদির মাপ, আকার ও নির্মাণ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ভারতীয় পণ্ডিতগণের মতে এ শুল্বসূত্রে যে রেখাগণিতের (বা Geometryর) বৈজ্ঞানিক ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা পৃথিবীর প্রাচীনতম।[৪] কর্ণ, ভুজ, লম্ব প্রভৃতির নাম শুল্বসূত্রে পাওয়া যায়।

১। দ্র: Dharmasutra : A study in their origin and development—S. C. Banerjee.

২। এইস্থলে বিচার্য যে, ছন্দোবদ্ধ স্মৃতিগুলি ধর্মসূত্রের পূর্ববর্তী না পরবর্তী। পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকের মতেই ছন্দোবদ্ধ স্মৃতি (Metrical Smriti) ধর্মসূত্রের পরবর্তী মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে।

৩। Social and Religious Life in the Grhiyasutras—V. M. Apte.

৪। The Science of the Sulva—B. B. Datta.

শ্রুতি হইতে আগত অর্থাৎ ত্রয়ীর নির্দেশ অনুসারে যে কর্ম অনুষ্ঠিত হইত তাহাই শ্রৌত। আর গৃহে বিনা আড়ম্বরে যে প্রাত্যহিক কর্মের অনুষ্ঠান হইত, তাহাই গৃহ্য। যাহা শ্রৌত নহে, তাহাই সাধারণত স্মার্ত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

তৃতীয় বেদাঙ্গ ব্যাকরণ। ইহা প্রকৃতি (ধাতু ও শব্দ), প্রত্যয় (সুপ্ ও তিঙ্) প্রভৃতির প্রয়োগের দ্বারা পদের স্বরূপ ও অর্থ নির্ণয় করিয়া থাকে; এইজন্য ব্যাকরণ শাস্ত্রেরও বেদার্থবিচারে যথেষ্ট উপযোগিতা রহিয়াছে। ব্যাকরণ শব্দগঠন ও ভাষা-নিয়ন্ত্রণের শাস্ত্র। অতি প্রাচীনকালে প্রাতিশাখ্য নামে প্রতি বেদের প্রতি শাখার ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ ছিল। তাহাতে কোন্ বেদে কোন্ শব্দ কি প্রকারে উচ্চারণ করা কর্তব্য তাহার নিয়মাবলী এবং স্বরসঞ্চার, সন্ধি, ছন্দ, প্রভৃতি বিষয় উক্ত হইয়াছে। প্রাতিশাখ্যকে ব্যাকরণের আদিরূপ বলা যাইতে পারে। পরবর্তীকালে সুসজ্জিত প্রাতিশাখ্যই ব্যাকরণ। বর্তমানে ব্যাকরণের প্রাচীনতম গ্রন্থ পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে পাণিনি বর্তমান ছিলেন বলিয়া ভিন্টারনিৎস মনে করেন।[১] অষ্টাধ্যায়ী সর্বজনবিদিত। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণও বলেন যে সমস্ত পৃথিবীতে এমন পরিপূর্ণ আর একখানি ব্যাকরণ নাই। অষ্টাধ্যায়ীতে ৩৮৬৩টি সূত্র আছে। আপিশলি, শাকল্য, গার্গ্য, শাকটায়ন, স্ফোটায়ন প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ পাণিনির পূর্ববর্তী। ইহারা ছাড়াও 'প্রাচ্য', 'উদীচ্য' প্রভৃতি বৈয়াকরণের উল্লেখ পাণিনি করিয়াছেন। ইহাদের রচিত গ্রন্থ কিছুই পাওয়া যায় না। মহাভাষ্যে আছে—রক্ষা, উহ, আগম, লঘু, অসন্দেহ—এই কয়েকটিই ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রয়োজন।[২] (বিস্তারিত বিবরণের জন্য সায়ণের ঋগ্বেদভাষ্যভূমিকা এবং মহাভাষ্যের পস্পশা আহ্নিক দ্রষ্টব্য।)[৩]

ব্যাকরণ

চতুর্থ বেদাঙ্গ নিরুক্ত। অর্থজ্ঞানের অপেক্ষা না রাখিয়া পদসমূহ যাহাতে

১। দ্রষ্টব্য—A History of Indian Literature, Vol I, p. 42.

২। ব্যাকরণের প্রয়োজন বিষয়ে একটি কারিকা প্রচলিত আছে:
"যদ্যপি বহু নাধীষে পঠ পুত্র ব্যাকরণম্। স্বজনঃ শ্বজনো মাভূৎ সকলঃ শকলস্তথা"॥

৩। সং ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান—সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৪৩

উক্ত হইয়াছে তাহার নাম 'নিঘণ্টু'। নিরুক্তগ্রন্থ নিঘণ্টুধৃত শব্দরাশির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দেখাইয়াছে। 'নিরুক্ত' যথাক্রমে নৈঘণ্টুক, নৈগম এবং দৈবত—এই তিন কাণ্ডে বিভক্ত। কোন্ পদ কোন্ বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয় তাহার বিচার ইহাতে আছে। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ আজও স্বীকার করেন যে বেদ বুঝিতে গেলে নিরুক্তপাঠ অপরিহার্য। পৃথিবীর প্রাচীনতম অভিধানের নিদর্শন নিঘণ্টু। কাহারও কাহারও মতে যাস্কাচার্য নিঘণ্টুকর্তা; যাস্কই পুনরায় এই নিঘণ্টুর উপর ভাষ্য লেখেন। ইহাই 'নিরুক্ত'। নিঘণ্টুতে এক এক বস্তুর যত নাম হইতে পারে সেগুলি একত্র করিয়া সুসজ্জিত আছে। নিঘণ্টু ও নিরুক্ত—উভয়েই নিঃসংশয়ে খ্রীষ্ট পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিত বলিয়া অনেকে মনে করেন। কেহ কেহ নিঘণ্টুকেও অপৌরুষেয় বলেন।

নিঘণ্টু ও নিরুক্ত

বেদার্থ বুঝিবার জন্য ছন্দঃশাস্ত্রেরও উপযোগিতা আছে। এই কারণেই স্থানে স্থানে ছন্দোবিশেষের বিধান বলা আছে। সাত প্রকার ছন্দঃ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়—গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়েই কিছু বলিয়াছি। ২৪ অক্ষরে গায়ত্রী, ২৮ অক্ষরে উষ্ণিক্; এইরূপ উত্তরোত্তর চারি অক্ষর বর্ধিত হইলে অনুষ্টুপ প্রভৃতি ছন্দ অবগত হওয়া যায়।[১] এই ছন্দ বুঝিবার জন্য যে সকল গ্রন্থ পাওয়া যায়, পিঙ্গলাচার্যের 'ছন্দঃসূত্র' তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতম। কোন্ প্রকারের কবিতায় কত অক্ষর, কত পঙ্‌ক্তি থাকিবে, পঙ্‌ক্তির মধ্যে কত অক্ষরের পর যতি থাকিবে ইত্যাদি বিষয় ইহাতে লিখিত আছে।

ছন্দঃ—পিঙ্গল

ষষ্ঠ বেদাঙ্গ জ্যোতিষ। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হইয়াছে যে, যজ্ঞকালসিদ্ধির জন্য জ্যোতিষের প্রয়োজন হয়। এই সকল কালবিশেষে যজ্ঞ করিবার বিধি আছে। কালবিশেষ অবগত করাইবার জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের উপযোগিতা আছে। চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে দিন গণনা করা হইত। অমাবস্যা, পূর্ণিমা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ তিথিতে বিশেষ বিশেষ যজ্ঞ কর্তব্য। একজন্যই জ্যোতিষের সৃষ্টি।

জ্যোতিষ

১। দ্রঃ ছন্দঃসূত্রম—পিঙ্গলাচার্য-বিরচিতম্।

শিক্ষাগ্রন্থে বলা হইয়াছে—ছন্দ বেদের পাদদ্বয়, কল্প হস্তদ্বয়, জ্যোতিষ চক্ষু, নিরুক্ত কর্ণ, শিক্ষা ঘ্রাণ, ব্যাকরণ মুখ—সেইহেতু এই পাদাদি স্বরূপ শিক্ষাদি ষড়ঙ্গসহ বেদাধ্যয়ন অবশ্য কর্তব্য।[১]

সূত্রযুগ

'সূত্রযুগ' বৈদিক সাহিত্যের শেষ যুগ বা অধ্যায়। পৌরুষের রচনার কাল হিসাবে ইহাকে 'সূত্রযুগ' নামে পৃথক্ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এই যুগে বিশাল বৈদিক সাহিত্যকে সংক্ষেপে আয়ত্ত করার চেষ্টা দেখা যায়। আর এই চেষ্টা যে কত সুচারুরূপে ফলবতী হইয়াছে পাণিনি প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠেই তাহা বিশেষভাবে প্রতীত হয়। অর্ধমাত্রা কম করিতে পারিলেও বৈয়াকরণ তথা সূত্রকার পুত্রোৎসবের আনন্দ লাভ করিতেন।

ভিণ্টারনিৎস্‌ বেদাঙ্গসাহিত্যকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন —(ক) যজ্ঞসাহিত্য বা কল্প। ইহার মধ্যে রহিয়াছে শ্রৌত, গৃহ্য, ধর্ম ও শুল্বসূত্রগুলি।

ভিণ্টারনিৎসের মতে বেদাঙ্গের বিভাগ

(খ) ভাষ্য অথবা বিবৃতিমূলক বেদাঙ্গ। এই বিভাগে তিনি শিক্ষা, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষের আলোচনা করিয়াছেন। ভারতীয় মতে বেদাঙ্গের বিভাগ যেরূপ তাহা আমরা এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই দেখাইয়াছি।

'বৃহদ্দেবতা'

বেদাঙ্গের প্রসঙ্গে অপর দুইটি অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থের উল্লেখ করা হয় নাই। কারণ সেগুলি প্রকৃত পক্ষে বেদের অঙ্গীভূত নহে। তথাপি বৈদিক সাহিত্য পঠন-পাঠনের পক্ষে তাহাদের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। ঐ দুইটি গ্রন্থই ছন্দোবদ্ধ। উহাদের রচয়িতা শৌনক। একটির নাম 'বৃহদ্দেবতা', অপরটির 'ঋগ্বিধান'। ভিণ্টারনিৎসের মতে উহারা শৌনকের রচিত নহে,

---

"১। ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে
শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
[illegible]ধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

শৌনক-শাখার কোন লেখকের রচনা হইতে পারে।[১] 'বৃহদ্দেবতা' ঋগ্বেদের ভিন্ন ভিন্ন সূক্তাশ্রিত দেবগণের নির্ঘণ্ট মাত্র, ইহাতে ঐ সকল দেবগণের বিষয়ে কাহিনী ও উপাখ্যানের অবতারণা করা হইয়াছে। ভিণ্টারনিৎস্ এইজন্য ইহাকে "ভারতীয় আখ্যান-সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ" বলিয়া মনে করেন। 'বৃহদ্দেবতা' একটি অতি প্রাচীন আখ্যানমূলক গ্রন্থ। 'ঋগ্বিধান'ও অনুরূপভাবে ঋগ্বেদ-সংহিতার বিভাগ, প্রতি সূক্ত বা প্রতিটি ঋকের অলৌকিক ক্ষমতা প্রভৃতির বিবরণমাত্র।

'ঋগ্বিধান'

'অনুক্রমণী' গ্রন্থগুলিও বেদাঙ্গের পর্যায়ে পড়ে না। ভিণ্টারনিৎস্ ইহাদিগকে "নির্ঘণ্ট", "তালিকা", "সূচীপত্র" প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। ইহারা বিভিন্ন বিষয়ে বৈদিক সংহিতাগুলির ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগ প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছে। এইগুলির মধ্যে শৌনকের 'ঋগ্বেদানুক্রমণী' ও কাত্যায়নের 'সর্বানুক্রমণী'ই সমধিক প্রসিদ্ধ।

'অনুক্রমণী'

১। দ্রষ্টব্য:—Winternitz—*A History of Indian Literature* Vol. I পৃ: ২৬৮

এপিক ও পুরাণ

দশ

এপিক

এপিক শব্দটি বিদেশী। সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এই শব্দটি প্রয়োগ করিতে হইলে প্রথমেই ইহার অর্থ স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক।

Epic of Growth
ও
Epic of Form

সাধারণতঃ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতে এপিক দ্বিবিধ,—Epic of Growth বা Authentic Epic এবং Epic of Form বা Literary Epic। প্রথমোক্ত Epic এমন একটি মহাকাব্য যাহাতে সমগ্র দেশের যুগচেতনা প্রতিফলিত হয়। ইহা শূরযুগের শূরকাব্য; ইহাতে প্রধান রস শৃঙ্গারাশ্রিত বীর এবং নায়ক জনহিতার্থে যুদ্ধব্যাপৃত বীরপুরুষ। ইহা স্বতঃস্ফূর্ত, ইহার আখ্যানভাগ যেন সর্বসাধারণের নিজস্ব সম্পদ; কবি স্বীয় কবিত্বগুণে ইহাকে অলঙ্কারাদি দ্বারা কাব্যে রূপায়িত করেন মাত্র। শেষোক্ত এপিক কবির মানসী সৃষ্টি; ইহার পরিবেশ ও পটভূমিকার সহিত যেন সর্বসাধারণের সংযোগ নাই। অনেক ক্ষেত্রেই কবি প্রথম প্রকারের এপিকের অংশবিশেষ অবলম্বনে স্বীয় যুগের ভাবে ভাবিত হইয়া ইহা রচনা করেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের এপিক কাব্যকে পাশ্চাত্ত্য সমালোচকগণ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—Popular Epic অর্থাৎ জনপ্রিয় মহাকাব্য ও Court

Popular Epic
ও
Court Epic

Epic অর্থাৎ রাজসভাশ্রিত মহাকাব্য। প্রথম প্রকারের এপিক রচিত হইয়াছিল যুগপ্রতিনিধি কবি কর্তৃক এবং জনসাধারণের জন্য, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর এপিক সৃষ্ট হইয়াছিল প্রধানতঃ রাজকীয় সাহায্যপুষ্ট কবি কর্তৃক, রাজার মনস্তুষ্টি এবং মুষ্টিমেয় কাব্যরসপিপাসু ব্যক্তিগণের চিত্তবিনোদনের জন্য। সুতরাং একটিতে আছে সহজ ও সাবলীল প্রকাশভঙ্গী, অপরটিতে রহিয়াছে অলঙ্কারমণ্ডিত কাব্যরচনায় নৈপুণ্য প্রদর্শনের সচেতন প্রয়াস। বর্তমান প্রসঙ্গে জনপ্রিয় মহাকাব্যই আলোচ্য।

ভারতবর্ষে এই এপিক কাব্যের উদ্ভব যে কোন্ সুদূর অতীতে হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের সংবাদ-সূক্তগুলি (dialogue hymns) এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থাবলীর আখ্যান, ইতিহাস ও পুরাণসমূহ পরবর্তী কালের জনপ্রিয় এপিকের অগ্রদূত স্বরূপে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে দেখা দিয়াছিল।

ভারতীয় এপিকের উৎপত্তি

সুপ্রাচীন কাল হইতেই যাগযজ্ঞাদিতে এবং অন্যবিধ কতক অনুষ্ঠানে দেব-দেবী এবং বীরগণের কাহিনী আবৃত্তি করা হইত। তাহা ছাড়া, রাজ-দরবারে রাজার এবং তাঁহার পূর্বপুরুষগণের স্তুতিগান করিবার রীতিও প্রচলিত ছিল। কালক্রমে সূত ও কুশীলব নামে দুটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। সূতগণ রাজকীয় সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়া বিশেষ উপলক্ষ্যে রাজবংশের জয়গান করিত। তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া রাজাদের নিকট বর্ণনা করিত। 'মহাভারতে' ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যুদ্ধবর্ণনাকারী সঞ্জয় এই শ্রেণীর সূতের উদাহরণ-স্বরূপ। ইহা ছাড়া, কুশীলবগণ স্থানে স্থানে বীরত্ব-গাথা গাহিয়া গাহিয়া ভ্রমণ করিত, এবং এইরূপে ইহা জনগণের মধ্যে প্রচারিত হইত। 'রামায়ণে' বর্ণিত আছে যে, রামের পুত্রদ্বয়, কুশ লব, বাল্মীকির নিকট হইতে রামের কাহিনী শিক্ষা করিয়া উহা নানাস্থানে জনসাধারণের নিকট গাহিয়া ভ্রমণ করিত। কালক্রমে মুখে মুখে প্রচলিত এই জনপ্রিয় কাহিনী ও গাথাগুলি সাহিত্যিক আকার ধারণ করিয়া জনগণের সমাদরের বস্তু হইয়া উঠিল; কিন্তু, সর্বসাধারণের প্রিয় বলিয়া অনেকেই এই সাহিত্যিক রূপে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তন প্রভৃতি করিতেন; করাও সহজ ছিল, কারণ সে যুগে হস্তলিখিত পুঁথিই ছিল সাহিত্যের বাহন। বলা বাহুল্য, এই জনপ্রিয় কাহিনীগুলি সাহিত্যিক রূপ পাইবার পূর্বেই নানা আকার ধারণ করিয়াছিল; মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনীর পরিবর্তন অনিবার্য। সংক্ষেপে এইরূপই ভারতবর্ষে এপিকের উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস।

সূত ও কুশীলব

এপিকের চলিত ও সাহিত্যিক রূপ

রামায়ণ

রামায়ণের স্বরূপ

'রামায়ণ' যে রূপে আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে, তাহাতে সাতটি কাণ্ড আছে। কাণ্ডগুলি যথাক্রমে এইরূপ :—

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ

(১) বালকাণ্ড, (২) অযোধ্যাকাণ্ড, (৩) অরণ্যকাণ্ড, (৪) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, (৫) সুন্দরকাণ্ড, (৬) যুদ্ধকাণ্ড এবং (৭) উত্তরকাণ্ড।

এই সাতটি কাণ্ডের মোট শ্লোকসংখ্যা প্রায় চব্বিশ হাজার।

'রামায়ণ'কে প্রাচীনকাল হইতেই 'আদিকাব্য' বলা হইয়াছে। জনপ্রিয় বীরত্ব-গাথার সহিত ইহাতে কাব্যের উপাদানের প্রচুর সংমিশ্রণ আছে। পরবর্তী যুগের মহাকাব্যে উপমা ও শ্লেষাদি অলঙ্কার-বাহুল্যের সূচনা রামায়ণের রচনাতেই দেখা যায়।

রামায়ণের বিভিন্ন রূপ

বর্তমানে আমরা তিনটি রূপে 'রামায়ণ'কে পাইয়া থাকি; যথা—

তিনটি রূপ

(১) পশ্চিম ভারতীয় (বা, উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় অথবা কাশ্মীরী) রূপ,

(২) বঙ্গদেশীয় রূপ,

(৩) দক্ষিণ-ভারতীয় রূপ।

এখন প্রশ্ন এই যে, একই 'রামায়ণে'র এতগুলি রূপ উদ্ভূত হইল কি করিয়া? সম্ভবতঃ, রামায়ণের মূল কাহিনীটি ভারতের বিভিন্ন অংশে ভাটগণের মুখে মুখে চলিতে চলিতে বিকৃত হইয়া পড়ে এবং উহার সাহিত্যিক রূপটি স্থানভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে।

রূপান্তরের কারণ

বিভিন্ন রূপের পরস্পর প্রভেদ

এই রূপগুলিতে শ্লোকসমূহের ক্রম, সংখ্যা ও পাঠে পরস্পরের মধ্যে ভেদ দেখা যায়।

রামায়ণের রচয়িতা

বাল্মীকিকে কবিগুরু এবং আদিকবি বলা হয়। 'রামায়ণ'কে তাঁহারই রচিত বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু বাল্মীকি নামে কোন কবির অস্তিত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। কিংবদন্তী এই যে, তিনি রত্নাকর নামে এক দস্যু ছিলেন এবং পরে তাঁহার জীবনে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে। তিনি তপস্যারত অবস্থায় বল্মীক (অর্থাৎ উইমাটি) দ্বারা আবৃত হইয়া পড়েন—ইহা হইতেই তাঁহার নাম হয় বাল্মীকি। রামায়ণের রচয়িতা যিনিই হইয়া থাকুন, তিনি মূল কাহিনীর সাহিত্যিক রূপের স্রষ্টা মাত্র; এপিক কাহিনীটি সাহিত্যিক রূপের বহুকাল পূর্বেই প্রচলিত ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাল্মীকি সাহিত্যিক রূপের স্রষ্টা

রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশ

আধুনিক অনেক পণ্ডিত মনে করেন, 'রামায়ণে'র প্রথম ও সপ্তম কাণ্ড পরবর্তী কালের সংযোজন। এই মত প্রধানতঃ নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত :—

প্রথম ও সপ্তম কাণ্ড প্রক্ষিপ্ত—যুক্তি

(১) এই দুই কাণ্ডের রচনাশৈলী ও ভাষা অপর পাঁচটি কাণ্ডের তুলনায় নিকৃষ্ট।

(২) অরণ্যকাণ্ডে মনে হয়, লক্ষ্মণের বিবাহ তখনও হয় নাই; কারণ, রামচন্দ্র শূর্পনখাকে 'অবিবাহিত' লক্ষ্মণের নিকট যাইতে বলিলেন। কিন্তু, বালকাণ্ডে লিখিত আছে যে, রামচন্দ্র ও তাঁহার অপরাপর ভ্রাতৃগণের এক সময়েই বিবাহ হইয়াছিল।

(৩) এই দুই কাণ্ডেই রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতাররূপে পরিগণিত; কিন্তু অপর কোন কাণ্ডেই তাঁহার এই পরিচয় নাই। দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ কাণ্ড পর্যন্ত রামচন্দ্র একজন মানুষই, তবে অসীম বীর্যশালী পুরুষ।

(৪) এই দুই কাণ্ডে নানাপ্রকার আখ্যান উপাখ্যান থাকায় মূল ঘটনা-প্রবাহ প্রায়ই ব্যাহত হয়; কিন্তু অপর কাণ্ডগুলিতে ঈদৃশ ব্যাপার বিরল।

(৫) প্রথম কাণ্ডে বর্ণিত কোন ঘটনা সম্বন্ধেই অপর কাণ্ডগুলিতে কোন উল্লেখ নাই।

'রামায়ণে'র বহু পুঁথির সাক্ষ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে, ইহার ষষ্ঠকাণ্ডের অন্তর্গত সীতার অগ্নিপরীক্ষার ব্যাপারটিও পরবর্তীকালের সংযোজন।[১]

ষষ্ঠকাণ্ড অংশতঃ প্রক্ষিপ্ত

যুগ যুগ ধরিয়া মুখে মুখে গীত হইতে হইতে রামায়ণকাহিনী একটি সার্বজনীন বস্তুতে পরিণত হইয়াছিল। গায়কের ও তাঁহার শ্রোতৃবর্গের রুচি অনুযায়ী সম্ভবতঃ মূল আখ্যানে সংযোজন, বিযোজন, পরিবর্তন প্রভৃতি করা হইয়াছিল। সাহিত্যে যখন এই কাহিনী রূপায়িত হইল, তখনও গ্রন্থরচয়িতৃগণ পবিত্র রাম-চরিত লিখিতে বসিয়া উহার মূল ও প্রক্ষিপ্ত অংশের মধ্যে প্রভেদ করার কথা মনেই করিতে পারিলেন না; যাহাই 'রামায়ণ' নামে প্রচলিত দেখিতে পাইলেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিলেন। ফলে ভারতের বিভিন্ন স্থানের সাহিত্যিক রূপে ইহা বিভিন্ন আকার ধারণ করিল।

প্রক্ষিপ্ত অংশের উদ্ভব

রামায়ণের রচনাকাল

'রামায়ণে'র রচনাকাল নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার; এই দুরূহত্বের একটি প্রধান কারণ এই যে, আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, বর্তমানে যে রূপে 'রামায়ণ'কে আমরা পাইতেছি তাহাতে মূল গ্রন্থের সহিত পরবর্তীকালে দুইটি সম্পূর্ণ কাণ্ড (প্রথম ও সপ্তম) এবং নানা স্থানে শ্লোকসমূহ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং প্রথমেই আমাদের দেখা প্রয়োজন, মূল 'রামায়ণ'টি কখন রচিত হইয়াছিল এবং উহার ও পরবর্তী অংশের মধ্যে ব্যবধান কত কালের।

রচনাকাল নির্ণয়ে অসুবিধার কারণ

পূর্বেই দেখিয়াছি, মূল অংশে রামচন্দ্র একজন অসীম শৌর্যসম্পন্ন পুরুষ, কিন্তু প্রক্ষিপ্ত অংশে তিনি ঈশ্বরের অবতার। 'মানুষ' রামচন্দ্র 'ঈশ্বরে' পরিণত হইতে নিশ্চয়ই বহুকাল অতীত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, প্রক্ষিপ্ত অংশে বাল্মীকিকে দেখা যায় রামচন্দ্রের সমকালীন অরণ্যবাসী ঋষিরূপে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, মূল রামায়ণের গ্রন্থকার পরবর্তী অংশে পৌরাণিক ব্যক্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছেন; এই ব্যাপার ঘটিতেও সম্ভবতঃ

মূল ও প্রক্ষিপ্ত অংশের রচনাকালের ব্যবধান

১। দ্রঃ Journal of the Oriental Institute, Baroda, Vol V, p. 292

বহু শতাব্দী অতীত হইয়াছিল। কিন্তু এই দুই অংশের রচনাকালের মধ্যে ব্যবধান ঠিক কতটুকু এবং ইহাদের রচনাকাল ঠিক কি তাহা অনির্ণেয়।

ভারতবর্ষের ঐতিহ্য অনুসারে 'রামায়ণ' 'মহাভারতের' পূর্ববর্তী। এইরূপ মনে করার প্রধান কারণ এই যে, প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী 'কৃষ্ণ' অবতার অপেক্ষা 'রাম' অবতার পূর্ববর্তী। এই যুক্তির প্রধান ত্রুটি এই যে, রামায়ণের মূল অংশে রামচন্দ্রকে আদৌ অবতার মনে করা হয় নাই। সামাজিক প্রথার তুলনা করিয়া কেহ কেহ মনে করেন, সতীদাহের কথা 'মহাভারতে' আছে কিন্তু 'রামায়ণে' নাই; সুতরাং 'রামায়ণ' 'মহাভারতে'র পূর্ববর্তী। এই যুক্তিও অবিসংবাদিত নহে, কারণ উভয় গ্রন্থেরই মূল অংশে সতীদাহ প্রথার কোন উল্লেখ নাই। পণ্ডিত য্যাকবি (Jacobi) মনে করেন, 'রামায়ণ' পূর্ববর্তী এবং ইহারই প্রভাবে 'মহাভারত' এপিক রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই মতের সমর্থনে অখণ্ডনীয় কোন প্রমাণ নাই। বরঞ্চ, ভিণ্টারনিৎস্ প্রভৃতি পণ্ডিতের মতে 'মহাভারত'ই পূর্ববর্তী। তাঁহাদের যুক্তি প্রথমতঃ এই যে, দুইটি গ্রন্থের তুলনা করিলে দেখা যায় কাব্য হিসাবে 'রামায়ণ' অনেক পরিমাণে উন্নততর এবং পরবর্তী মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। দ্বিতীয়তঃ, 'মহাভারতে' 'যুধিষ্ঠির উবাচ', 'কুন্তী উবাচ' প্রভৃতিতে প্রাচীন লোকপ্রিয় গাথার (ballad) ছাপ রহিয়াছে; কিন্তু 'রামায়ণে' গাথার রূপের কোন নিদর্শন নাই। তৃতীয়তঃ, দুই গ্রন্থে প্রতিফলিত সামাজিক অবস্থার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, মহাভারতের সমাজে লোকজন অধিকতর যুদ্ধপরায়ণ; মহাভারতের কবি যেন যুদ্ধবিগ্রহ প্রত্যক্ষ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আর অপর গ্রন্থে কবির বর্ণনা যেন আখ্যানমূলক। নারীর বহুপতিত্ব (ployandry) প্রভৃতি প্রাচীন প্রথা 'মহাভারতে' আছে, 'রামায়ণে' নাই।

'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে'র রচনা-কালের পৌর্বাপর্য

য্যাকবি'র মতে 'রামায়ণ' পূর্ববর্তী

ভিণ্টারনিৎসের মতে 'মহাভারত' পূর্ববর্তী

ভিণ্টারনিৎস্-এর মতে, রাম-গাথা প্রাচীনতর হইলেও এপিক 'রামায়ণে'র উদ্ভব হইয়াছিল সম্ভবতঃ বুদ্ধোত্তর যুগে। কতক জাতকের গল্পের সহিত

রামোপাখ্যানের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে জাতকের গল্পে রামোপাখ্যানের সহিত পরিচয় লক্ষিত হইলেও, কোথাও রাবণ বা হনুমান্ প্রভৃতির উল্লেখ নাই। তাহা ছাড়া, দশরথজাতকের সম্বন্ধে বারটি গাথার মধ্যে মাত্র একটি বর্তমান 'রামায়ণে' পাওয়া যায়। এই সমস্ত কারণে মনে হয়, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ এবং তৃতীয় শতাব্দীতে, যখন বৌদ্ধগ্রন্থ 'ত্রিপিটক' রচিত হয় তখন, সম্ভবতঃ রামোপাখ্যান প্রচলিত ছিল; কিন্তু উহা তখনও এপিক রূপ ধারণ করে নাই। 'রামায়ণ'কে বুদ্ধোত্তর যুগের রচনা বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইহাতে বুদ্ধের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই যুক্তির বিরুদ্ধে দেখান হইয়াছে যে, যে স্থানটিতে এই উল্লেখ আছে তাহা প্রক্ষিপ্ত।

ভিন্টারনিৎস্—এপিক রামায়ণ বুদ্ধোত্তর যুগে রচিত

'রামায়ণে' ব্যবহৃত ভাষার সাক্ষ্য হইতে য়্যাকবি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ইহা প্রাক্-বুদ্ধ যুগে রচিত হইয়াছিল। তাঁহার যুক্তি এইরূপ। জনগণের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রচারকল্পে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অশোক পালি ভাষার ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, পালিই তখন সর্বসাধারণের ভাষা ছিল। এমন কি, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতকেও নিশ্চয়ই এই ভাষাই জনগণের ভাষা ছিল, কারণ বুদ্ধদেব 'সকায় নিরুত্তিয়া' অর্থাৎ জনসাধারণের নিজের ভাষাতে স্বীয় ধর্মপ্রচারের অনুমতি দিয়াছিলেন; এই ভাষাও পালি ভাষা। ইহা হইতে মনে হয়, বুদ্ধদেবের সময়েই কথ্যভাষা হিসাবে সংস্কৃত ভাষার প্রচলন লুপ্ত হইয়াছিল।

য়্যাকবি—'রামায়ণ' প্রাক্-বুদ্ধ যুগে রচিত

'রামায়ণ' সংস্কৃতে রচিত। জনপ্রিয় এপিক্ হিসাবে ইহা জনগণের ভাষাতেই রচিত হইয়া থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং, এই গ্রন্থ সম্ভবতঃ সেই সময়ে রচিত হইয়াছিল যখন সংস্কৃতই সর্বসাধারণের ভাষা ছিল; সুতরাং ইহা প্রাক্-বুদ্ধ যুগের রচনা।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বেবর (Weber) মনে করেন, গ্রীস্ দেশের কবি হোমারের হেলেন এবং ট্রয়ের যুদ্ধকাহিনীর অনুকরণে 'রামায়ণ' রচিত। কিন্তু, 'রামায়ণে' যে যে স্থানে 'যবন' শব্দটির উল্লেখ আছে তাহারা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। তাহা ছাড়া, 'যবন' শব্দটি যে শুধু গ্রীক্‌দিগকেই বুঝাইত, বর্তমানে অনেকেই তাহা

'রামায়ণে' গ্রীক্ প্রভাব

মনে করেন না। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, হোমারের গল্পে ও 'রামায়ণে'র আখ্যানে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই অধিকতর।

পূর্বে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে 'রামায়ণ' ঠিক কোন্ কালের রচনা তাহা বুঝা যায় না। 'মহাভারত', বুদ্ধদেবের অভ্যুত্থান ও 'ত্রিপিটকে'র সঙ্গে তুলনায় ইহার রচনাকালের আপেক্ষিক পৌর্বাপর্য সম্বন্ধে একটা অনুমান করা যায় মাত্র। তবে, ইহার রচনাকালের নিম্নতর সীমা কতকগুলি প্রমাণবলে নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা যাইতে পারে। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতে' 'রামায়ণে'র প্রভাব কেহ কেহ লক্ষ্য করিয়াছেন। এই 'বুদ্ধচরিত' আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত। ঐ শতকের রচনা কুমারলাতের 'কল্পনামণ্ডিতিকা'তে জনসাধারণের মধ্যে 'রামায়ণে'র আবৃত্তির উল্লেখ আছে। চীনদেশীয় গ্রন্থাদি হইতে জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে, বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধুর সময়ে, 'রামায়ণ' বৌদ্ধগণের সুবিদিত গ্রন্থ ছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে জৈন বিমল সূরি স্বীয় প্রাকৃত কাব্য 'পউমচরিঅ'তে রামোপাখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্বীয় ধর্মাবলম্বিগণের নিকট বাল্মীকির গ্রন্থের প্রাকৃতরূপ উপস্থাপিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের পূর্বেই পূর্ণাঙ্গ 'রামায়ণ' যে শুধু রচিত হইয়াছিল তাহা নহে, যথেষ্ট প্রসিদ্ধিও লাভ করিয়াছিল। ভিণ্টারনিৎস্‌ও নানা যুক্তিপ্রমাণ বিবেচনা করিয়া প্রায় অনুরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, 'রামায়ণ' সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় কি তৃতীয় শতকে বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছিল।

বর্তমান 'মহাভারত'-এর রচনাকালের নিম্নতর-সীমা খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় কি তৃতীয় শতক

রামায়ণের রূপকত্ব

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত ল্যাসেন (Lassen) ও বেবরের (Weber) মতে, রামায়ণের মূল কাহিনী একটি রূপক মাত্র। তাঁহারা মনে করেন যে, রামচন্দ্র আর্যসভ্যতার প্রতীক, এবং রাবণের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযান দাক্ষিণাত্যে আর্য-প্রভাব বিস্তারের রূপক। য্যাকবি মনে করেন যে, ইহা প্রাচীন ভারতের একটি পুরাবৃত্তমাত্র।

Lassen ও Weber—রূপক য্যাকবি—পুরাবৃত্তমাত্র

'রামায়ণ' যে প্রকার রচনাই হউক, ইহা হইতে আমরা দাক্ষিণাত্যের দুইটি সভ্যতার পরিচয় পাই—একটি বানর-সভ্যতা ও অপরটি রাক্ষস-সভ্যতা। প্রথমটি আর্যগণের অনুকূল ও দ্বিতীয়টি তাঁহাদের প্রতিকূল।

রামায়ণের প্রভাব

পরবর্তী কালের সাহিত্যে ও মানবজীবনের নানা ক্ষেত্রে 'রামায়ণে'র প্রভাব সুস্পষ্ট ও অপরিসীম। কালিদাস, ভট্টি ও কুমারদাস প্রভৃতি কবি তাঁহাদের মহাকাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন এই গ্রন্থ হইতে। ভাস, কালিদাস ও ভবভূতি প্রভৃতি নাট্যকারগণের অনেক নাট্যগ্রন্থের উপজীব্য 'রামায়ণ'। বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বনে 'অধ্যাত্ম রামায়ণ', 'বশিষ্ঠ রামায়ণ' প্রভৃতি রচিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া 'মহাভারতের' বনপর্বে (২৭৩-২৯১ অধ্যায়) ও 'শ্রীমদ্ভাগবতের' নবম স্কন্ধের দশম ও একাদশ অধ্যায়ে রামোপাখ্যান বর্ণিত আছে। এই সমস্ত নিদর্শন হইতে এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তা সহজেই অনুমান করা যায়। ভারতবর্ষের জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে ইহার প্রভাব প্রবল। দেবতার মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া নগণ্য মুদির দোকানে পর্যন্ত নিয়মিত রামায়ণ পাঠের প্রচলন ছিল এবং এখনও যে নাই একথা বলা যায় না। আজ পর্যন্তও অমঙ্গল দূর করার জন্য রামায়ণ-পাঠ বিধেয় বলিয়া মনে করা হয়। রামের ভ্রাতৃবাৎসল্য, পত্নীপ্রেম ও পিতৃভক্তি, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, ভরতের ত্যাগ ও সীতার পাতিব্রত্য—আজও ভারতে এই সকল আদর্শ জাজ্বল্যমান। পরবর্তী কালে নানা প্রাদেশিক ভাষাতে বাল্মীকির 'রামায়ণের' অনুবাদ বা মূল কাহিনী অবলম্বনে গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তুলসীদাসের হিন্দী 'রামচরিতমানস', ভানুভক্তের নেপালী রামায়ণ এবং কৃত্তিবাসের বাংলা 'রামায়ণ' প্রভৃতি ইহার নিদর্শন। বাংলায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ ছাড়াও 'অদ্ভুত-রামায়ণ' রচিত হইয়াছিল। বর্তমানেও মহাবীরের পূজা ও অভিনয় ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

সংস্কৃত সাহিত্যে

জীবনে

প্রাদেশিক সাহিত্য

উত্তরকালে রামায়ণের প্রভাব সম্বন্ধে এই গ্রন্থেই ভবিষ্যদ্‌বাণী রহিয়াছে :—

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥ (বালকাণ্ড—২।৩৬-৩৭)

এই উক্তি অনেক পরিমাণে সার্থক হইয়াছে।

বার

মহাভারত

মহাভারতের স্বরূপ

ভরতবংশীয়গণের মহাযুদ্ধের সুদীর্ঘ কাহিনীর নাম 'মহাভারত'।

'মহাভারত' গ্রন্থ কিনা

মহাভারত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই গ্রন্থেই দেওয়া হইয়াছে এইরূপে—মহত্বাদ্ ভারবত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে।
(আদিপর্ব—১।৩০০)

কিন্তু প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, আমরা যে অর্থে 'গ্রন্থ' শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকি, ইহা সেই অর্থে গ্রন্থ নহে; কারণ, ইহা এক ব্যক্তির বা এক যুগের রচনা নহে। ইহার রচনার ইতিহাস আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব। 'মহাভারতে'র স্বরূপ কি তাহাই বর্তমানে আলোচ্য।

বিষয়বস্তু

কৌরব ও পাণ্ডবগণের বিরোধ, যুদ্ধ ও নানা অবস্থাবিপর্যয়ের পরে কৃষ্ণের সহায়তায় ধর্মপরায়ণ পাণ্ডবগণের জয়লাভ—ইহাই এই এপিকের মূল বিষয়বস্তু। কিন্তু, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া নানা বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। মূল বিষয়বস্তু ছাড়াও প্রাচীন ভারতের নানা বীরত্বের গাথা, বিচিত্র আখ্যান, উপাখ্যান ও পুরাকাহিনী ইত্যাদিও এই গ্রন্থে রহিয়াছে। নল-দময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবান, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা প্রভৃতি আখ্যানের আদিম সাহিত্যিক রূপটি পাওয়া যায় মহাভারতে।[১]

---

১ 'মহাভারত'র অন্যান্য উপাখ্যান ও গল্পের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বীরমাতা বিদুলার উপাখ্যান, জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ, কদ্রু-বিনতার উপাখ্যান, সমুদ্রমন্থন, রাবণ-কাহিনী, শিবিরাজার উপাখ্যান প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত লৌকিক ও রাজনৈতিক নীতি, ধর্ম, মোক্ষ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনাও 'মহাভারতে'র নানা স্থানে আছে। এই আখ্যান উপাখ্যানগুলির প্রতিপাদ্য প্রাচীনকালে রাজন্যবর্গের মূল শিক্ষণীয় বিষয়, ক্ষত্রিয়শিক্ষার্থীদের আদর্শ ও বীরত্ব। 'মহাভারতে'র বেশ কিছু অংশ চারণজাতীয় কাব্যে (Bard poetry) পূর্ণ।

এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের বিষয়বস্তু লইয়া রচিত বলিয়া এই বিপুল এপিক্‌কে কোন কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন 'a whole literature', অর্থাৎ, একটি সমগ্র সাহিত্য। বস্তুতঃ, এই একটি এপিকে সমগ্র প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিত্রটি প্রতিফলিত হইয়াছে।

সমগ্র সাহিত্য

'মহাভারতে'র বর্তমান রূপ অষ্টাদশ পর্বে রচিত; মোট শ্লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। এইজন্যই ইহাকে বলা হয় শতসাহস্রীসংহিতা। ইহা ছাড়া 'হরিবংশ' নামে ইহার একটি খিল বা পরিশিষ্ট আছে। উহার শ্লোক সংখ্যা ১৬,৩৭৪।

শতসাহস্রীসংহিতা

ভগবদ্গীতা

ইহা 'মহাভারতে'র ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে রচিত। ইহার শ্লোকসংখ্যা ৭৫০। যুদ্ধে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের উক্তি প্রত্যুক্তি লইয়া ইহার রচনা। এই 'গীতা' ভারতবর্ষে বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের অতিশয় প্রিয় হইয়াছিল এবং অদ্যাবধি ইহা ভারতীয়গণের প্রত্যহপাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্যদেশে ইহা অনুবাদের মাধ্যমে বা স্বীয়রূপে শতাধিক বৎসর ধরিয়া তত্তদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। এই জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ এই যে, 'গীতা'য় জীবনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও নানা সমস্যা সংগ্রামের মধ্যে মানুষকে শান্তি ও মুক্তিলাভের পথ প্রদর্শন করা হইয়াছে। জ্ঞানী, কর্মী এবং ভক্ত এই ত্রিবিধ লোকই ইহাতে মুক্তির সন্ধান পাইয়া থাকে। প্রায় সমস্তপ্রকার ভারতীয় দার্শনিক মতবাদের সমর্থনই গীতায় পাওয়া যায়। এই দুইটি কারণেই 'গীতা' যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। এরূপ গ্রন্থ ভারতে আর নাই। ভারতে কেন, পণ্ডিত হামবোল্ডের (Humboldt) মতে 'গীতা'—"perhaps the only truly philosophical poem which we can find in all the literatures known to us"; অর্থাৎ, বস্তু-

আকার ও বিষয়বস্তু

ইহার জনপ্রিয়তা ও তাহার কারণ

Humboldt কর্তৃক প্রশংসা

সাহিত্য আমাদের জানা আছে, তাহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ ইহাই একমাত্র দার্শনিক কাব্য।

গীতার আদিম রূপের অভাব

তৎসম্বন্ধে যুক্তি

(১) বিরোধ

'গীতা' সম্ভবতঃ আদিমরূপে আমাদের নিকট পৌঁছে নাই। ইহা মনে করার কতকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ, 'গীতা'তে অনেকগুলি বিরোধী ব্যাপার দেখা যায়। একই মোক্ষ-লাভের তিনটি পথ; যথা, জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি। কেহ কেহ মনে করেন, ইহা একটি অসামঞ্জস্যকর ব্যাপার। কিন্তু, কাহারও কাহারও মতে সংসারে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি-প্রবণ এই তিন প্রকার লোক আছে বলিয়া এই তিনটি পথে কোন বিরোধ নাই। গীতার কোন কোন স্থানে বেদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক উক্তি দেখা যায় (২।৪২ আদি শ্লোকে), আবার স্থানবিশেষে যজ্ঞের প্রশংসা রহিয়াছে (৩।১০); ইহার সঙ্গে আসক্তিহীন কর্মের প্রশংসার সামঞ্জস্য করা কঠিন। একই 'যোগ' শব্দটির অর্থ একবার বলা হইয়াছে 'সমত্ব' (২।৪৮), আবার বলা হইয়াছে 'কর্মসু কৌশলম্' (২।৫০)। কখনও সাংখ্যদর্শনের মত ইহাতে অনুসৃত হইয়াছে, কখনও বা বেদান্তদর্শনের বর্ণনা অবলম্বন করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বরূপদর্শনের বর্ণনা (১১শ অধ্যায়) পুরাণলক্ষণাক্রান্ত এবং অন্যান্য অধ্যায় হইতে স্বতন্ত্র। এই সমস্ত কারণে মনে হয়, পরবর্তী কালে 'গীতা'র অতিশয় জনপ্রিয়তাবশতঃ ইহাতে অনেক অংশ যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

(২) রচনাশৈলীর তারতম্য

গীতার রচনাকাল—খ্রীষ্টোত্তর যুগের পূর্বভাগ

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বাণভট্ট 'গীতা'কে 'মহাভারতের' অংশ বলিয়া জানিতেন। খ্রীঃ অষ্টম-নবম শতাব্দীতে 'গীতা' শঙ্করাচার্যের দর্শনকে প্রভাবিত করিয়াছিল। এই সমস্ত কারণ হইতে মনে হয়, সম্ভবতঃ খ্রীষ্টোত্তর যুগের পূর্ব-ভাগেই গীতা বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছিল।

অনুগীতা, সনৎসুজাতীয় ও নারায়ণীয়

'মহাভারতে' গীতার পরিপূরক স্বরূপ 'অনুগীতা' নামক একটি অংশ আছে। অপর একটি দার্শনিক অংশের নাম 'সনৎসুজাতীয়'। নারায়ণের প্রতি ভক্তি অবলম্বনে রচিত 'মহাভারতে'র অংশবিশেষের নাম 'নারায়ণীয়'।

মহাভারতের রচয়িতা ও রচনার ইতিহাস

প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত ধারণা এই যে, 'মহাভারত' ব্যাসদেব কর্তৃক রচিত। কিন্তু, আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই 'মহাভারত'কে একজনের বা এক কালের রচনা মনে করেন না। ইহাতে লিপিবদ্ধ বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, রচনাশৈলী ও ভাষার বিভিন্নতা, বর্ণিত ঘটনাবলীর পরস্পরবিরোধ এবং কৃষ্ণের দেবত্বে পরিণতি প্রভৃতি হইতে মনে হয়, ইহা একজনের বা এককালের রচনা হইতে পারে না। এই মতটি প্রকাশ করিতে যাইয়া ভিন্টারনিৎস্ বলিয়াছেন, যদি আমাদের বিশ্বাস করিতে হয় যে, 'মহাভারত' এক ব্যক্তির রচিত তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সেই ব্যক্তিটি "was at one and the same time, a great poet and wretched scribbler, a sage and an idiot, a talented artist and a ridiculous pedant" অর্থাৎ সেই ব্যক্তি ছিলেন একাধারে মহাকবি ও অতি নগণ্য লেখক, মহাজ্ঞানী ও মহামূর্খ এবং প্রতিভাবান্ শিল্পী ও হাস্যাস্পদ পণ্ডিতম্মন্য লোক।

ভিন্টারনিৎস — মহাভারত এককালের বা একব্যক্তির রচনা নয়

যুক্তি

এই বিশাল গ্রন্থটি যে এককালের রচনা নয়, তাহার প্রমাণ এই গ্রন্থেই পাওয়া যায়। 'মহাভারতে'র শ্লোকসংখ্যা সম্বন্ধে এক স্থানে লিখিত আছে—ইদং **শতসহস্রং** তু লোকানাং পুণ্যকর্মণাম্ (১.১.১০১); অন্য একটি স্থানে আছে—**চতুর্বিংশতিসাহস্রীং** চক্রে ভারতসংহিতাম্ (১.১.১০২)। অপর এক স্থানে লিখিত আছে—**অষ্টৌ শ্লোকসহস্রাণি অষ্টৌ শ্লোকশতানি** চ (১.২.১৩১)। এই সকল উক্তি হইতে ইহাই মনে হয় যে, এই সুবিশাল গ্রন্থ তিনটি স্তরের মধ্য দিয়া বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে; আদিগ্রন্থে শ্লোকসংখ্যা ছিল ৮,৮০০, পরবর্তী কালে ইহা হইল ২৪,০০০। সর্বশেষে ইহাতে ১০০,০০০ শ্লোক সন্নিবিষ্ট হইল। সুতরাং, বিভিন্নকালে বিভিন্ন ব্যক্তিকর্তৃক রচিত অংশসমূহের সমাবেশেই এই 'মহাভারত', এই সিদ্ধান্তই বর্তমানে অধিকাংশ পণ্ডিত গ্রহণ করিয়াছেন।

মহাভারত-রচনার তিন স্তর
(১) ৮,৮০০ শ্লোক
(২) ২৪,০০০ „
(৩) ১০০,০০০ „

মহাভারতের রচনাকাল

'মহাভারতে'র প্রাচীনত্ব
(১) ব্রাহ্মণ
(২) শ্রৌতসূত্র
(৩) গৃহ্যসূত্র
(৪) অষ্টাধ্যায়ী
(৫) মহাভাষ্য
(৬) জাতক

'মহাভারতে'র কাহিনী কোন্ সুদূর অতীত হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, তাহা নির্ণয় করার কোন উপায় নাই। কোন কোন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পরীক্ষিৎ-এর পুত্র জনমেজয়, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুত্র ভরত এবং কুরু পঞ্চাল প্রভৃতির উল্লেখ আছে। 'সাংখ্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে' কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রে' ভারত ও 'মহাভারতে'র কথা আছে। পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'তে যুধিষ্ঠির, ভীম, বিদুর ও মহাভারত প্রভৃতি শব্দগুলি আছে। 'মহাভাষ্যে' পতঞ্জলি কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থে 'মহাভারতে'র অনেক বীরের উল্লেখ এবং মুখ্য ঘটনাগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে 'মহাভারতে'র একটি সাহিত্যিক রূপ প্রচলিত ছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে সাহিত্যিক রূপ

বর্তমান রূপের রচনাকাল

Holtzmann—খ্রীঃ ১৫শ বা ১৬শ শতকের নিকট-বর্তীকাল

উক্তমতের বিরুদ্ধে যুক্তি

এখন প্রশ্ন এই, কখন ইহা বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছিল? পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত হোল্‌জ্‌ম্যান (Holtzmann) মনে করেন, সেই সময় খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ কি ষোড়শ শতকের কাছাকাছি। কিন্তু, এই মত যে সমর্থনযোগ্য নয়, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে কুমারিলভট্ট এমন কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন যেগুলি বর্তমান 'মহাভারতে' পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম হইতে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত ভূমিদানসম্পর্কিত লেখমালাতে বর্তমান 'মহাভারতে'র ত্রয়োদশ পর্বের অংশবিশেষ উদ্ধৃত আছে।

ভিণ্টারনিৎস্—সর্বশেষ রূপ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে

ভিণ্টারনিৎস্-এর মতে, 'মহাভারতে'র সর্বশেষ রূপটির উদ্ভব খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের পরে হয় নাই। ইহার উৎপত্তির ঊর্ধ্বসীমা সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী; কারণ, বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অনেক উল্লেখ ইহাতে আছে। 'রামায়ণে'র কাল-নির্ণয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে কোন

কোন পণ্ডিতের মতে ঐ গ্রন্থ হইতেও ইহা প্রাচীনতর। বর্তমান 'মহাভারতে'র

যুক্তি

রচনাকাল নির্ণয় করার প্রধান অন্তরায় এই যে, ইহাতে পূর্বকালীন ও উত্তরকালীন রচনা রহিয়াছে। তবে, ইহার সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন অংশটিও সম্ভবতঃ প্রাগৈতিহাসিক যুগে রচিত ; কারণ, শিশুনাগ বংশের যে দুইটি বিখ্যাত রাজাকে (অর্থাৎ বিম্বিসার ও অজাতশত্রু) লইয়া ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের অরুণোদয়, সেই দুইটি রাজার কোন উল্লেখ 'মহাভারতে' নাই।

মহাভারতের প্রভাব

এই সুবিশাল গ্রন্থ যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষে যে প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার প্রভাব দেখা

সংস্কৃত সাহিত্যে

যায় মহাকবিগণের ও নাট্যকারগণের রচনায়। ভাসের 'উরুভঙ্গ', কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা', ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়' ও শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত' প্রভৃতি নাট্য- ও কাব্য-গ্রন্থ ইহারই

জীবনে

উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। ভারতবাসীর জীবনেও ইহার প্রভাব অপরিসীম। শিশুকাল হইতেই 'মহাভারতে'র নীতিপূর্ণ কাহিনীগুলি এই দেশবাসীর চরিত্রগঠনে সহায়তা করে। এখনও শত শত গৃহে ইহার অংশবিশেষ নিত্যপঠিত হয়। হিন্দুর শ্রাদ্ধে ইহার কতক অংশ অবশ্যপাঠ্য। "যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে"—এই উক্তিই ইহার প্রতি অসীম শ্রদ্ধার পরিচায়ক। ইহাকে অনেক স্থলে বলা হইয়াছে কার্ষ্ণবেদ ও পঞ্চমবেদ। এই গ্রন্থের যে অংশ 'গীতা' বা 'ভগবদ্গীতা' নামে খ্যাত, তাহা হিন্দুদের বাইবেলস্বরূপ।

'মহাভারতে'র কাহিনী অবলম্বনে বিভিন্ন নব্যভারতীয় ভাষায় বহু গ্রন্থ

প্রাদেশিক সাহিত্যে

রচিত হইয়াছে। বাংলাভাষায় রচিত এই জাতীয় গ্রন্থসমূহের মধ্যে কাশীরামদাসের 'মহাভারত'ই বিখ্যাত ও ব্যাপকভাবে পঠিত।

১। [illegible]—যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ (আদিপর্ব—[illegible])।

তের

পুরাণ

'পুরাণ' শব্দের অর্থ

ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্, বৌদ্ধগ্রন্থ, অথর্ববেদ

'পুরাণ' শব্দটি অতি প্রাচীন। ইহার আদিম অর্থ 'আখ্যান' অর্থাৎ পুরাকাহিনী। ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্ ও বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে এই শব্দটি সাধারণতঃ 'ইতিহাস' অর্থে প্রচলিত, কিন্তু, 'ইতিহাস' বা 'ইতিহাসপুরাণ' বলিতে বিশেষ কোন গ্রন্থকে বুঝাইত না। অথর্ববেদে 'পুরাণ' শব্দটি সম্ভবতঃ গ্রন্থবিশেষকে বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'পুরাণ' শব্দটি 'পুরাতন' বুঝাইতেও কোন কোন স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে।[১]

পুরাণের বিষয়বস্তু

কোন কোন পুরাণে, পুরাণের বিষয়বস্তু নিম্নলিখিতরূপে নির্দেশিত হইয়াছে :—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব পুবাণং পঞ্চলক্ষণম্॥

(বিষ্ণুপুরাণ—৩।৬।২৪)

ইহার অর্থ এই যে, পুরাণগুলি সৃষ্টি, (প্রলয়ের পর) নূতন সৃষ্টি, দেবতা ও ঋষিগণের বংশাবলী, মন্বন্তর ও রাজবংশাবলী—এই পাঁচটি বিষয় লইয়া রচিত।

এই পাঁচটি লক্ষণ পুরাণের বিষয়বস্তুর আংশিক পরিচয়মাত্র। কোন কোন পুরাণে এই পাঁচটির অনেক অধিক বিষয়ও আছে। আবার কোন কোন গ্রন্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয় লইয়া রচিত। দর্শন, অলঙ্কার, ছন্দ, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়েরই আলোচনা কোন কোন পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, 'অগ্নিপুরাণে' আলোচিত অলঙ্কারশাস্ত্র এই শাস্ত্রের ইতিহাসে একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে।

---

১ 'পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বম্'—কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র'।

পুরাণের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, এই গ্রন্থগুলিতে সম্প্রদায়বিশেষের প্রভাব সুস্পষ্ট। সাধারণতঃ দেবতাবিশেষের প্রাধান্য অনুসারে অষ্টাদশ মহাপুরাণগুলিকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে লিখিত পুরাণ সাত্ত্বিক, শিবের উদ্দেশ্যে তামসিক ও ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে রচিত পুরাণসমূহ রাজসিক। পুরাণগুলিকে (১) বৈষ্ণব, (২) শৈব ও (৩) ব্রাহ্ম এইরূপ তিনটি শ্রেণীতেও বিভক্ত করা হইয়া থাকে।

পুরাণে সাম্প্রদায়িক প্রভাব

মহাপুরাণ ও উপপুরাণ—ইহাদের সংখ্যা ও নামকরণ

পুরাণ সাহিত্যে দুইপ্রকার গ্রন্থ আছে; যথা—মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। মহাপুরাণগুলি প্রায়শঃই অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর; ইহাদের প্রাধান্যও অধিকতর বলিয়া পরিগণিত। এই দুই জাতীয় গ্রন্থে মূলতঃ বিশেষ প্রভেদ নাই। তবে উপপুরাণগুলি প্রায়ই সম্প্রদায়বিশেষের ধর্মাচরণের সহায়ক হিসাবে রচিত বলিয়া মনে হয়। উপপুরাণগুলির মধ্যে কোন কোনটি বিশেষ কোন মহাপুরাণের পরিশিষ্ট হিসাবে রচিত বলিয়া কথিত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে স্বতন্ত্র গ্রন্থও আছে।

মহাপুরাণের সংখ্যা সাধারণতঃ অষ্টাদশ বলিয়া কথিত। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, পুরাণের সংখ্যা চার। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, আদিতে মাত্র একটি পুরাণ ছিল, এবং পরবর্তী কালে উহা হইতেই অপর পুরাণগুলির উদ্ভব হইয়াছিল। ভিন্টারনিৎস এই মত সমর্থন করেন না।

মহাপুরাণগুলির সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ—আঠার, চার ও এক

কোন কোন প্রসঙ্গে উপপুরাণের সংখ্যাও অষ্টাদশ বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে মহাপুরাণগুলির উল্লেখে যেমন উহাদের নামের ঐক্য রহিয়াছে, উপপুরাণগুলির বিভিন্ন তালিকায় তাহাদের নামের তেমন ঐক্য দেখা যায় না।

উপপুরাণ আঠারটি—বিভিন্ন তালিকায় নামকরণে অনৈক্য

অষ্টাদশ মহাপুরাণের নাম

মহাপুরাণগুলির নাম নিম্নলিখিতরূপ :—১। ব্রহ্ম, ২। পদ্ম, ৩। বিষ্ণু, ৪। শিব, ৫। ভাগবত, ৬। নারদ, ৭। মার্কণ্ডেয়, ৮। ভবিষ্য বা ভবিষ্যৎ, ৯। অগ্নি, ১০। ব্রহ্মবৈবর্ত, ১১। লিঙ্গ, ১২। বরাহ, ১৩। স্কন্দ, ১৪। বামন, ১৫। কূর্ম, ১৬। মৎস্য, ১৭। গরুড়, এবং ১৮। ব্রহ্মাণ্ড।

কোন কোন পুরাণে এই তালিকা দেওয়া আছে। কোন কোন তালিকায় শিবপুরাণের পরিবর্তে বায়ুপুরাণের নাম পাওয়া যায়।

বাংলা দেশের বিখ্যাত স্মার্ত রঘুনন্দনের মতে, উপপুরাণগুলির নাম নিম্নলিখিতরূপ :—

অষ্টাদশ উপপুরাণ

১। সনৎকুমার, ২। নরসিংহ, ৩। বায়ু, ৪। শিবধর্ম, ৫। আশ্চর্য, ৬। নারদ, ৭। নন্দিকেশ্বর, ৮। উশনস্, ৯। কপিল, ১০। বরুণ, ১১। শাম্ব, ১২। কালিকা, ১৩। মহেশ্বর, ১৪। কল্কি, ১৫। দেবী, ১৬। পরাশর, ১৭। মরীচি এবং ১৮। ভাস্কর ও সূর্য।

পুরাণের রচনাকাল

পুরাণগুলির ভিত্তি বেদ। বেদ ও ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহের অনেক কাহিনী পুরাণে আছে। পুরাণজাতীয় গ্রন্থের রচনা বহু প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত। 'মহাভারতে'র অনেক অংশ এবং সম্পূর্ণ 'হরিবংশ' পুরাণের আকারে রচিত। 'রামায়ণে'র শেষভাগও পুরাণাকারের রচনা। কল্পসূত্রের অন্তর্গত ধর্মসূত্র গ্রন্থে পুরাণ গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'গৌতম-

খ্রীঃ পূর্ব চতুর্থ-পঞ্চম শতকের পূর্বে

ধর্মসূত্র' (১১।১৯) এবং 'আপস্তম্বীয় ধর্মসূত্রের' (২।২৩।৬) নাম করা যায়। এই ধর্মসূত্র গ্রন্থদ্বয়ের রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক পঞ্চম কি চতুর্থ শতক। সুতরাং ইহাদের মধ্যে যে পুরাণের উল্লেখ আছে, তাহা ঐ সময়ের পূর্বে রচিত। অন্যান্য

খ্রীঃ ৭ম শতকের পূর্বে

পুরাণগুলি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের পূর্বে রচিত ; কারণ, ইহাদের মধ্যে যে সমস্ত রাজবংশের বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে হর্ষবর্ধন প্রভৃতি পরবর্তী কালের প্রসিদ্ধ রাজগণের কোন উল্লেখ নাই ;

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে রচিত বৌদ্ধ মহাযান গ্রন্থগুলির সহিত কোন কোন পুরাণের এত সাদৃশ্য যে, মনে হয়, ঐ পুরাণগুলি ঐ সময়ের নিকটবর্তী কালেরই রচনা।

খ্রীঃ ১ম শতকের নিকটবর্তী কাল

কোন কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের মতে, বিগত সহস্র বৎসরের মধ্যে পুরাণগুলি রচিত হইয়াছিল। কিন্তু, এই মতের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রমাণের অভাব নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে পুরাণ সাহিত্যের সহিত বাণভট্টের পরিচয়ের প্রমাণ আছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে বিখ্যাত মীমাংসক কুমারিল পুরাণগুলিকে ধর্মের প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় নবম শতকে শঙ্করাচার্য পবিত্র গ্রন্থ হিসাবে ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন।[১] সুতরাং, সমস্ত পুরাণই বিগত সহস্র বৎসরের রচনা, একথা বলা চলে না।

পুরাণের অর্বাচীনত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য মত

বিরুদ্ধযুক্তি

পূর্বে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, যে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের উপর পুরাণগুলি প্রতিষ্ঠিত সেই ধর্মদ্বয়ের উৎপত্তি অতিশয় অর্বাচীন। কিন্তু, আধুনিক গবেষণাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোন কোন শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল খ্রীষ্টপূর্ব যুগে, এমন কি সম্ভবতঃ বুদ্ধপূর্ব যুগেই। বর্তমান কালের গবেষণায় ইহা বিশিষ্ট প্রমাণ-মূলে স্বীকৃত হইয়াছে যে, এক একটি পুরাণের বিভিন্ন অংশ বিভিন্নকালে রচিত হইয়াছিল।

ঐতিহ্য—পুরাণসমূহের রচয়িতা ব্যাসদেব

ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে বেদসংকলয়িতা ও মহাভারতপ্রণেতা ব্যাসদেবই পুরাণসমূহের রচয়িতা; সুতরাং পুরাণগুলির রচনাকাল অতি প্রাচীন।

পুরাণের মূল্য

পুরাণগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অবিসংবাদিত। কতকগুলি রাজবংশ সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে যে তথ্য পাওয়া যায়, তাহা বিশেষ মূল্যবান্। ঐ যুগের ইতিহাস রচনা করিতে হইলে পুরাণগুলিকেই প্রধান উপজীব্য ধরিয়া নিতে হয়। পুরাণে

ঐতিহাসিক মূল্য

১ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের আদিভাগে আরবদেশের পর্যটক অলবেরুনী অষ্টাদশ পুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন।

বর্ণিত রাজবংশগুলির মধ্যে শিশুনাগ, নন্দ, মৌর্য, শুঙ্গ, অন্ধ্র ও গুপ্ত

রাজনৈতিক ইতিহাস

সমধিক উল্লেখযোগ্য। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইহাদের মধ্যে অতিরঞ্জন, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অবান্তর বিষয়সমূহ হইতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য পৃথক্ করিয়া নেওয়া কষ্টসাধ্য।

সামাজিক ইতিহাস

ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস, বিশেষতঃ ধর্মের ইতিহাস, আলোচনা করিতে হইলে পুরাণের সাক্ষ্য অপরিহার্য। পুরাণগুলির মূল্য সম্বন্ধে ভিণ্টারনিৎস্ লিখিয়াছেন :—

"They afford us far greater insight into all aspects and phases of Hinduism—its mythology, its idol-worship, its theism and pantheism, its love of God, its philosophy and its superstitions, its festivals and ceremonies and its ethics than any other works."

ভৌগোলিক তথ্য

ইহাদের মধ্যে তাৎকালিক অনেক ভৌগোলিক তথ্যও আছে।

সাহিত্যিক মূল্য

সাহিত্য হিসাবে পুরাণগুলি খুব উচ্চস্তরের নহে। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে, 'অগ্নিপুরাণে' অলঙ্কারশাস্ত্রের যে কথা আছে তাহা ঐ শাস্ত্রের ইতিহাসের পক্ষে অপরিহার্য।

পুরাণের প্রভাব

এককালে পুরাণের প্রভাব যে ব্যাপক ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

জনপ্রিয়তার প্রমাণ ও কারণ

কথিত আছে, "ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ"। জনপ্রিয় না হইলে এতগুলি বিশাল গ্রন্থ রচিত হইতে পারিত না এবং সমগ্র ভারতময় পুরাণের অসংখ্য পুঁথি থাকিত না। পুরাণগুলি জনগণের প্রিয় হওয়ার কারণও ছিল। সমাজে সকলের বেদপাঠ বা বৈদিক ধর্মচর্চার অধিকার ছিল না; কিন্তু স্ত্রী, শূদ্র প্রভৃতির পুরাণপাঠে, পুরাণ শ্রবণে এবং পৌরাণিক ধর্ম আচরণে অধিকার ছিল। পুরাণ-বর্ণিত ব্রতাদির অনুষ্ঠান সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল।

পৌরাণিক আখ্যানগুলি এত উপভোগ্য হইয়াছিল যে, কোন কোন আখ্যান অবলম্বনে প্রকৃষ্ট কাব্যনাটকাদি রচিত হইয়াছিল। 'পদ্ম-পুরাণে' বর্ণিত শকুন্তলা-উপাখ্যানের সহিত কালিদাসের শকুন্তলার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

সাহিত্যে প্রভাব

ধর্মজীবনে পুরাণগুলি যুগে যুগে প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে। শৈব ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলির মুখ্য গ্রন্থই পুরাণ; পৌরাণিক ধর্মই তাহাদের ধর্মজীবনের মূল বস্তু। পূর্বে বর্ণিত 'মার্কণ্ডেয়পুরাণে'র অন্তর্গত 'চণ্ডী' নামে অভিহিত দেবী-মাহাত্ম্যটি কতকাল ধরিয়া যে হিন্দুগণের একটি ধর্মগ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুরাণের বিষয়বস্তু নিম্নলিখিতরূপ।

ধর্মজীবনে প্রভাব

ব্রহ্মপুরাণ

পৃথিবীর উৎপত্তি ও লয় সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে নৈমিষারণ্যে ঋষিগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সূত লোমহর্ষণ ব্রহ্মোক্ত পুরাণ বিবৃত করিতে লাগিলেন। ইহার পরে পৃথিবীর সৃষ্টি, মনু ও তাঁহার বংশধরগণের জন্ম, দেব উপদেব প্রভৃতির উৎপত্তি, সূর্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজগণের বিবরণ, পৃথিবী ও উহার বিভিন্ন অংশ, এবং স্বর্গ নরকের বর্ণনা প্রভৃতি আছে। এই পুরাণের অধিকাংশে তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণের শৈশব, লীলা, বিষ্ণুর অবতার প্রভৃতি কতকগুলি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু। পুরাণটির শেষদিকে শ্রাদ্ধ, বর্ণাশ্রমধর্ম, স্বর্গ ও নরকভোগ, যুগ, মোক্ষধর্ম প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

'সৌরপুরাণে' ইহা 'ব্রহ্মপুরাণে'র খিল বা পরিশিষ্ট বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

পদ্মপুরাণ

এই পুরাণ বিশাল। ইহার দুইটি পাঠপ্রণালী (recension) আছে। প্রাচীনতর রূপটি বাংলা পুথিসমূহে রক্ষিত হইয়াছে; ইহা পাঁচখণ্ডে সম্পূর্ণ। খণ্ডগুলি যথাক্রমে এই :—

(১) সৃষ্টিখণ্ড—ইহাতে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ও ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে প্রচুর আখ্যান উপাখ্যান উপকথা প্রভৃতি আছে। ইহাতে ব্রহ্মাকে আদিকারণ বলা হইয়াছে, বিষ্ণুকে নয়। এই খণ্ডে পুষ্কর হ্রদ, দুর্গার উদ্দেশ্যে বিবিধ ব্রত, দানবদলন বিষ্ণু এবং স্কন্দের জন্ম ও বিবাহের বর্ণনা আছে।

(২) ভূমিখণ্ড—ইহাতে জগদ্বর্ণনা ও বিবিধ তীর্থের মাহাত্ম্যপ্রতিপাদক আখ্যান লিপিবদ্ধ আছে।

(৩) স্বর্গখণ্ড—'মহাভারতে'র অনেক আখ্যান এখানেও পাওয়া যায়। তন্মধ্যে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার আখ্যান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য; এই আখ্যানের সহিত কালিদাসের শকুন্তলার আখ্যানের সাদৃশ্য যথেষ্ট।

(৪) পাতালখণ্ড—পাতালের, বিশেষতঃ নাগগণের বর্ণনা ইহার মুখ্য বিষয়বস্তু। ইহাতে যে রামোপাখ্যান আছে, তাহার সাদৃশ্য রামায়ণ অপেক্ষা 'রঘুবংশে'র সহিত অধিকতর। ইহার শেষ দিকে কৃষ্ণ-গোপী, রাধা, বিষ্ণুভক্তের কর্তব্য প্রভৃতির বর্ণনা আছে।

(৫) উত্তরখণ্ড—ইহাতে বিষ্ণুভক্তি এবং বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ব্রতাদির মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। 'ক্রিয়াযোগসার' এই খণ্ডের পরিশিষ্ট স্বরূপ। ধ্যানযোগে নয়, বিবিধ ধর্মকার্য, গঙ্গাস্নান ও বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে বিবিধ পার্বণের অনুষ্ঠান দ্বারা বিষ্ণুর উপাসনা বিধেয়—ইহাই এই পরিশিষ্টের প্রতিপাদ্য বিষয়

মার্কণ্ডেয়পুরাণ ও চণ্ডী

এই পুরাণের অনেক অংশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে এমন কতক আখ্যান উপাখ্যান যাহাদের সাদৃশ্য 'মহাভারতে'র আখ্যানাদির সহিত অতি নিবিড়।

দ্রৌপদী কি করিয়া পঞ্চপতির স্ত্রী হইলেন, কেন দ্রৌপদীর সন্তানগণ অপ্রাপ্তবয়সে নিহত হইল—এইরূপ চারিটি প্রশ্ন ও উহাদের উত্তর এই পুরাণে আছে।

বিশ্বামিত্রের রোষে ও অভিশাপে হরিশ্চন্দ্রের অশেষ দুঃখ ও অবশেষে ইন্দ্রের কৃপায় তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তি—এই আখ্যান 'মার্কণ্ডেয়পুরাণে' আছে।

নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্যে বহু উপকথা এই পুরাণে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহা ছাড়া, গৃহস্থের কর্তব্য, শ্রাদ্ধ, যাগযজ্ঞ প্রভৃতির উপকারিতা ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু নীতিমূলক কথালাপ 'মার্কণ্ডেয়পুরাণে' লিপিবদ্ধ আছে।

'মার্কণ্ডেয়পুরাণে'র অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য সপ্তশতী, দুর্গামাহাত্ম্য, চণ্ডীমাহাত্ম্য বা শুধু 'চণ্ডী' নামে পরিচিত। সাতশত মন্ত্রে ইহাতে আদ্যাশক্তির দৈত্যদানবাদি বধ প্রভৃতি মহিমা কীর্তিত হইয়াছে।

'চণ্ডী' হিন্দুগণের অতি পবিত্র গ্রন্থ। দুর্গাপূজায় এবং অন্যান্য অনেক ধর্মকার্যে ইহা অবশ্যপাঠ্য। বহু ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ইহাকে নিত্যপাঠ্য মনে করেন। চণ্ডীর বিশুদ্ধ উচ্চারণযুক্ত পাঠে বা আবৃত্তিতে রোগ শোকাদি অমঙ্গল দূরীভূত হয় বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস।

'চণ্ডী' সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের পূর্বে কোন কালে রচিত হইয়াছিল।

ভাগবতপুরাণ

ইহা 'শ্রীমদ্ভাগবত' বা সংক্ষেপে 'ভাগবত' বলিয়া পরিচিত। ইহা দ্বাদশটি স্কন্ধ বা পরিচ্ছেদে রচিত; ইহার শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৮,০০০।

এই গ্রন্থের প্রধান বিষয়বস্তু কৃষ্ণের জীবনী ও লীলাকীর্তন, বিষ্ণুর অবতার-সমূহের বর্ণনা ও কলিযুগ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, এই পুরাণে প্রধানা গোপী ও কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি রাধার উল্লেখ নাই।

এই পুরাণ, বিশেষতঃ ইহার দশম স্কন্ধটি, বৈষ্ণবগণের অতিশয় প্রিয় গ্রন্থ; তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ইহাকে নিত্যপাঠ্য বলিয়া মনে করেন।

ভাষায়, রচনাশৈলীতে ও ছন্দে 'ভাগবত' পুরাণসমূহের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। বিষয়বস্তুতে 'বিষ্ণুপুরাণে'র সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

কেহ কেহ 'ভাগবত'কে প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বোপদেব-রচিত বলিয়া মনে করেন। ভিণ্টারনিৎস-এর মতে, ইহা আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দশম শতকে রচিত হইয়াছিল।

ক্লাসিক্যাল সাহিত্য

চৌদ্দ

সংস্কৃত কাব্য

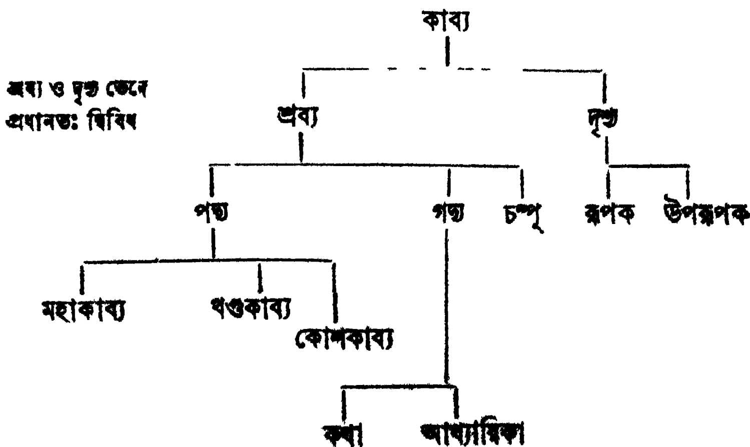
সংস্কৃতে 'কাব্য' শব্দের অর্থ

সংস্কৃত কাব্যের ইতিহাস আলোচনা করিবার পূর্বে 'কাব্য' শব্দটির তাৎপর্য সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। বাংলায় আমরা 'কাব্য' বলিতে কবিতা বুঝি এবং কবিতা-রচয়িতাকে কবি বলিয়া থাকি, অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ রচনাকে 'কাব্য' নামে অভিহিত করা হয়। সংস্কৃতে কিন্তু 'কাব্য' শব্দের অর্থ আরও ব্যাপক। 'সাহিত্যদর্পণ'কার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'; অর্থাৎ, যে বাক্যে রস আছে তাহাই কাব্য। ইহাতে এমন কথা বলা হয় নাই যে, শুধু ছন্দোবদ্ধ বাক্যকেই 'কাব্য' আখ্যা দেওয়া হয়; রসাত্মকবাক্যময় গদ্যরচনাও কাব্যপদবাচ্য।

রসাত্মক বাক্য কাব্য

সংস্কৃত কাব্যের প্রকারভেদ

আলঙ্কারিকগণের মতে কাব্যের মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ নিম্নলিখিতরূপ :—



যাহা শ্রবণ করিবার যোগ্য, তাহাই শ্রব্য। ছন্দে রচিত শ্রব্যকাব্যকে বলা হয় পদ্যকাব্য। ইহার তিনটি উপবিভাগ—মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও কোশকাব্য।

শ্রব্যকাব্য

(ক) পদ্য

১। মহাকাব্য

মহাকাব্যের নায়ক বহুগুণসম্পন্ন ও সদ্বংশজাত, প্রধান রস শৃঙ্গার, বীর অথবা শান্ত এবং বর্ণনীয় বিষয় প্রাকৃতিক দৃশ্য, সম্ভোগ বা বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি। ইহাতে সর্গসংখ্যা অন্যূন আটটি এবং ইহা নানা ছন্দে রচিত। কালিদাসের 'রঘুবংশ', ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়', শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত', মাঘের 'শিশুপালবধ' প্রভৃতি মহাকাব্য।

২। খণ্ডকাব্য

মহাকাব্যের 'একদেশানুসারি' কাব্যের নাম খণ্ডকাব্য, অর্থাৎ, খণ্ডকাব্যে মহাকাব্যের লক্ষণ আংশিকভাবে বিদ্যমান। কালিদাসের 'মেঘদূত' একটি খণ্ডকাব্য। পরস্পর নিরপেক্ষ এবং ব্রজ্যাক্রমে রচিত শ্লোকসমূহের নাম কোশকাব্য (anthology);

৩। কোশকাব্য

বল্লভদেবের 'সুভাষিতাবলী', শ্রীধরদাসের 'সদুক্তি (বা, সূক্তি-)কর্ণামৃত', জহ্লণের 'সুভাষিতমুক্তাবলী' এবং রূপগোস্বামীর 'পদ্যাবলী' প্রভৃতি কোশকাব্য। এই জাতীয় গ্রন্থে বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত করিয়া উহাদিগকে 'ব্রজ্যা' নামক এক একটি ভাগে সাজান হয়। ইহাদের মধ্যে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য উপভোগ্য। তাহা ছাড়া, কোশকাব্যে এমন অনেক কবির শ্লোক পাওয়া যায় যাঁহাদের কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না, এমন কি নাম পর্যন্তও লুপ্তপ্রায়।

বৃত্তগন্ধোজ্ঝিত অর্থাৎ ছন্দোলেশহীন রচনার নাম গদ্য। ইহার সূক্ষ্মভাগ ছাড়িয়া দিলে স্থূল দুইটি ভাগ দেখা যায়; যথা—কথা ও আখ্যায়িকা। গদ্যকাব্যের এই দ্বিবিধ ভাগ অতি প্রাচীন।

(খ) গদ্য

১। কথা

কথাতে সাধারণতঃ বিষয়বস্তু হয় সরস এবং গদ্যে রচিত হইলেও স্থানে স্থানে আর্যা, বক্ত্র ও অপবক্ত্র নামক ছন্দে রচিত শ্লোক থাকে। ইহার প্রারম্ভে পদ্যে দেবতাদির নমস্কার এবং খল চরিত্রবর্ণনা থাকে।

২। আখ্যায়িকা

আখ্যায়িকা কথারই ন্যায়; প্রভেদ এই যে, ইহাতে কবির বংশবর্ণনা ও অন্য কবির বৃত্তান্ত, শ্লোক প্রভৃতি থাকে এবং অধ্যায়গুলির নাম হয় 'আশ্বাস'। 'আশ্বাস'-এর গোড়ায় অন্য [illegible]

বর্ণনাচ্ছলে আর্যা, বক্ত্র বা অপবক্ত্র ছন্দে রচিত শ্লোকের দ্বারা ভাবী বিষয়ের সূচনা করা হয়। অমরসিংহ বলিয়াছেন, 'আখ্যায়িকা উপলব্ধার্থা' এবং 'প্রবন্ধকল্পনা কথা'; অর্থাৎ, আখ্যায়িকার বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক এবং কথার প্রতিপাদ্য বিষয় কাল্পনিক। দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত', সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' এবং বাণের 'কাদম্বরী' কথাকাব্য; বাণের 'হর্ষচরিত' আখ্যায়িকা। কথা ও আখ্যায়িকার পরস্পর ভেদ যে প্রাচীন কালেই তেমন মানিয়া লওয়া হইত না, তাহার প্রধান সাক্ষী দণ্ডী। তিনি 'কাব্যাদর্শে' বলিয়াছেন, 'কথাখ্যায়িকেত্যেকা জাতিঃ, সংজ্ঞাদ্বয়াঙ্কিতা', অর্থাৎ কিনা একই জাতীয় রচনার এই দ্বিবিধ নাম।

(গ) চম্পূ

গদ্য ও পদ্যমিশ্রিত কাব্যকে বলা হয় 'চম্পূ'। ত্রিবিক্রমভট্টের 'নলচম্পূ', সোমদেবের 'যশস্তিলক' প্রভৃতি এই জাতীয় কাব্য।

যাহা দর্শন করিবার যোগ্য তাহাকে বলা হয় 'দৃশ্য'। দৃশ্য কাব্য বলিতে নাট্যসাহিত্যকে বুঝায়। আমাদের একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাংলায় নাটক বলিতে আমরা যাহা বুঝি শুধু তাহাই দৃশ্যকাব্য নয়। এক কথায় বলা যায়, সব নাটকই দৃশ্যকাব্য কিন্তু সমস্ত দৃশ্যকাব্যই নাটক নয়। দৃশ্যকাব্যের প্রধান দুইটি ভাগ 'রূপক' ও 'উপরূপক'। নাটক, প্রকরণাদিভেদে রূপক দশটি এবং নাটিকা, ত্রোটক প্রভৃতি ভেদে উপরূপক অষ্টাদশটি।

দৃশ্যকাব্য

(ক) রূপক—দশ

(খ) উপরূপক—অষ্টাদশ

পনর

কাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

আদিকাব্য ও আদিকবি

বাল্মীকির শ্লোক

ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে নিষাদবিদ্ধ দেখিয়া বাল্মীকির শোক যে স্বতঃস্ফূর্ত শ্লোকে উৎসারিত হইয়াছিল, সেই শ্লোকটিকেই[১], সাধারণতঃ আদি-শ্লোক বলিয়া গণ্য করা হয়। সেইজন্য বাল্মীকি কবিগুরু এবং রামায়ণ আদিকাব্য। বৈদিক যুগের পরবর্তী যুগ সম্বন্ধে এই ধারণা কতক পরিমাণে সত্য হইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষে বাগ্‌দেবী কাব্যরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন সুদূর অতীতে—আর্যগণের আগমনের সমকালে।

বৈদিক যুগ হইতে কাব্যের ক্রমবিবর্তন

ঋগ্বেদে কাব্য

আর্যগণের প্রাচীনতম সাহিত্য ঋগ্‌বেদ। ঋগ্‌বেদে কোন কোন সূক্ত ভাবে ও ভাষায় যথার্থ কাব্যরসপূর্ণ। পুরূরবা ও উর্বশীর আখ্যান এবং অপর সংবাদসূক্তগুলি ও উষাদেবীর বর্ণনা[২] প্রভৃতি ঋগ্‌বেদীয় কাব্যের উজ্জ্বলতম নিদর্শন।

উপনিষদে কাব্য

উপনিষদেরও স্থানে স্থানে কাব্যলক্ষণাক্রান্ত শ্লোক দেখা যায়।

১। মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্‌ ॥ বালকাণ্ড—২।১৫
এই ঘটনাটিকে কালিদাস অতি মনোজ্ঞ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন নিম্নলিখিতরূপে :—
নিষাদবিদ্ধাণ্ডজদর্শনোত্থঃ শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ (রঘু—১৪।৭০)

২। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নলিখিত ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতে পারে :—
এষা প্রতীচী দুহিতা দিবো নৄন্‌
যোষেব ভদ্রা নি রিণীতে অপ্সঃ।
ব্যূর্ণ্বতী দাশুষে বার্যাণি
পুনর্জ্যোতি র্যুবতিঃ পূর্বথাকঃ ॥ (ঋগ্বেদ—৫।৮০।৬)
[হবির্দাতা যজমানকে বহুমূল্য সম্পদ দান করিতে করিতে পশ্চিমগামিনী এই দ্যুলোক-দুহিতা উষা সুবেশা নারীর ন্যায় তাঁহার কান্তি প্রকাশ করিতেছেন। চিরযুবতী তিনি পূর্বের ন্যায় পুনরায় জ্যোতি (বিকিরণ) করিতেছেন।]

এপিকযুগে কাহিনীর মনোজ্ঞতা সৃষ্টি করিল কবি-প্রতিভা। রামায়ণে, বিশেষতঃ সুন্দরকাণ্ডে, উৎকৃষ্ট কাব্যের অভাব নাই। মহাভারতেরও স্থানে স্থানে নানারসপ্রধান কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

এপিকে কাব্য

ক্লাসিক্যাল যুগে কাব্যের পরিবেশ ও স্বরূপ

বৈদিক ও এপিক যুগে কাব্য যেন কবিমানস হইতে স্বতউৎসারিত হইয়াছিল।

ক্লাসিক্যাল যুগে কাব্যের চর্চা এবং পরিপুষ্টি সাধিত হইল প্রধানতঃ রাজার পৃষ্ঠ-পোষকতায়। রাজসভার পরিবেশে এই যুগের অধিকাংশ কাব্যের উৎপত্তি বলিয়া রাজাদের কাহিনীই অধিক পরিমাণে কাব্যের উপজীব্য। রাজার অনুপ্রেরণাতেই এই যুগে কাব্যের উদ্ভব হইয়াছিল বটে, কিন্তু কাব্যপাঠক বা কাব্যরসিক যাঁহারা সমাজে ছিলেন, তাঁহাদের রুচির দ্বারা কাব্যের রূপটি নিশ্চয়ই অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' গ্রন্থে তদানীন্তন সমাজের যে চিত্রটি পাওয়া যায়, তাহাতে নাগরকের যে রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে কবি স্বভাবতঃই তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। নদী বা রম্য দীঘিকার সন্নিহিত উদ্যানবেষ্টিত গৃহে নাগরক বাস করেন। তাঁহার বাসগৃহ নানা বিলাসোপকরণে সুসজ্জিত। বাদ্যযন্ত্র, গ্রন্থ ও অক্ষক্রীড়ার আয়োজন পার্শ্বে রহিয়াছে। প্রাতে স্নানান্তে নানাবিধ গন্ধদ্রব্য ও অন্যান্য বিলাসোপকরণে সজ্জিত নাগরক ক্রীড়াকৌতুকে কাল অতিবাহিত করেন। দ্বিপ্রহরে নিদ্রান্তে তিনি পুনরায় বেশভূষা করিয়া বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করেন; সন্ধ্যাবেলায় সঙ্গীতসুখ ভোগ করেন। নাগরকের এইরূপ ছিল দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। নানাগুণযুক্তা বারাঙ্গনাগণের স্থানও এই সমাজে লক্ষণীয়। ইহাদের গৃহে নাগরক আমোদপ্রমোদ করিতেন। সুতরাং দেখা যায়, তদানীন্তন সমাজে কামশাস্ত্রের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। এই জন্যই সম্ভবতঃ এই যুগের কাব্যে শৃঙ্গার-রসের এত প্রাধান্য।

রাজসভা

নাগরক

একদিকে যেমন নাগরক ছিলেন, অপরদিকে তেমনই রসিক বা সহৃদয় ব্যক্তিও ছিলেন। এই শেষোক্ত কাব্যপাঠক নানারূপ উচ্চাঙ্গের সমালোচনাদ্বারা কাব্যের গুণাগুণ বিচার করিতেন। সুতরাং, অলঙ্কার-শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া কবিকে কাব্যরচনা করিতে হইত। পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে গিয়া অনেক সময় কবির রচনা হইয়াছে কৃত্রিম; এই জাতীয় অনেক রচনায় কবির স্বাভাবিক মনোভাব ব্যক্ত হয় নাই, তিনি কঠোর প্রচেষ্টাদ্বারা খ্যাতিমোহে পাণ্ডিত্যেরই পরিচয় দিয়াছেন, কবিত্বের নহে। বিবিধ অলঙ্কার ও ছন্দের প্রয়োগের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ, বিষয়বস্তুর প্রতি নহে।

সহৃদয় ব্যক্তি

পূর্বেই আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, ভারতবর্ষের সাহিত্যে কাব্য রচিত হইয়াছিল সুপ্রাচীন যুগে ঋগ্বেদে। তৎপর, নানা অবস্থার মধ্য দিয়া কাব্য-ধারা প্রবাহিত হইয়া ক্লাসিক্যাল যুগে, বিশেষতঃ গুপ্তরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায়, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

গুপ্তরাজত্ব—কাব্যের চরম উন্নতি

ম্যাক্স্‌মুলারের Renaissance theory

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত ম্যাক্স্‌মূলার মনে করিতেন যে, অনবরত গ্রীক্, শক ও কুষাণ প্রভৃতি বৈদেশিকগণের আক্রমণের ফলে খ্রীষ্টীয় প্রথম কয়েক শতক পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল এবং গুপ্তরাজগণের শাসনকালে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির পুনরভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এই সাহিত্য পুনর্জীবিত হইয়াছিল।

সংস্কৃত সাহিত্য-চর্চার সাময়িক বিরতি ও পুনরভ্যুত্থান

উক্তমতের বিরুদ্ধে যুক্তি

ম্যাকস্‌মূলারের এই Renaissance theory (রেনেসাঁ মতবাদ) সেই যুগে খুবই সমাদর লাভ করে। কিন্তু, পরবর্তী কালের গবেষণার ফলে দেখা যায়, ঐ পণ্ডিতের মত সমর্থনযোগ্য নহে। রুদ্রদামনের গীর্ণার প্রশস্তি (Girnar Inscription) প্রায় ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। ইহাতে কাব্য-কলার যথেষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। খ্রীঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর অপর একটি প্রশস্তি যদিও প্রাকৃতে রচিত, তথাপি ইহাতে প্রচুর পরিমাণে কাব্যলক্ষণ বিদ্যমান। ইহা সিরি পুলুমায়ির নাসিক প্রশস্তি।

গীর্ণার প্রশস্তি

নাসিক প্রশস্তি

লেখমালার সাক্ষ্য ছাড়িয়া দিলেও, সাহিত্যে এমন নিদর্শন আছে যাহা দ্বারা ম্যাক্স্‌মুলারের মতের ভ্রান্তি-নিরসন হইতে পারে। ভামহের 'কাব্যালঙ্কার'-এর টীকায় নমিসাধু পাণিনির 'পাতাল-বিজয়' নামক মহাকাব্য হইতে শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। পাণিনির 'জাম্ববতী-বিজয়' নামক কাব্য হইতে রায়মুকুট 'অমরকোশ'-এর টীকায় অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কোন কোন কোশ-কাব্যেও পাণিনির নামে শ্লোক দেখা যায়।[১] খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর লোক বলিয়া বৈয়াকরণ পাণিনিকে সাধারণতঃ মনে করা হইয়া থাকে। অবশ্য এই পাণিনি ও বিখ্যাত বৈয়াকরণ পাণিনি অভিন্ন কিনা বলা যায় না। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে পতঞ্জলি তাঁহার 'মহাভাষ্যে' একটি 'বাররুচকাব্যে'র উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি কাব্যলক্ষণাক্রান্ত বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কবি পাণিনি

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির সাক্ষ্য—বাররুচকাব্য ও শ্লোকসমূহের উদ্ধৃতি

'সৌন্দরনন্দ' ও 'বুদ্ধচরিত' অশ্বঘোষের দুইটি উৎকৃষ্ট কাব্য। অশ্বঘোষের কাল খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কোন সময়ে বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্তৃক নির্ণীত হইয়াছে। ইহা দ্বারাও ম্যাক্স্‌মুলারের মতের ভ্রান্তি প্রমাণিত হইতে পারে।

অশ্বঘোষ

ভারতীয় কাব্যসাহিত্যে প্রাকৃত যুগ

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, ভারতীয় কাব্যসাহিত্যে একটি প্রাকৃত যুগ ছিল এবং পরবর্তী কালে তাহার আদর্শেই সংস্কৃত কাব্য গড়িয়া উঠে। এই মতের সমর্থনে অখণ্ডনীয় কোন যুক্তি বা অবিসংবাদিত কোন প্রমাণ নাই।

প্রমাণের অভাব

১। 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' ও 'সুভাষিতাবলী' দ্রষ্টব্য।

ষোল

বৃহৎকথা

মূল বৃহৎকথার স্বরূপ, রচয়িতা ও রচনার ইতিহাস

প্রসিদ্ধি এই যে, ইহা ভূতভাষা বা পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাকৃত গ্রন্থের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে পারে। কিন্তু পরবর্তী কালের সংস্কৃত কাব্যের উপর ইহা যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার জন্য ইহার আলোচনা এস্থলে আবশ্যক। গুণাঢ্য নামে জনৈক ব্যক্তি ইহার রচয়িতা বলিয়া খ্যাত। কথিত আছে যে, গুণাঢ্য এবং কাতন্ত্রব্যাকরণ-প্রণেতা সর্ববর্মা উভয়েই রাজা সাতবাহনের প্রিয়পাত্র ছিলেন। অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে রাজাকে সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন করিবার বিষয় লইয়া তাঁহাদের উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। ইহাতে পরাস্ত হইয়া গুণাঢ্য সংস্কৃত ভাষার চর্চা পরিত্যাগ করিয়া বিন্ধ্য পর্বতে বাস করিতে থাকেন। সেখানে তিনি পৈশাচী ভাষা আয়ত্ত করিয়া ঐ ভাষায় সাত লক্ষ শ্লোকে বিশাল গ্রন্থ 'বৃহৎকথা' রচনা করেন। পরবর্তী কালে 'বৃহৎকথা' অবলম্বনে রচিত তিনটি গ্রন্থই ছন্দোবদ্ধ। কিন্তু, দণ্ডীর সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, মূল 'বৃহৎ-কথা' 'কথা' শ্রেণীর গদ্যকাব্য।

বৃহৎকথার রচয়িতা ও স্বরূপ

গুণাঢ্য

রচনাকাল—পরবর্তী রূপ

মূল প্রাকৃত গ্রন্থটি লুপ্ত। বাণভট্ট ও সুবন্ধুর গ্রন্থে 'বৃহৎকথা'র যে উল্লেখ আছে তাহা হইতে মনে হয়, ইহা খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের পূর্বেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কোন্ কোন পণ্ডিতের মতে ইহার রচনাকাল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের পরে হইতে পারে না। কেহ কেহ মনে করেন, মূল 'বৃহৎকথা' খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকের রচনা। মূল 'বৃহৎকথা'র বিষয়বস্তু বা তাহার আদিম আকার জানিবার কোন উপায় নাই। বর্তমানে ইহা অবলম্বনে রচিত কাশ্মীরী ও নেপালী—এই দুইটি রূপ পাওয়া যায়। কাশ্মীরী রূপের দুইটি গ্রন্থ আছে,

কাশ্মীরী ও নেপালী রূপ

যথা, ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী' (১০৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) ও সোমদেবের 'কথা-সরিৎ-সাগর' (১০৬৩-৮১ খ্রীষ্টাব্দ)। বুধস্বামীর 'বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহে' (খ্রীষ্টীয় অষ্টম ও দশম শতকের মধ্যবর্তী কালে রচিত) নেপালীরূপটি পাওয়া যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, 'বৃহৎকথা'র এই তিনটি বর্তমান রূপই ছন্দোবদ্ধ পদে রচিত। এই তিন রূপের মধ্যে, 'কথা-সরিৎ-সাগর' সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। কিন্তু Keith বলেন যে, 'বৃহৎ-কথা-শ্লোক-সংগ্রহ' সর্বাপেক্ষা অধিক মূলানুগ।

উত্তরকালের সাহিত্যে প্রভাব

'বৃহৎকথা' পরবর্তী কালের বহু শ্রব্যকাব্য ও দৃশ্যকাব্যকে অনেক পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছিল। সোমদেবের 'যশস্তিলকচম্পূ', ধনপালের 'তিলকমঞ্জরী' এবং দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থে 'বৃহৎকথা'র প্রভাব বিদ্যমান। 'মেঘদূতে' কালিদাস 'উদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধ'-গণের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তা' ও 'প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ' নামক নাটক দুইটির উপজীব্য এই কাহিনী। এই সকল প্রমাণ হইতে উদয়নের কাহিনীর প্রসার ও খ্যাতি অনুমেয়। প্রাচীন কাল হইতেই এই সকল কাহিনী প্রচলিত ছিল; গুণাঢ্যের কবিপ্রতিভার জন্যই ইহারা সম্ভবতঃ অধিকতর প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। পরবর্তী কালে শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' ও 'প্রিয়দর্শিকা' নামক নাট্যগ্রন্থদ্বয়ও এই কাহিনী অবলম্বন করিয়াই রচিত।

পদ্যে, গদ্যে, নাট্য-সাহিত্যে

সতর

পদ্যকাব্য

পদ্যের রূপ ও পদ্যরচনার ইতিহাস

বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, "ছন্দোবদ্ধপদং পদ্যম্"—ছন্দে রচিত পদসমূহের নামই পদ্য। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে ভাবের বাহনস্বরূপে পদ্যই প্রাচীনতম। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্য ঋগ্বেদের সূক্তগুলি পদ্যময়। সংহিতাযুগের অন্যান্য গ্রন্থেও গদ্য অপেক্ষা পদ্যেরই প্রাধান্য দেখা যায়। কর্মকাণ্ডের প্রসারের যুগে, ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে গদ্য স্বপ্রভাব বিস্তার করিল বটে; কিন্তু উপনিষদে পুনরায় পদ্যের প্রভাব পরিস্ফুট। বেদাঙ্গের যুগে দেখা যায় অনেক বেদাঙ্গ পদ্যে রচিত। এপিক যুগে পদ্যই বীরত্বের কাহিনীর একমাত্র বাহন। পুরাণগুলিতেও পদ্যেরই প্রাধান্য। ক্লাসিক্যাল যুগে পদ্য ও গদ্য উভয়প্রকার কাব্যই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু পদ্যকাব্যই অধিকতর সমাদৃত ও প্রসিদ্ধ।

ছন্দোবদ্ধ পদ

ঋগ্বেদ

উপনিষদ

বেদাঙ্গ

এপিক, পুরাণ

ক্লাসিক্যাল যুগ

ক্লাসিক্যাল যুগের পদ্যকাব্যের শ্রেণী-বিভাগ ও উৎপত্তিকাল

ক্লাসিক্যাল যুগের পদ্যকাব্যের শ্রেণীবিভাগ আমরা চতুর্দশ অধ্যায়ে দেখিয়াছি। এই যুগের কাব্য প্রথম কখন রচিত হইল, তাহা অনির্ণেয়। পঞ্চদশ অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, পাণিনি ও পতঞ্জলির সাক্ষ্য হইতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, তাঁহাদের কালেও বহু কাব্যগ্রন্থ সুবিদিত ছিল। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে পাণিনি হইতে আরম্ভ করিয়া অশ্বঘোষের আবির্ভাব পর্যন্ত সমস্ত কাব্যগ্রন্থই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

এই যুগের পদ্যকাব্যের ক্রমবিবর্তন ও যুগ-বিভাগ

ক্লাসিক্যাল যুগের কাব্য বলিতে প্রথমেই কালিদাসের কথা মনে পড়ে। ইহার কারণ, এই যুগে কালিদাস এত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার

যশঃপ্রভা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কাব্যগুলিকে ম্লান করিয়া দিয়াছিল। এই যুগের সাহিত্যগগনে প্রদীপ্ত কালিদাস-ভাস্করের উদয়ে অপরাপর কবিতারকা দৃষ্টির অগোচর হইয়া পড়িল। তথাপি কাব্যের ইতিহাসে যে উষাকাল ও অরুণোদয় ছিল এবং কাব্যের ভাস্বর জ্যোতি যে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া অস্তমিত হইয়াছিল, এ স্বাভাবিক নিয়মটির প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। সর্বসম্মতিক্রমে কালিদাসই এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া আমরা তাঁহাকেই কবিগোষ্ঠীর মধ্যমণিস্বরূপ রাখিয়া কাব্যের নিম্নলিখিতরূপ যুগবিভাগ করিতে পারি :—

কালিদাসপূর্ব যুগ

কালিদাস

কালিদাসোত্তর যুগ

কালিদাস-পূর্ব যুগ

এই যুগের একমাত্র কবি অশ্বঘোষ। তাঁহার প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ তিনটি—১। বুদ্ধচরিত, ২। সৌন্দরনন্দ ও ৩। গণ্ডীস্তোত্রগাথা।

১। বুদ্ধচরিত

'বুদ্ধচরিত' বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনী অবলম্বনে রচিত। বৈদেশিক পর্যটক ইৎসিং (I-tsing)-এর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ইহা অষ্টাবিংশতি সর্গে রচিত হইয়াছিল। চীনা ও তিব্বতী ভাষায় যে অনুবাদ রহিয়াছে, তাহাতেও সর্গসংখ্যা অনুরূপ। কিন্তু অধুনাপ্রাপ্ত সংস্কৃতকাব্যে মাত্র সপ্তদশটি সর্গ আছে। ইহাদের মধ্যে শেষ চারিটি অশ্বঘোষের রচিত কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। অষ্টাবিংশতি সর্গে রচিত মূল 'বুদ্ধচরিতে'র প্রারম্ভ গৌতমের জন্ম লইয়া এবং শেষ অশোকের রাজত্ব বর্ণনায়।

২। সৌন্দরনন্দ

'সৌন্দরনন্দ' অষ্টাদশ সর্গে রচিত। ইহার বিষয়বস্তু, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দের অনিচ্ছাসত্ত্বে বুদ্ধদেব কর্তৃক স্বীয় ধর্মে তাঁহার দীক্ষা।

৩। গণ্ডীস্তোত্রগাথা

'গণ্ডীস্তোত্রগাথা' গীতিধর্মী। উনত্রিশটি শ্লোকে ইহাতে গণ্ডী[১]র প্রশংসা করা হইয়াছে।

১ বৌদ্ধগণের বিহারে রক্ষিত কাঁসরবিশেষ (gong).

অশ্বঘোষের রচনা পরবর্তী যুগের কবিগণের রচনা অপেক্ষা প্রাঞ্জল। তাঁহার গ্রন্থগুলির ভাষা ও ভাবের স্বচ্ছন্দগতি হৃদয়গ্রাহী। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে, বিশেষতঃ প্রেমের চিত্র অঙ্কনে এবং পার্থিব জীবনের প্রতি নির্বেদের বর্ণনায়, অশ্বঘোষ পারদর্শী। 'সৌন্দরনন্দে' নন্দের প্রতি তৎপত্নী সুন্দরীর অনুরাগ এবং নন্দ কর্তৃক তাঁহার পরিত্যাগ পাঠকের চিত্ত বিগলিত করে। 'বুদ্ধচরিতে' জরা, মৃত্যু ও ব্যাধির যে প্রাণস্পর্শী চিত্র কবি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে কবির বর্ণনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। জরার বর্ণনাপ্রসঙ্গে সারথি গৌতমকে বলিতেছেন :—

অশ্বঘোষের কাব্যসমূহের সাহিত্যিক বিচার

রূপস্য হন্ত্রী ব্যসনং বলস্য
শোকস্য যোনির্নিধনং রতীনাম্।
নাশঃ স্মৃতীনাং রিপুরিন্দ্রিয়াণা-
মেষা জরা নাম যয়ৈষ ভগ্নঃ॥ (৩।৩০)

[এই ব্যক্তি যাহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে তাহার নাম জরা, ইহা রূপ, বল, স্মৃতি ও ইন্দ্রিয়শক্তি নষ্ট করে এবং শোক উৎপাদন করে।]

এই সমস্ত করুণ দৃশ্য দর্শনে তরুণ রাজকুমারের মনে যে নির্বেদের উদয় হইয়াছিল, তাহা কবি অনবদ্য ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

(চীনদেশীয় পরম্পরাগত ধারণা এই যে, অশ্বঘোষ কণিষ্কের সমসাময়িক। সুতরাং ইনি খ্রীঃ প্রথম শতাব্দীর লোক ছিলেন। অশ্বঘোষ নিজে খুব সম্ভবতঃ হীনযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি বৌদ্ধগণের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন।)

অশ্বঘোষের কাল ও পরিচয়

পদ্যকাব্যের ক্রম-বিবর্তনের ইতিহাসে অশ্বঘোষের গ্রন্থের পরেই বৌদ্ধগণের অবদান-সাহিত্যের উল্লেখ করিতে হয়। অবদান-গ্রন্থগুলিতে[১] গাথা ও অন্যপ্রকারের কাব্যধর্মী শ্লোক বিদ্যমান।

অবদান-সাহিত্য

অধুনালুপ্ত মূল 'পঞ্চতন্ত্র' সম্ভবতঃ এই যুগের সৃষ্টি। ইহা প্রধানতঃ গদ্য-রচনা হইলেও ইহাতে যে স্থানে স্থানে পদ্য সন্নিবিষ্ট ছিল, তাহা 'পঞ্চতন্ত্রের' বর্তমান রূপগুলি হইতে প্রতীয়মান হয়। অবদানগ্রন্থের পদ্যগুলির ন্যায় 'পঞ্চতন্ত্রের' পদ্যগুলিও উৎকৃষ্ট কাব্যের

পঞ্চতন্ত্র

১। বিস্তৃত বিবরণের জন্য গদ্যকাব্য-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

নিদর্শন নহে; তথাপি পদ্যকাব্যের ইতিহাস হইতে এইগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

কালিদাস

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতে, সর্বসম্মতিক্রমে কালিদাসকে ভারতীয় পদ্যকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি মনে করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই

জীবনী

যে, কবি নিজের সম্বন্ধে কোন তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। সুতরাং, তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিম্বদন্তী ভিন্ন আমরা বর্তমানে কিছুই জানি না। প্রসিদ্ধি এই যে, তিনি প্রথমে অতিশয় জড়বুদ্ধি ছিলেন। ঘটনাক্রমে, এক সুশিক্ষিতা রাজকুমারীর সঙ্গে তিনি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু, অল্পকাল পরেই কালিদাসের অজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া তাঁহার পত্নী তাঁহাকে গৃহে স্থান দিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। অভিমানী কালিদাস মনোদুঃখে বনে গিয়া কঠোর তপস্যাদ্বারা কালীদেবীর বরপ্রাপ্ত হইয়া কবিত্বলাভ করেন। একদিন রাত্রিকালে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি নিজের উপস্থিতির কথা পত্নীকে জানাইলেন এবং বলিলেন—অস্তি কশ্চিদ্ বাগ্‌বিশেষঃ; অর্থাৎ, বিশেষ কিছু কথা আছে। মূর্খ স্বামীর মুখে শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা শুনিয়া রাজকুমারী সর্ত করিলেন যে, কালিদাস যদি উক্ত বাক্যের প্রতিটি শব্দ দিয়া আরম্ভ করিয়া এক একটি পৃথক্ কাব্য রচনা করার প্রতিশ্রুতি দেন, তাহা হইলে তিনি স্বামীকে গৃহে প্রবেশাধিকার দিবেন। কালিদাস স্বীকৃত হইলেন এবং গৃহে প্রবেশ করিয়া স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। 'অস্তি' শব্দে 'কুমারসম্ভব' কাব্যের আরম্ভ, যথা—অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা, ইত্যাদি। 'কশ্চিৎ' শব্দ 'মেঘদূতের' আদিতে প্রযুক্ত হইয়াছে—কশ্চিৎকান্তা-বিরহগুরুণা স্বাধিকারাৎ প্রমত্তঃ ইত্যাদি। "বাগর্থাবিব সংপৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে"—'রঘুবংশ' কাব্যের ইহাই প্রথম শ্লোকের আদ্য চরণ; সুতরাং 'বাক্' পদ দিয়া ইহার আরম্ভ। 'বিশেষ' পদে আরব্ধ কোন কাব্য নাই। এই কিম্বদন্তীতে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা মনে করেন যে, এইরূপ কোন কাব্যও ছিল, কিন্তু উহা কালক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অপর একটি কিংবদন্তী অনুসারে কালিদাস সিংহলরাজ

কুমারদাসের বন্ধু ছিলেন এবং তিনি সিংহলেই এক বারবনিতার গৃহে নিহত হইয়াছিলেন।

কালিদাসের জন্মস্থান লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। এই সম্বন্ধে এখনও কিছু স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই।

কালিদাসের কাল

কালিদাসের কালও এখন পর্যন্ত নিঃসন্দেহে নির্ণীত হয় নাই।

ভাসের উল্লেখ

কবি 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নামক নাটকের প্রস্তাবনায় নাট্যকারগণের নামোল্লেখ করিতে গিয়া ভাসের নাম করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, তিনি ভাসের পরবর্তী। কিন্তু ভাসের কালই এখনও পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করিতে পারা যায় নাই; সুতরাং ইহা হইতে কালিদাসের সময় নির্ণয় করা যায় না।

আইহোল লিপি

আইহোল প্রশস্তি (Aihole Inscription)-তে নিম্নলিখিত শ্লোকটি আছে :—

যেনাযোজিনবেশ্ম স্থিরমর্থবিধৌ বিবেকিনা জিনবেশ্ম।
বিজয়তাং রবিকীর্তিঃ কবিতাশ্রিতকালিদাসভারবিকীর্তিঃ॥

এই লিপি ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। ইহাতে কালিদাসের উল্লেখ থাকায় এইটুকু বুঝা গেল যে, তিনি ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী লোক, কিন্তু কত পূর্বে তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই।

কালিদাসের কাল সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মতগুলি নিম্নলিখিত-রূপ :—

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন

(১) বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্ন সম্বন্ধে কিম্বদন্তী ভারতবর্ষে সুবিদিত। এই সম্বন্ধে 'জ্যোতির্বিদাভরণ' নামক জ্যোতিষগ্রন্থে নিম্নোক্ত শ্লোকটি আছে :—

ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি
বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥

ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে, কালিদাস 'বিক্রমাদিত্য' উপাধিধারী গুপ্তরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভাকবি ছিলেন। এই রাজার রাজত্বকাল ৩৮০-৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং, ইহাই কালিদাসের কাল। এই মতের সমর্থনে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, কালিদাসের কাব্যে যে জীবনযাত্রা প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা সহজ, স্বচ্ছন্দগতি ও উচ্চ সংস্কৃতির পরিচায়ক। এতাদৃশ অবস্থা গুপ্তরাজগণের সুশাসনেই সম্ভবপর হইয়াছিল। কিন্তু, প্রাচীন ভারতের একাধিক রাজার 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি থাকা হেতু এবং নবরত্ন সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ না থাকায় এই মত নির্বিচারে গ্রাহ্য নহে।

'বিক্রমাদিত্য' উপাধিধারী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকাল—৩৮০-৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ

(২) বিক্রমাদিত্যের নামের সহিত কালিদাসের নাম লোকপরম্পরায় যুক্ত থাকায়, কাহারও কাহারও মতে কবি সেই বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক ছিলেন যিনি খ্রীঃ পূঃ ৫৭ অব্দে বিক্রমসংবৎ প্রবর্তন করেন।

খ্রীঃ পূঃ ৫৭ অব্দ—বিক্রমসংবৎ

(৩) এলাহাবাদের নিকটবর্তী স্থানে প্রাপ্ত পদক (Bhita Medallion)-এ যে চিত্রটি অঙ্কিত আছে, তাহার সঙ্গে, কোন কোন পণ্ডিতের মতে, 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের প্রারম্ভিক দৃশ্যটির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। পদকটি শুঙ্গবংশের রাজত্বকালের, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ১৮৫-৭৩ অব্দের মধ্যে কোন সময়ের। সুতরাং, কালিদাস নিশ্চয়ই ইহার পূর্বেকার কবি।

ভিটা পদক—খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক

(৪) 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের ভরতবাক্য[1] হইতে কেহ কেহ মনে করেন, কবি রাজা অগ্নিমিত্রের সমসাময়িক। এই রাজার রাজত্বকাল খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী।

রাজা অগ্নিমিত্রের সমকালীন—খ্রীঃ পূঃ ১ম শতক

১। ত্বং মে প্রসাদসুমুখী ভব দেবী নিত্য-
মেতাবদেব মৃগয়ে প্রতিপক্ষহেতোঃ।
আশাস্যমীত্যধিগমাৎ প্রভৃতি প্রজানাং
সংপৎস্যতে ন খলু গোপ্তরি নাগ্নিমিত্রে॥

(৫) 'রঘুবংশের' চতুর্থ সর্গে রঘুকর্তৃক হূণবিজয় স্কন্দগুপ্ত কর্তৃক হূণগণের পরাজয়েরই প্রতিচ্ছবিমাত্র। স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকাল ৪৫৫-৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ; সুতরাং, কালিদাস ইহার পরবর্তী কালের বা সমকালীন কবি। কালিদাসকে গুপ্ত আমলের মনে করার আরও কতক যুক্তি দেওয়া হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, 'কুমারসম্ভব' গুপ্তরাজ কুমারগুপ্তের জন্মবৃত্তান্ত অবলম্বনে রচিত।

স্কন্দগুপ্তের পরবর্তী বা সমকালীন —খ্রীঃ ৫ম শতক

কালিদাসের প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ তিনটি—(১) রঘুবংশ, (২) কুমারসম্ভব ও (৩) মেঘদূত।

কালিদাসের কাব্যগ্রন্থ

'রঘুবংশ' ঊনবিংশতি সর্গে রচিত। ইহার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ। ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা দিলীপ রূপবান্ ও গুণবান্; কিন্তু নিঃসন্তান বলিয়া রাজার বড় দুঃখ। বশিষ্ঠের উপদেশে তাঁহার আশ্রমের দেবতাস্বরূপা গাভী নন্দিনীর পরিচর্যা করিয়া তিনি পুত্রলাভের বর সেই গাভীর নিকট হইতে পাইলেন। দিলীপের পুত্র জন্মিলে তাঁহার নাম রাখা হইল রঘু। কিছুকাল পরে, দিলীপের ঈপ্সিত অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ইন্দ্র কর্তৃক অপহৃত হয়। ফলে ঐ অশ্বের রক্ষক রঘুর সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ হয় এবং রঘু পরাস্ত হন। কালক্রমে রঘু রাজা হইয়া দিগ্বিজয় করেন ও বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। রঘুর পুত্র অজ যৌবনপ্রাপ্ত হইলে, বিদর্ভরাজ ভোজের অনুরোধে রঘু অজকে ভোজের ভগ্নী ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভায় যোগ দিবার জন্য আদেশ দেন। ইন্দুমতীকে বিবাহ করিয়া অজ যথাকালে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার পুত্র দশরথ। দশরথের পুত্র রাম। রামের সীতা-পরিণয়, বনগমন, রাবণবধ, তৎপর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও সীতার বনবাস, সীতার পুত্রপ্রাপ্তি; সীতার পাতালপ্রবেশ, রামের পরলোকগমন, কুশের রাজ্যভারগ্রহণ, কুশের পর তৎপুত্র অতিথির রাজত্ব, অতিথির পর ক্রমে একবিংশতি রাজার রাজত্ব, একবিংশতিতম রাজা সুদর্শনের বনগমনের পর তৎপুত্র অগ্নিবর্ণের রাজত্ব, অগ্নিবর্ণের ব্যসনপরায়ণতা ও মৃত্যু, তাঁহার অন্তঃসত্ত্বা পত্নীর রাজ্যশাসন—এই সমস্ত ঘটনা একাদশ হইতে শেষ পর্যন্ত সর্গগুলির বর্ণনীয় বিষয়।

(১) রঘুবংশ

(২) কুমারসম্ভব

'কুমারসম্ভব্' সপ্তদশ সর্গে রচিত হইলেও পণ্ডিতগণের মতে ইহার নবম হইতে অবশিষ্ট সর্গগুলি কালিদাসের রচনা নহে। এই মত প্রধানতঃ নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির উপরে প্রতিষ্ঠিত :—

(ক) ৯ম হইতে ১৭শ সর্গের উপর মল্লিনাথ-রচিত টীকা নাই।

(খ) পরবর্তী আলঙ্কারিকগণ 'কুমারসম্ভব' হইতে যে সকল শ্লোক বা শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঐগুলির সবই ৯ম সর্গের পূর্ববর্তী সর্গসমূহ হইতে উদ্ধৃত।

(গ) ৯ম-১৭শ সর্গের ভাষা ও রচনাশৈলী পূর্ববর্তী সর্গগুলির তুলনায় নিকৃষ্টতর।

' নগাধিরাজ হিমালয়ের চমৎকার বর্ণনা দ্বারা এই কাব্যের প্রারম্ভ। দেবদেব শিব ধ্যানমগ্ন। নগেন্দ্রনন্দিনী উমা শিবের পরিচর্যারতা। এদিকে তারকাসুরের উৎপীড়নে দেবকুল আকুল। তাঁহারা স্থির করিলেন, একমাত্র উপায় শিবের সহিত উমার পরিণয় ঘটান। এই দম্পতীর যে পুত্র জন্মিবেন, তিনিই হইবেন ভবিষ্যতে দেবগণের ত্রাতা। কিন্তু, মহাযোগী শিবের বিবাহে প্রবৃত্তি জন্মান যায় কি করিয়া? দেবগণের অনুরোধে কামদেব এই দুঃসাধ্য কার্যের ভার গ্রহণ করিলেন। শিবের ধ্যানভঙ্গ হইল, কিন্তু তাঁহার রোষানলে মদন ভস্মীভূত হইলেন। বিলাপরতা রতি দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্পা, কিন্তু দৈববাণী কর্তৃক পতির সহিত পুনর্মিলনে আশ্বস্তা মদন-পত্নী বিরতা হইলেন। কামদেবের এই পরিণতি দেখিয়া উমা রূপলাবণ্যে শিবকে মুগ্ধ করিবার প্রয়াস ত্যাগ করিয়া কঠোর তপশ্চর্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন। যোগীন্দ্রেরও মন টলিল, কিন্তু উমার ভক্তিকে একবার পরীক্ষা না করিয়া তিনি উমাকে গ্রহণ করিলেন না। শিব পরীক্ষায় উত্তীর্ণা উমার পাণিগ্রহণ করিলেন। কালক্রমে তাঁহাদের পুত্রপ্রাপ্তি হইল; এই পুত্রই কার্ত্তিকেয় এবং ইনিই দেবারি তারকাসুরের নিধনকর্তা।।

(৩) মেঘদূত

'মেঘদূত' দুইভাগে রচিত—পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ। প্রভুর অভিশাপে এক বৎসরের জন্য যক্ষ। রামগিরির আশ্রমে নির্বাসিত এবং সুদূর অলকাপুরীবাসিনী প্রিয়ার বিরহে কাতর। বর্ষাগমে মেঘদর্শনে

আকুলতর যক্ষ কামোন্মাদবশতঃ অচেতন মেঘকেই প্রিয়ার নিকট দূত স্বরূপে প্রেরণ করিতে উদ্যত। তাই তিনি মেঘকে সম্বোধন করিয়া অলকায় যাইবার পথঘাট তাহাকে বলিয়া দিতেছেন। এখানেই পূর্বমেঘের সমাপ্তি।

সুরম্য অলকাপুরীর ও যক্ষগৃহের বিচিত্র বর্ণনা, যক্ষপ্রিয়ার রূপলাবণ্যের কথা এবং যক্ষপ্রেরিত করুণ বার্তা উত্তরমেঘের বিষয়বস্তু।

সন্দিগ্ধ রচনাবলী

উক্ত কাব্যগ্রন্থ তিনটি ব্যতীত আরো প্রায় কুড়িটি[১] ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ কালিদাসের নামের সঙ্গে যুক্ত আছে। কালিদাস ইহাদের রচয়িতা কিনা, সেই বিষয়ে পণ্ডিতগণ সন্দেহ পোষণ করিয়া থাকেন। এই সন্দিগ্ধ রচনাগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টি সুবিদিত :—

(১) নলোদয়, (২) রাক্ষস-কাব্য,
(৩) ঋতুসংহার, (৪) পুষ্পবাণবিলাস,
(৫) শৃঙ্গারতিলক, (৬) শৃঙ্গাররসাষ্টক।

সাহিত্যিক বিচার

দেশীয় এবং বৈদেশিক সমালোচকগণের মতে কালিদাস ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি। দেশীয় সমালোচকগণ তাঁহার কবি-প্রতিভার যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন, তাহার দুই একটি নিদর্শন দেওয়া যাইতেছে :—

দেশীয় মত

পুরা কবীনাং গণনাপ্রসঙ্গে কনিষ্ঠিকাধিষ্ঠিতকালিদাসা।
অদ্যাপি তত্তুল্যকবেরভাবাদনামিকা সার্থবতী বভূব॥

[প্রাচীন কালে কবিগণের গণনা প্রসঙ্গে কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে কালিদাসের নাম রক্ষিত হইয়াছিল। আজ পর্যন্ত কেহ তাঁহার সমকক্ষ কবি না হওয়ায় অনামিকা অঙ্গুলির নামটি সার্থক হইয়াছে।]

বৈদর্ভী কবিতা স্বয়ং বৃতবতী শ্রীকালিদাসং বরম্

[বৈদর্ভী কবিতা নিজে কালিদাসকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন।]

বৈদেশিক মত

জার্মানদেশের সুপণ্ডিত ও কাব্যরসিক হামবোল্ড্ট (Humboldt) কালিদাস সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রশংসোক্তি করিয়াছিলেন—

১। দ্রষ্টব্য—*History of Sanskrit Literature*—S. K. De, p. 121.

"Kālidāsa..................is a masterly describer of the influence which Nature exercises upon the minds of lovers. Tenderness in the expression of feelings and richness of creative fancy have assigned to him his lofty place among the poets of all nations".

আমাদের আলোচনা করা আবশ্যক, কালিদাসের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি।

কালিদাসের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ

তাঁহার যে কয়খানি কাব্যগ্রন্থের আলোচনা আমরা পূর্বে করিয়াছি, তাহার কোনটিতেই বিষয়বস্তুর নির্বাচনে তিনি বিশেষ কোন মৌলিকতার পরিচয় দেন নাই। প্রচলিত পুরাকাহিনীই তাঁহার 'রঘুবংশ' ও 'কুমারসম্ভব'এর উপজীব্য। এক 'মেঘদূত' কাব্যের বিষয়টি অনেক পরিমাণে কবিকল্পিত, যদিও সম্ভবতঃ 'কামবিলাপ জাতক' বা 'রামায়ণ'এ বর্ণিত অপহৃত সীতার শোকে রামের আকুলতা কবির কল্পনার সহায়ক হইয়াছিল।

মহাকাব্য দুইটির বিষয়বস্তুর নির্বাচনের কারণ সম্ভবতঃ অলঙ্কারশাস্ত্রের অনুশাসন এবং সেই যুগের সাহিত্যরসপিপাসু ব্যক্তিগণের রুচি, কবির কল্পনাদৈন্য নহে। প্রসিদ্ধ কাহিনীই মহাকাব্যের উপজীব্য—এই অনুশাসনের নিয়ন্ত্রণ কালিদাসের পক্ষে সেই যুগে লঙ্ঘন করা সম্ভবপর হয় নাই। তবে এবিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত যে, পুরাকাহিনীর জীর্ণকঙ্কালের উপর যে রূপটি আমরা পাইতেছি তাহা এই মহাকবির প্রতিভার নিকট ঋণী। 'রঘুবংশে' কবির প্রাকৃতিক বর্ণনাশক্তির অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ সর্গে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলের বর্ণনা তাহার একটি নিদর্শন। সাদা ও নীল জলের মিশ্রণকে কালিদাস তুলিত করিয়াছেন নীলপদ্মখচিত শ্বেতপদ্মের সঙ্গে, কৃষ্ণসর্পভূষিত শিবের ভস্মাবৃত শুভ্র দেহের সঙ্গে, একত্রগ্রথিত ইন্দ্রনীলমণি ও মুক্তার মালার সঙ্গে। 'কুমারসম্ভবে'র প্রথম সর্গে গিরিরাজ হিমালয়ের যে রূপটি কবিলেখনী হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সত্যই মনোরম। কালিদাসের প্রেমের চিত্রগুলি বড় করুণ। 'রঘুবংশের' চতুর্দশ সর্গে সীতার বিরহে রামের অবস্থা মর্মস্পর্শী। গৃহ হইতে নির্বাসিতা সীতাকে তিনি এক মুহূর্তের জন্যও হৃদয় হইতে দূর করিতে পারেন নাই। বিরহবিধুর রামের প্রেমিকচিত্তকে

কবি বর্ণনা করিয়াছেন,—"অরোধনেনায় ইবাভিতপ্তম্ বৈদেহীবন্ধোর্হৃদয়ং বিদদ্রে"—তপ্ত লৌহে যেন হাতুড়ির আঘাত পড়িল। 'মেঘদূতে' প্রিয়াবিরহে যক্ষের কি উদ্বেগ, মিলনের জন্য কি উৎকণ্ঠা। সহৃদয় কবির চিত্ত তির্যক্‌জাতির উপরেও প্রেমের প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছে। 'কুমারসম্ভবে' কবি বলিয়াছেন—

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ।

শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥ (৩।৩৬)

[প্রিয়ার অনুগমন করিয়া ভ্রমর তাহার সহিত একই কুসুম পাত্রে মধুপান করিল; কৃষ্ণসার শৃঙ্গদ্বারা স্পর্শনিমীলিতনেত্রা মৃগীর গাত্রকণ্ডূয়ন করিল।]

কালিদাসের ভাষা সরল ও সরস। তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্লোকগুলি যেন কবির প্রয়াসপ্রসূত নয়, স্বতঃস্ফূর্ত। পরবর্তী যুগে কোন কোন কবির রচনায় পাণ্ডিত্যপ্রদর্শনের যে সচেতন প্রয়াস দেখা যায়, কালিদাসের রচনায় তাহা নাই। অলঙ্কারপ্রয়োগে কবির নিপুণতা যথেষ্ট, বিশেষতঃ উপমালঙ্কারে তিনি অদ্বিতীয়। তাই যুগ যুগ ধরিয়া 'উপমা কালিদাসস্য' এই দুইটি শব্দেই কবিপ্রতিভার প্রশংসা ব্যক্ত হইয়াছে। কালিদাসের কাব্য ছন্দোবৈচিত্র্যে পাঠকের চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া রাখে। 'মেঘদূতে' যক্ষের বিরহক্লিষ্টতা বোধ হয় মন্দাক্রান্তা ভিন্ন অন্য কোন ছন্দে এমন প্রাণস্পর্শী হইত না।

কালিদাসের রচনার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার রচিত কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল এবং উহাদের বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল।

রাবণবধের পরে লঙ্কা হইতে সীতাসহ আকাশমার্গে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন-কালে সীতার নিকট রাম সেতুবন্ধের বর্ণনা করিতেছেন :—

বৈদেহি পশ্যামলয়াদ্বিভক্তং
মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্।
ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্নম্
আকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্॥ (রঘু ১৩।২)

[অয়ি জানকি, ছায়াপথের দ্বারা বিভক্ত মনোরম তারকাযুক্ত নির্মল শারদগগনের ন্যায় আমার সেতুদ্বারা বিভক্ত মলয়পর্বত প্রসারী সফেন সমুদ্রকে অবলোকন কর।]

উপমার একটি চমৎকার নিদর্শন ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-সভার বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি :—

সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ
যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরা সা।
নরেন্দ্রমার্গাট্ট ইব প্রপেদে
বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ ॥

(রঘু—৬।৬৭)

[নিশাকালে চলন্ত দীপশিখার ন্যায় পতিবরণার্থিনী সেই কন্যা (ইন্দুমতী) যে যে রাজাকে অতিক্রম করিয়া গেলেন, সেই সেই রাজা রাজমার্গস্থ অট্টালিকার ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেন।]

প্রিয়ার নিকট মেঘের মাধ্যমে যক্ষ-প্রেরিত সন্দেশের মধ্যে নিম্নলিখিত শ্লোকটি অন্যতম :—

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষিতে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্থং কচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি ॥

(উত্তরমেঘ—১০৯)

[ওগো চণ্ডী, আমি প্রিয়ঙ্গুলতায় তোমার অঙ্গের, ত্রস্তমৃগীর অক্ষিসঞ্চালনে তোমার দৃষ্টিপাতের, শশাঙ্কে তোমার মুখচ্ছবির, ময়ূরপুচ্ছে তোমার কেশের, এবং ক্ষীণ নদীতরঙ্গে তোমার ভ্রূবিলাসের সাদৃশ্য দেখিতে পাই ; কিন্তু, হায়, কোন এক স্থানে তোমার (সর্বাঙ্গের) সাদৃশ্য নাই।]

কালিদাসোত্তর যুগ

এই যুগের পদ্যকাব্যগুলিকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ; যথা—

(ক) শতক,
(খ) মহাকাব্য।

(ক) শতক

'অমরুশতক' একখানি বিখ্যাত শতক-কাব্য।

'শতক' শব্দের অর্থ একশত শ্লোকের সমষ্টি। এই ধরণের কাব্যে সাধারণত একজনের রচিত একশতটি পরস্পরনিরপেক্ষ শ্লোক থাকে।

অমরুশতক

তবে, কোন কোন ক্ষেত্রে, শ্লোকসংখ্যা এক শতের কম-বেশীও থাকে। অমরুর শতকের অন্তত চারিটি রূপ বর্তমানে পাওয়া যায়; ইহাদের শ্লোকসংখ্যা ৯৬ হইতে ১১৫, সবগুলি রূপেই সাধারণ (common) শ্লোকসংখ্যা ৫১।

এই কাব্য শৃঙ্গাররসপ্রধান শ্লোকের সমষ্টি। প্রেমিক-প্রেমিকার বিভিন্ন মানসিক অবস্থার বর্ণনা শ্লোকগুলিতে আছে।

ইহার রচয়িতা অমরুর কাল সম্বন্ধে অনুমানমাত্র সম্ভবপর। আলঙ্কারিক

অমরুর কাল

আনন্দবর্ধন খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে সর্বপ্রথম অমরুর উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং, অমরু আনন্দবর্ধনের পূর্ববর্তী। কেহ কেহ তাঁহাকে ভর্তৃহরির পরবর্তী বলিয়া মনে করেন; কিন্তু, এই সম্বন্ধে কোন অখণ্ডনীয় যুক্তি নাই।

অমরুর ভাষা স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দগতি। ছন্দোবৈচিত্র্য কাব্যখানিকে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে।

ভর্তৃহরির 'শৃঙ্গারশতক' সুপ্রসিদ্ধ কাব্য। 'নীতিশতক' ও 'বৈরাগ্যশতক'

ভর্তৃহরি
১। শৃঙ্গারশতক
২। নীতিশতক
৩। বৈরাগ্যশতক

নামে অপর দুইখানি কাব্যও লোকপরম্পরায় ভর্তৃহরি-রচিত বলিয়া মনে করা হয়।

'শৃঙ্গারশতক' প্রেম ও তাহার পরিণতি লইয়া রচিত। ইহাতে প্রেমের স্তরপরম্পরা ও প্রেমজনিত সুখের কথা কবি বলিয়াছেন; কিন্তু সমগ্র কাব্যটিতে প্রেমের ব্যর্থতা ও অসারতার সুরটি ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

'নীতি' ও 'বৈরাগ্যশতকে' কবি পার্থিব সুখ ও প্রেমের নিন্দা করিয়াছেন।

ভর্তৃহরির কাব্যগুলিতে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের গভীর অনুভূতির প্রতিফলন পাওয়া যায়; কিন্তু অমরুর কাব্যের তুলনায় ইহাদের ভাষা এবং

প্রকাশভঙ্গী নিকৃষ্টতর মনে হয়। 'নীতি'-ও 'বৈরাগ্যশতকে' বাস্তব জীবন সম্বন্ধে পাঠক অনেক উপদেশ লাভ করিতে পারেন।

ভর্তৃহরির রচনার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার তিনটি শতক হইতে কয়েকটি শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত হইল :—

নূনং হি কবিবরা বিপরীতবাচো
যে নিত্যমাহুরবলা ইতি কামিনীস্তাঃ।
যাভির্বিলোলতরতারকদৃষ্টিপাতৈঃ
শক্রাদয়োঽপি বিজিতাস্ত্ববলাঃ কথং তাঃ॥

(শৃঙ্গারশতক - ১০)

[সেই কবিশ্রেষ্ঠগণ অবশ্যই বিপরীত কথা বলেন, যাঁহারা সর্বদা রমণীগণকে অবলা বলেন; যৎকর্তৃক চটুল দৃষ্টিপাতদ্বারা ইন্দ্রাদি (দেবগণ)-ও বিজিত হন, তাঁহারা কিরূপে অবলা হইবেন?]

মনসি বচসি কায়ে পুণ্যপীযূষপূর্ণা-
স্ত্রিভুবনমুপকারশ্রেণীভিঃ প্রীণয়ন্তঃ।
পরগুণপরমাণূন্ পর্বতীকৃত্য নিত্যং
নিজহৃদি বিকসন্তঃ সন্তি সন্তঃ কিয়ন্তঃ॥

(নীতিশতক—৭০)

[এইরূপ সজ্জন কয়জন আছেন যাঁহারা কায়মনোবাক্যে পুণ্যবান্, যাঁহারা উপকারপরম্পরাদ্বারা ত্রিভুবনকে আনন্দিত করেন এবং সর্বদা অণুপরিমিত পরগুণকেও পর্বতের ন্যায় জ্ঞান করিয়া নিজেদের চিত্তে আনন্দ অনুভব করেন।]

নিবৃত্তা ভোগেচ্ছা পুরুষবহুমানোঽপি গলিতঃ
সমানাঃ স্বর্যাতাঃ সপদি সুহৃদো জীবিতসমাঃ।
শনৈর্যষ্ট্যুত্থানং ঘনতিমিররুদ্ধে চ নয়নে
অহো দুষ্টঃ কায়স্তদপি মরণাপায়চকিতঃ॥

(বৈরাগ্যশতক—৯)

[ভোগবাসনা নিবৃত্ত হইয়াছে, পুরুষ বলিয়া যে গৌরব তাহা নষ্ট হইয়াছে, প্রাণসম ও সমবয়স্ক মিত্রগণ সম্প্রতি স্বর্গত হইয়াছেন, যষ্টির সাহায্যে ধীরে

বীরে উত্থান করিতে হয়, অক্ষিযুগল দৃষ্টিশক্তিহীন; তথাপি দুষ্ট দেহ মৃত্যুভয়ে ভীত।]

এই ভর্তৃহরি ও 'বাক্যপদীয়'-রচয়িতা ভর্তৃহরি অভিন্ন কি না সেই সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ একমত নহেন। বৌদ্ধপরিব্রাজক ইৎসিং-এর বিবরণ অনুযায়ী বৈয়াকরণ ভর্তৃহরি ৬৫১ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে পরলোকগমন করেন।

এই ভর্তৃহরি কি 'বাক্যপদীয়'-রচয়িতা? বৈয়াকরণ ভর্তৃহরির কাল

উল্লিখিত শতককাব্যগুলি ছাড়াও ভক্তিমূলক শতক এই যুগে রচিত হইয়াছিল। এই জাতীয় কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাণভট্টের 'চণ্ডীশতক' ও ময়ূর কবির 'সূর্যশতক'। এই ধরণের কাব্যগুলিতে উৎকৃষ্ট কাব্যরস নাই; কিন্তু, কাব্যের ভঙ্গীতে দেবদেবীর স্তোত্ররচনায় ইহারা একটা বিশিষ্ট সাহিত্যিক রূপের পরিচয় বহন করিতেছে।

ভক্তিমূলক শতক
(১) বাণভট্টের 'চণ্ডীশতক'
(২) ময়ূরের 'সূর্যশতক'

বাণভট্টের জীবনী ও কাল সম্বন্ধে গদ্যকাব্যের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে।[১] প্রসিদ্ধি এই যে, ময়ূর বাণের ন্যায় রাজা হর্ষের সভাপণ্ডিত ও বাণের প্রতিদ্বন্দ্বী সাহিত্যিক ছিলেন। কথিত আছে, তিনি বাণের শ্বশুর বা শ্যালক ছিলেন, এবং 'সূর্যশতক' রচনা করিয়া তিনি কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করেন।

(খ) মহাকাব্য

ভারবি, ভট্টি, কুমারদাস ও মাঘ এই যুগের মহাকাব্যপ্রণেতা।

ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়' ভারতীয় সুধীসমাজে সমাদৃত। ইহা অষ্টাদশ সর্গে রচিত।

ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়'

ইহার আখ্যানভাগ সংক্ষেপে এইরূপ :—

যুধিষ্ঠির কর্তৃক নিযুক্ত চর দুর্যোধন সম্বন্ধে নানা সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দ্বৈতবনে উহা জ্ঞাপন করিতে আগত। তেজস্বিনী দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে দুর্যোধনের বিরুদ্ধে অবিলম্বে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে প্রদীপ্ত ভাষায় উৎসাহিত

১। অষ্টাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

করিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং ভীম তাঁহাকে সমর্থন করিতেছেন। স্থিতধী যুধিষ্ঠির সম্মত হইতেছেন না। ব্যাসদেবের উপদেশে অর্জুন, দুর্যোধনের বিরুদ্ধে ইন্দ্রের সাহায্য কামনায়, ইন্দ্রকীল পর্বতে তপস্যা করিয়া ইন্দ্রকে তুষ্ট করেন। মুনির ছদ্মবেশে ইন্দ্র অর্জুনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্থির প্রতিজ্ঞায় প্রীতিলাভ করেন এবং শিবের আরাধনা করিতে তাঁহাকে উপদেশ দেন। অর্জুন শিবের উদ্দেশ্যে তপস্যারত থাকিলে এক বন্যবরাহ তাঁহার প্রতি ধাবিত হয়। এই বরাহ শিব ও অর্জুনের বাণে যুগপৎ বিদ্ধ হইলে অর্জুন নিজের শরটি আনিতে অগ্রসর হইলেন এবং এক কিরাত তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল, ঐ শর তাহার প্রভুর। ফলে, শিবের অনুচরগণের ও পরে শিব ও স্কন্দের সহিত অর্জুনের তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে অর্জুন পরাজিত হইলেন বটে, কিন্তু শিব তাঁহার বীরত্বে প্রীত হইয়া তাঁহাকে বাঞ্ছিত পাশুপত অস্ত্র দান করিলেন।

সাহিত্যিক বিচার

'মহাভারতে'র বনপর্ব হইতে কবি মূল আখ্যানটি লইয়াছেন। কিন্তু আখ্যানটি বিকৃত না করিয়া তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে অনেক ঘটনা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কল্পনা-শক্তি ও ঘটনাবিন্যাসে নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বন, শরৎকাল ও হিমালয় প্রভৃতির বাস্তব রূপের বর্ণনায় ভারবি কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। যুদ্ধের বর্ণনাটিও হৃদয়গ্রাহী। অর্থগৌরবের জন্য ভারবির খ্যাতি যুগযুগান্তরব্যাপী। তবে, তাঁহার ভাবের গৌরব উপলব্ধি করিতে হইলে ভাষার কঠোর আবরণ ভেদ করিতে পাঠকের বহু শ্রম করিতে হয়। তাই সমালোচক বলিয়াছেন—নারিকেলফলসম্মিতং বচো ভারবেঃ; অর্থাৎ, ভারবির ভাষা নারিকেল ফলের ন্যায়। কাহারও সহিত অপরের তুলনা প্রায়ই প্রীতিকর হয় না। কিন্তু, তথাপি কালিদাসের সহিত ভারবির একটি তুলনা মনে স্বতঃই উদিত হয়। কালিদাস স্বভাবকবি, ভারবি যেন কষ্ট করিয়া কবিত্ব অর্জন করিয়াছেন। ভারবির কাব্যে অলঙ্কারশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনের একটা প্রয়াস পরিস্ফুট। 'কিরাতার্জুনীয়ে'র পঞ্চদশ সর্গে গোমূত্রিকাবন্ধ, সর্বতোভদ্র ও অর্থভ্রমক প্রভৃতি চিত্রবন্ধ ইহার নিদর্শন। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটিতে শুধু ন-কারের প্রয়োগও প্রয়াস-প্রসূত :—

ন নোননুন্নো নুন্নো নো নানা নানাননা ননু।
নুন্নোঽনুন্নো ননুন্নেনো নানেনানুন্ননুন্নন্নুৎ ॥ (কিরাতার্জুনীয়—১৫।১৪)

[যে নীচব্যক্তি কর্তৃক আহত হয়, সে মানুষ নয়; ওহে বহুরূপী, যে নীচব্যক্তিকে আহত করে, সে মানুষ নয়; যে আহত সে আহত নয়, যদি তাহার প্রভু আহত না হয়; যে অতিশয় আহত, তাহাকে যে আঘাত করে সে দোষমুক্ত নয়।]

এই কাব্যের প্রতি সর্গের অন্ত্যশ্লোকে 'লক্ষ্মী' শব্দের প্রয়োগ ভারবির প্রয়াস-সাধ্য রচনারই প্রমাণ।

ভারবির কাল

৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দের আইহোল লিপিতে (Aihole Inscription) ভারবির উল্লেখ হইতে বুঝা যায়, তিনি এই সময়ের পূর্ববর্তী লেখক।

ভট্টির ভট্টিকাব্য

ভট্টির 'রাবণবধ' বা 'ভট্টিকাব্য' এই যুগের অপর একখানি বিখ্যাত কাব্য। ইহা দ্বাবিংশতি সর্গে রচিত। লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে রামের রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত 'রামায়ণে'র কাহিনী এই কাব্যের বিষয়বস্তু। ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রের উদাহরণকাব্য হিসাবেই ইহার রচনা। সেইজন্য এই কাব্যের চারিটি ভাগ—

১। প্রকীর্ণ কাণ্ড—বিবিধ বিষয়ক উদাহরণ।
(সর্গ ১—৫)

২। অধিকারকাণ্ড—ব্যাকরণের অধিকার সূত্রসমূহের উদাহরণ।
(সর্গ ৬—৯)

৩। প্রসন্নকাণ্ড—অলঙ্কারসমূহের উদাহরণ।
(সর্গ ১০—১৩)

৪। তিঙন্ত কাণ্ড—তিঙন্ত পদসমূহের উদাহরণ।
(সর্গ ১৪—২২)

এই কাব্যটি সম্বন্ধে কবি নিজেই বলিয়াছেন—ইহা ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন পাঠকের পক্ষে প্রদীপস্বরূপ, কিন্তু ঐ শাস্ত্রবিমুখ ব্যক্তির নিকট অন্ধের হাতে

দর্পণের ন্যায়।[১] তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তাঁহার এই কাব্য ব্যাখ্যার সাহায্য ছাড়া দুর্বোধ্য।[২] ভাষার কাঠিন্য সত্ত্বেও ইহা অবশ্যস্বীকার্য যে, ভট্টি যে উদ্দেশ্যে কাব্যটি রচনা করিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। শুষ্ক ব্যাকরণশাস্ত্র ও জটিল অলঙ্কারশাস্ত্র কাব্যের মাধ্যমে শিক্ষা দিবার এই প্রয়াসে শিক্ষার্থীর পথ সুগম হইয়াছে। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কবিত্বের এইরূপ সংমিশ্রণ সংস্কৃত কাব্যের ইতিহাসে অদ্বিতীয়। দ্বিতীয় সর্গের শরদ্বর্ণন তাঁহার কবিত্বগুণের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

সাহিত্যিক বিচার

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দুইটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের এবং জীবজন্তুর উপর প্রকৃতির প্রভাবের বর্ণনায় ভট্টির নৈপুণ্যের পরিচায়ক :—

নিশাতুষারৈর্নয়নাম্বুকল্পৈঃ পত্রান্তপর্যাগলদচ্ছবিন্দুঃ।
উপারুরোদেব নদৎপতঙ্গঃ কুমুদ্বতীং তীরতরুর্দিনাদৌ॥ (২।৪)

[প্রভাতে জলাশয়ের তীরস্থিত পাদপের পত্রপ্রান্ত হইতে স্বচ্ছ শিশিরবিন্দু পড়িতেছিল এবং উহাতে বিহঙ্গকুল কূজন করিতেছিল; মনে হইল যেন নৈশ শিশিরবিন্দুপাতের ছলে পাদপ কুমুদিনীর প্রতি (সহানুভূতিবশত) রোদন করিতেছিল।]

দত্তাবধানং মধুলোহগীতৌ প্রশান্তচেষ্টং হরিণং জিঘাংসুঃ।
আকর্ণয়ন্নুৎসুকহংসনাদান্ লক্ষ্যে সমাধিং ন দধে মৃগাবিৎ॥ (২।৭)

[ব্যাধ মৃগবধে ইচ্ছুক, ভ্রমরগুঞ্জন শ্রবণে মুগ্ধ মৃগ নিশ্চল নিস্পন্দ; ব্যাধ ক্রীড়াসক্ত হংসের মধুর কাকলী শ্রবণে অন্যমনস্ক হইয়া স্বীয় লক্ষ্যের প্রতি মনোযোগ দিলেন না।]

ভট্টির ক্লিষ্ট রচনার একটি নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হইল; ইহাতে একরূপ কয়েকটি পদ বিভিন্ন অর্থে চারিটি চরণেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

বভৌ মরুত্বান্ বি-কৃতঃ স-মুদ্রো
বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ স-মুদ্রঃ।
বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রঃ
বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রঃ॥ (ভট্টিকাব্য ১০।১৯)

১। ভট্টিকাব্য—২২।৩৩
২। ঐ —২২।৩৪

[বিবিধকার্যকারী, গৃহীতালঙ্কার পবননন্দন (গগনে) বিরাজিত হইল। উপক্রান্ত ইন্দ্র প্রিয় হনূমানের সহিত প্রীত হইলেন, সমুদ্র বায়ুবেগে আন্দোলিত হইল এবং জলধর বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া সাগরের ন্যায় প্রতিভাত হইল।]

ভট্টির জীবনী ও কাল

'ভট্টি' শব্দটি ভর্তৃশব্দের প্রাকৃত রূপ বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন এই ভট্টি ও 'বাক্যপদীয়'-প্রণেতা ভর্তৃহরি অভিন্ন। ভট্টি তাঁহার কাব্যে লিখিয়াছেন (২২।৩৫) যে তিনি শ্রীধরসেন-শাসিত বলভীতে ইহা রচনা করিয়াছেন। বলভীতে এই নামে চারিজন রাজা মোটামুটি ৪৯৫—৬৪১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন; ইহাদের মধ্যে সর্বশেষ রাজা ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দের। সুতরাং, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগ ভট্টির কালের নিম্নতর সীমা।

কুমারদাসের 'জানকীহরণ'

কুমারদাসের 'জানকীহরণ' এই যুগের অন্যতম মহাকাব্য। সিংহলী সাহিত্যে রক্ষিত একটি টীকা হইতে মনে হয়, ইহা পঞ্চবিংশতি সর্গে রচিত। বর্তমানে ইহার অংশমাত্র পাওয়া যায়। নাম হইতেই বুঝা যায়, রামায়ণের আখ্যান ইহার উপজীব্য। কিন্তু জানকীর হরণেই কাব্যের সমাপ্তি নহে। সিংহলী সাহিত্যের উল্লিখিত গ্রন্থ হইতে মনে হয়, রামের পুনরায় রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত ঘটনাবলী এই কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়।

সাহিত্যিক বিচার

এই কাব্যে কালিদাসের মহাকাব্য দুইটির ভাবগত এবং, কোন কোন ক্ষেত্রে, ভাষাগত অনুকরণ লক্ষণীয়। কাব্য হিসাবে উচ্চাঙ্গের না হইলেও ইহা সুখপাঠ্য। অলঙ্কার ও ছন্দোবৈচিত্র্য এই কাব্যের মনোজ্ঞতার অন্যতম কারণ।

জীবনী

কুমারদাস কুমারভট্ট বা ভট্টকুমার নামেও পরিচিত। কিম্বদন্তী এই যে, তিনি কালিদাসের বন্ধু ছিলেন। সিংহলে প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে তিনি ঐ দেশের কুমারদাস নামক রাজা ছিলেন; রাজা কুমারদাসের রাজত্বকাল আনুমানিক ৫১৭-৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ। এই কবির পরিচয় যাহাই হউক না কেন, তাঁহার খ্যাতি যে খ্রীষ্টীয় দশম

শতাব্দীতে ব্যাপক ছিল, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ঐ শতাব্দী হইতে রচিত কোশকাব্যগুলিতে এই কবির শ্লোকের উদ্ধৃতি।

মাঘের 'শিশুপালবধ'

মাঘের 'শিশুপালবধ' বিংশতি সর্গে রচিত।

এই কাব্যের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার এইরূপ :—

বসুদেবালয়ে নারদ আসিয়া দেব ও নরের মহাশত্রু চেদিরাজ শিশুপালকে বধ করার আদেশ কৃষ্ণকে দিলেন। উদ্ধবের সঙ্গে পরামর্শক্রমে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে অর্ঘ্যদানে অতিশয় সম্মানিত করিলেন। ইহাতে শিশুপাল ক্রোধান্ধ হইয়া ঐ স্থান ত্যাগপূর্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। দুই পক্ষের সৈন্যদলে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পরিশেষে, কৃষ্ণ ও শিশুপাল উভয়ে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং শিশুপাল কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হইলেন।

'মহাভারতে'র মূল আখ্যান অবলম্বনে কাব্যটি রচিত হইলেও কবি স্বীয় কল্পনাবশে অনেক নূতন ঘটনার বিন্যাস করিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি কবিত্ব জাহির করিবার জন্য মূল আখ্যানের সংক্ষিপ্ত বিষয়কে অতিরিক্ত দীর্ঘাকারে পরিণত করিয়াছেন, রাজসূয় যজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ এইরূপ একটি নিদর্শন।

সেই যুগের ভারতীয় কাব্যরসিক ব্যক্তিগণ মাঘের এই কাব্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, কালিদাসের উপমা, ভারবির অর্থগৌরব, দণ্ডীর পদলালিত্য—এই ত্রিবিধ গুণের সমন্বয় হইয়াছে মাঘের কাব্যে। এই প্রশংসার সমর্থনে 'শিশুপালবধ'-এ অনেক নিদর্শনই আছে বটে;

সাহিত্যিক বিচার

কিন্তু, সমগ্র কাব্যটির প্রতি লক্ষ্য করিলে উক্তিটিকে অতিশয়োক্তি বলিতেই হইবে। কারণ, এই কাব্যে রচনার স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতি নাই, আছে কবির স্বীয় পাণ্ডিত্যপ্রদর্শনের প্রয়াস। দ্বিতীয় সর্গে, উদ্ধবের বক্তৃতায়, কবি রাজনীতিক জ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়া উহাকে অতিরিক্ত দীর্ঘায়িত করিয়াছেন; ইহাতে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিবারই সম্ভাবনা। চতুর্থ সর্গে, রৈবতক পর্বতের বর্ণনায়, কবি যেন নিজের বর্ণনাশক্তির অপব্যবহার করিয়াছেন; পর্বতের এত দীর্ঘ বর্ণনা না হইলেই যেন ভাল হইত। ষষ্ঠে, কবি যেন নারীর রূপলাবণ্য ও প্রেম বর্ণনায়

একটা সুযোগ করিয়া লইবার জন্য রাজসূয় যজ্ঞে গমনের পথেও কৃষ্ণের সঙ্গে একদল স্ত্রীলোকের অবতারণা করিয়াছেন।

আধুনিক রুচিতে উল্লিখিত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও মাঘের কবিত্বশক্তি অনস্বীকার্য। কিন্তু, অনেক স্থলে দুরূহ শব্দের ও দীর্ঘ সমাসবহুল পদের প্রয়োগে কাব্যের রসগ্রহণে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। নানাবিধ ছন্দের ব্যবহার করায় কাব্যের বৈচিত্র্যসাধন হইয়াছে। শ্লেষ, অনুপ্রাস ও যমক প্রভৃতি শব্দালঙ্কারের অতিরিক্ত প্রয়োগে এবং সর্বতোভদ্র, গোমূত্রিকা ইত্যাদি চিত্রবন্ধের ব্যবহারে কাব্যটিতে কবির পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত কবিত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ভারতীয় সমালোচক বলিয়াছেন যে, মাঘ মাসে যেমন সূর্যের তেজ মন্দীভূত হয়, তেমন ভাবেই মাঘ কবির অভ্যুদয়ে ভারবির যশ ম্লান হইয়া গিয়াছিল। সম্ভবত কাব্যে সাহিত্যিক ব্যায়ামের আদর্শ তিনি ভারবির কাব্যেই পাইয়াছিলেন; কিন্তু, এ বিষয়ে তিনি বোধ হয় পূর্ববর্তী কবিকেও পরাভূত করিয়াছেন।

মাঘের রচনার দুই একটি নমুনা উদ্ধৃত হইল।

আয়াস্তীনামবিরতরয়ং রাজকানীকিনীনাম্
ইত্থং সৈন্যৈঃ সমমলঘুভিঃ শ্রীপতেরূর্মিমদ্ভিঃ।
আসীদোঘৈর্মুহুরিব মহদ্ বারিধেরাপগানাং
দোলাযুদ্ধং কৃতগুরুতরধ্বানমৌদ্ধত্যভাজাম্॥ (শিশুপালবধ—১৮।৮০)

[যখন উদ্ধত রাজসেনা অবিরাম গতিতে কৃষ্ণের বহুসংখ্যক সৈন্যের প্রতি অগ্রসর হইল, তখন জলধিতরঙ্গসমূহের সহিত নদীজলের মিশ্রণের ন্যায় তুমুল শব্দে দোলাযুদ্ধ উপস্থিত হইল।]

ত্যক্তপ্রাণং সংযুগে হস্তিনীস্থা
বীক্ষ্য প্রেম্ণা তৎক্ষণাদুদ্গতাসুঃ।
প্রাপ্যাখণ্ডং দেবভূয়ং সতীত্বাদ্
আশিশ্লেষ স্বৈব কংচিৎপুরন্ধ্রী॥ (শিশুপালবধ—১৮।৬১)

[হস্তিনীর উপরে উপবিষ্টা কোন এক মহিলা প্রিয়তমকে যুদ্ধে নিহত দেখিয়া প্রেমবশতঃ তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং সতীত্বহেতু সম্পূর্ণ দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে স্বামীকে আলিঙ্গন করিলেন।]

মাঘ-রচিত চিত্রবন্ধের নিদর্শনস্বরূপ দুইটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

সকারনানারকাস
কায়সাদদসায়কা।
রসাহবাবাহসার
নাদবাদদবাদনা॥ (শিশুপালবধ—১৯।২৭)

লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে শ্লোকটিকে সব দিক্ হইতে পড়া যায়; ইহার অক্ষরগুলিকে নিম্নলিখিতরূপে সাজান যায়:—

স	কা	র	না	না	র	কা	স
কা	য়	সা	দ	দ	সা	য়	কা
র	সা	হ	বা	বা	হ	সা	র
না	দ	বা	দ	দ	বা	দ	না
না	দ	বা	দ	দ	বা	দ	না
র	সা	হ	বা	বা	হ	সা	র
কা	য়	সা	দ	দ	সা	য়	কা
স	কা	র	না	না	র	কা	স

শ্লোকটির প্রতি চরণ বামদিক্ হইতে দক্ষিণে যেমন, দক্ষিণদিক্ হইতে বামেও তেমনই। আবার, চরণগুলিকে বিপরীতক্রমে পড়িলে লম্বালম্বিভাবে দক্ষিণ হইতে বামে এবং বাম হইতে দক্ষিণে শ্লোকের চারিটি চরণই পাওয়া যায় এবং ঐ বিপরীত ক্রমটিও মিলে।

এই চিত্রবন্ধের নাম সর্বতোভদ্র।

সা সে না গ ম না র স্তে
র সে না গী দ না র তা।
তা র না দ জ না ম ত্ত
ধী র না গ ম না য় য়া॥ (শিশুপালবধ—১৯।২৯)

এই শ্লোকের অক্ষরগুলিকে নিম্নলিখিত মুরজাকারে বিন্যস্ত করা যায় :—এইজন্য ইহার নাম মুরজবন্ধ।

সা	সে	না	স	ম	না	র	ম্ভে
র	সে	না	সী	দ	না	র	তা
তা	র	না	দ	জ	না	ম	ত্ত
ধী	র	না	গ	ম	না	ম	য়া

মাঘের কাল

মাঘের জীবনকাল নিঃসন্দেহে নির্ণীত হয় নাই। তবে অষ্টম নবম শতাব্দীতে আলঙ্কারিক বামন ও আনন্দবর্ধনের গ্রন্থে মাঘের শ্লোকের উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যায়, মাঘ উঁহাদের পূর্ববর্তী। 'শিশুপালবধে'র অন্তে মাঘের বংশবর্ণনাতে দেখা যায়, তাঁহার পিতামহ বর্মল নামে এক রাজার মন্ত্রী ছিলেন। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, এই বর্মল বর্মলাত নামক রাজা হইতে অভিন্ন। বর্মলাত রাজার একটি লিপির তারিখ ৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ।

ক্ষয়িষ্ণু পত্তকাব্য

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে এই ক্ষয়িষ্ণু কাব্যের যুগারম্ভ হইল। এই যুগের বৈশিষ্ট্য এই যে, কাব্যগুলিতে 'নৈসর্গিকী প্রতিভার' পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায় না; কিন্তু, 'শ্রুতং চ বহুনির্মলম্' এবং 'অমন্দ অভিযোগ' এই দুইটির প্রমাণ যথেষ্ট রহিয়াছে।[১] এযুগের অধিকাংশ কাব্য যেন কবির হৃদয় হইতে স্ফূর্ত নয়, শুধু মস্তিষ্কপ্রসূত। সেই জন্যই, ইহাদের প্রধান আবেদন হৃদয়ের কাছে নহে, বুদ্ধির কাছে। কবি যেন ভাবকে ফুটাইয়া তোলা অপেক্ষা ভাষাকে অলঙ্কৃত করিবার প্রতি অধিকতর সচেষ্ট; কাব্যের আত্মা হইতে যেন অঙ্গটির প্রাধান্যই বেশী। মনে হয়, এ যুগের আদর্শ ভারবি, ভট্টি ও মাঘ, কালিদাস নহে।

১। দণ্ডী বলিয়াছেন,

নৈসর্গিকী চ প্রতিভা শ্রুতং চ বহুনির্মলম্।

অমন্দশ্চাভিযোগোঽস্যাঃ কারণং কাব্যসম্পদঃ॥ (কাব্যাদর্শ)

অর্থাৎ কবিত্ব-অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় তিনটি গুণ—স্বাভাবিক প্রতিভা, শাস্ত্রজ্ঞান ও বহুল অভ্যাস।

এই যুগের কাব্যগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীভুক্ত করা যায় :—

(ক) মহাকাব্য,
(খ) ঐতিহাসিক কাব্য,
(গ) শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্য,
(ঘ) ভক্তিমূলক কাব্য,
(ঙ) নীতিমূলক ও ব্যঙ্গাত্মক কাব্য,
(চ) কোষকাব্য ও মহিলা কবির কাব্য।

(ক) মহাকাব্য

কাশ্মীরী রত্নাকরের রচিত 'হরবিজয়' এই যুগের একটি মহাকাব্য। ইহা পঞ্চাশটি সর্গে রচিত বিশাল গ্রন্থ। শিব কর্তৃক অন্ধকাসুরের নিধন এই কাব্যের বিষয়বস্তু। ইহাতে কবি যেন তাঁহার কবিত্ব জাহির করিতেই ব্যস্ত; রাজনীতির জ্ঞান প্রকাশের জন্য তিনি নবম হইতে যোড়শ—এই আটটি সর্গের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। দশ এগারটি সর্গে তিনি শুধু আদিরসাশ্রিত ব্যাপারের বর্ণনা করিয়াছেন। কাব্যটিতে চিত্রবন্ধের প্রয়োগ ও ইহার সুদীর্ঘ আকার লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক বটে, কিন্তু রুচিমান্ কবির নহে।

রত্নাকরের 'হরবিজয়'

রত্নাকর খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের কবি।

'শিবস্বামীর কপ্ফিণাভ্যুদয়'

শিবস্বামীর 'কপ্ফিণাভ্যুদয়' এই জাতীয় অপর একটি গ্রন্থ।

বিংশতি সর্গে রচিত এই কাব্যের উপজীব্য 'অবদানশতকে' বর্ণিত দাক্ষিণাত্যের রাজা কপ্ফিনের বৌদ্ধ কাহিনী। ভাষার কাঠিন্যে এবং অলঙ্কার ও ছন্দের পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রয়োগে এই কাব্যটি রত্নাকরের কাব্যেরই ন্যায়।

শিবস্বামীর কাল

শিবস্বামী রত্নাকরের সমসাময়িক।

মঙ্খকের 'শ্রীকণ্ঠ-চরিত'

মঙ্খকের 'শ্রীকণ্ঠ-চরিত' পঞ্চবিংশতি সর্গে রচিত এই যুগের অন্যতম মহাকাব্য।

শিবকর্তৃক ত্রিপুরাসুরের ধ্বংসের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে ইহা রচিত। আখ্যানভাগ ক্ষুদ্র, কিন্তু কবি স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য ইহাকে

পল্লবিত করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ষষ্ঠ হইতে ষোড়শ—এতগুলি সর্গে কবি শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যের ও শৃঙ্গাররসপূর্ণ চিত্রের বর্ণনাই করিয়াছেন, মূল বিষয়বস্তুর সূত্র হারাইয়া গিয়াছে।

কবির জীবনকাল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ। শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত' বা 'নৈষধীয়চরিত' এই যুগের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত কাব্য। ইহা দ্বাবিংশতি সর্গে রচিত। 'মহাভারতে' বর্ণিত নল ও দময়ন্তীর অপূর্ব কাহিনী অবলম্বনে কাব্যটি রচিত।

মধ্যকের কাল

শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত'

কিন্তু, 'নৈষধচরিতে' মূল আখ্যানের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র অবলম্বন করা হইয়াছে। ইহাতে নলের সহিত দময়ন্তীর বিবাহ ও নলের রাজধানীতে কলির আগমন পর্যন্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

সাহিত্যিক বিচার

কাব্যটিতে কবির লক্ষ্য আখ্যানভাগের প্রতি নহে; তিনি জনপ্রিয় বস্তুটিকে উপজীব্য করিয়া সমগ্র কাব্যটির মধ্য দিয়া ছন্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে স্বীয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। এই শাস্ত্রগুলিতে তাঁহার অধিকার যথেষ্ট প্রশংসার্হ, কিন্তু স্থানে স্থানে কবি মাত্রাজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীহর্ষের উপজীব্য আখ্যানটি মহাভারতে দুই শতেরও কম শ্লোকে বর্ণিত; কিন্তু, সেখানে কবি নিজের গ্রন্থে প্রায় তিন সহস্র শ্লোক রচনা করিয়াছেন। ইহাতেই কবির মাত্রাবোধের অভাব প্রমাণিত হয়। ইহার অপর একটি নিদর্শন এই যে, দময়ন্তীর যে স্বয়ংবর ব্যাপারটি মাত্র কয়েক পংক্তিতে মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার বর্ণনায় কবি পাঁচটি দীর্ঘ সর্গ (১০—১৪) রচনা করিয়াছেন। কাব্য লিখিতে বসিয়া কবি দার্শনিক জ্ঞানের পরিচয় দিবার জন্য উৎসুক। একটা সম্পূর্ণ সর্গে (১৭) তিনি দার্শনিক মতবাদের অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু মূল বিষয়বস্তুর সহিত ইহার কোন যোগ নাই। আধুনিক সমালোচকের দৃষ্টিতে এই সমস্ত কারণেই কাব্যটি উচ্চাঙ্গের নহে; অনেক পাশ্চাত্ত্য সমালোচক বলিয়াছেন যে, কাব্যটি কুরুচি ও নিকৃষ্ট রচনাশৈলীর উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ভারতীয় কাব্য-রসিক 'নৈষধে পদলালিত্যম্'-এর যে প্রশংসা করিয়াছেন, কাব্যের স্থানে স্থানে সেরূপ প্রশংসার কারণ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইতস্ততঃ ললিত পদসমূহের প্রয়োগ থাকিলেই একটি সমগ্র কাব্যগ্রন্থ কাব্য হিসাবে উৎকৃষ্ট হয় না।

হীর ও মামল্লদেবীর পুত্র শ্রীহর্ষ সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কান্যকুব্জের রাজা বিজয়চন্দ্র ও জয়চন্দ্রের রাজত্ব-কালের কবি।

শ্রীহর্ষের কাল

এই যুগের অপরাপর মহাকাব্যগুলি নগণ্য। সুতরাং, ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিকতর পরিচিত গ্রন্থগুলির নাম সহ রচয়িতার নাম নিম্নে লিখিত হইল :—

গ্রন্থ (বর্ণানুক্রমিক)	গ্রন্থকার
উদাত্তরাঘব	শাকল্য মল্ল অথবা মল্লাচার্য বা কবিমল্ল
কবিরহস্য	হলায়ুধ
কুমারপালচরিত	হেমচন্দ্র
গোবিন্দলীলামৃত	কৃষ্ণদাস কবিরাজ
জানকীপরিণয়	চক্রকবি
ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত	হেমচন্দ্র
ধর্মশর্মাভ্যুদয়	বামনভট্টবাণ
নরনারায়ণানন্দ	বস্তুপাল
পদ্মচূড়ামণি	বুদ্ধঘোষ
পাণ্ডবচরিত	দেবপ্রভ সূরি
বালভারত	অমরচন্দ্র সূরি
ভিক্ষাটন	গোকুল
যাদবাভ্যুদয়	বেঙ্কটনাথ (বা বেঙ্কটদেশিক)
রাবণার্জুনীয়	ভৌমিক (অথবা ভৌম বা ভট্টভীম)
রাঘবপাণ্ডবীয়	ধনঞ্জয়
ঐ	কবিরাজ

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
রুক্মিণীকল্যাণ	রাজচূড়ামণি দীক্ষিত
সহৃদয়ানন্দ	কৃষ্ণানন্দ
সুরথোৎসব	সোমেশ্বর
হরিবিলাস	লোলিম্বরাজ

(খ) ঐতিহাসিক কাব্য

এই কাব্যের স্বরূপ

কাব্যের জগৎ কল্পনালোক এবং ইতিহাস বাস্তব তথ্যপূর্ণ। সুতরাং, ঐতিহাসিক কাব্য—এই দুইটি শব্দ পরস্পরবিরোধী ভাব প্রকাশ করে। বর্তমানে আমাদের আলোচ্য সেই সমস্ত কাব্য যাহাদের মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে। অবশ্য কাব্যগুলি পাঠে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহাদের রচনায় ইতিহাস অপেক্ষা কাব্যের প্রতিই কবির লক্ষ্য অধিকতর।

পদ্মগুপ্ত বা পরিমলের 'নবসাহসাঙ্কচরিত'

পদ্মগুপ্ত বা পরিমলের 'নবসাহসাঙ্কচরিত' এই জাতীয় গ্রন্থ। ইহা অষ্টাদশ সর্গে রচিত। সিন্ধুরাজের সহিত নাগরাজ শঙ্খপালের কন্যা শশিপ্রভার বিচিত্র ঘটনাক্রমে বিবাহ এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়।

রচনাকাল

ঐতিহাসিক মূল্য তেমন না থাকিলেও গ্রন্থটির কাব্যরস একেবারে নগণ্য নয়। কাব্যটি সম্ভবত ১০০৫ খ্রীষ্টাব্দে কবির পৃষ্ঠপোষক ধারারাজ নবসাহসাঙ্কের রাজত্বকালে রচিত।

বিহ্লণের 'বিক্রমাঙ্কদেব চরিত'

বিহ্লণের 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত' এই জাতীয় অপর একটি কাব্য। ইহা অষ্টাদশ সর্গে রচিত।

রচনাকাল

কাব্যটি কবির পৃষ্ঠপোষক কল্যাণের চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের (আঃ ১১শ-১২শ শতক) জীবনবৃত্তান্ত।

গ্রন্থটিতে অনেক কাল্পনিক ঘটনার সন্নিবেশ হইয়াছে বটে, কিন্তু এই জাতীয় অপর গ্রন্থগুলির তুলনায় ইহাতে ঐতিহাসিক তথ্য বিস্তর আছে।

কাব্য হিসাবে খুব সুখপাঠ্য না হইলেও ইহাতে কবিত্বের পরিচয় যথেষ্ট রহিয়াছে।

কল্হণের 'রাজতরঙ্গিণী'

কল্হণের 'রাজতরঙ্গিণী' এই জাতীয় কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক পরিচিত।

কাশ্মীরের রাজবংশের বিবরণ লইয়া গ্রন্থখানি রচিত। ইহার প্রথম দিকে গোনন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া বাহান্নটি কাল্পনিক রাজার কাহিনী বর্ণিত আছে। অনেক ঐতিহাসিক রাজবংশ এবং রাজার বর্ণনাও গ্রন্থের অপরাপর অংশে রহিয়াছে।

কল্হণ নিজেই বলিয়াছেন যে, 'নীলমতপুরাণ' প্রভৃতি এগারটি পূর্ববর্তী গ্রন্থ হইতে তিনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে ঐতিহাসিক

ইহার ঐতিহাসিক মূল্য

ঘটনাবলীর সহিত কাল্পনিক ঘটনার এমন সংমিশ্রণ দেখা যায় যে, অনেক সময় ঐতিহাসিক তথ্যটুকু পৃথক্ করিয়া নেওয়া পাঠকের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠে। তথাপি কাশ্মীরের প্রাচীন রাজবংশের একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'রাজতরঙ্গিণী'; শুধু কাশ্মীরের নহে সমগ্র ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যে ইহাকে একমাত্র ঐতিহাসিক কাব্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখানে বলা প্রয়োজন যে, কল্হণের কাব্যটি খাঁটি ইতিহাস বা history নহে, একটি ঘটনাপঞ্জী বা chronicle মাত্র; ইতিহাসে কার্য-কারণের পারস্পরিক সম্বন্ধের যে বৈজ্ঞানিক বিচার থাকে, তাহা এই গ্রন্থে নাই।

রচনাকাল

'রাজতরঙ্গিণী' খ্রীষ্টীয় ১১৪৮-৫০ অব্দে রচিত।

সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত'

সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' অন্যতম ঐতিহাসিক কাব্য।

ইহাতে শ্লেষের সাহায্যে প্রতি শ্লোকেই দাশরথি রাম ও বঙ্গের রাজা রামপালের বর্ণনা আছে। উত্তরবঙ্গে বিদ্রোহের ফলে, দ্বিতীয় মহীপালের হত্যা ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপালের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা—ইহাই কাব্যটির প্রধান বিষয়বস্তু।

সমসাময়িক ঘটনাবলীর সাক্ষ্য হিসাবে গ্রন্থটির মূল্য আছে। কিন্তু, শ্লেষ অলঙ্কারের বাহুল্যে স্থানে স্থানে ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করা দুরূহ হইয়া পড়ে।

ঐতিহাসিক মূল্য

সন্ধ্যাকর উত্তরবঙ্গের পুণ্ড্রবর্ধনের অধিবাসী ছিলেন; তাঁহার গ্রন্থটি মদনপালের রাজত্বকালে একাদশ শতকে সমাপ্ত হয়।

এই জাতীয় অপর কাব্যগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থনাম (বর্ণানুক্রমিক)	সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু	গ্রন্থকার
কুমারপালচরিত (বা দ্ব্যাশ্রয়কাব্য)	দাক্ষিণাত্যের অনহিলবাদের রাজগণের কাহিনী	হেমচন্দ্র
পৃথ্বীরাজবিজয়	শাহাবুদ্দিনের সহিত যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের জয়লাভ	অজ্ঞাত
রঘুনাথাভ্যুদয়	তাঞ্জোরের রঘুনাথ নায়কের জীবনের ঘটনাবলী অবলম্বনে রচিত	রামভদ্রাম্বা
রাজেন্দ্রকর্ণপুর	কাশ্মীররাজ হর্ষের স্তুতিকীর্তন	শম্ভু

(গ) শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্য

সংস্কৃত কাব্যে শৃঙ্গাররস প্রাচীনতম কাল হইতেই একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়া আসিতেছে। অশ্বঘোষের 'সৌন্দরনন্দ', কালিদাসের 'মেঘদূত', অমরুর 'অমরুশতক', ভর্তৃহরির 'শৃঙ্গারশতক' প্রভৃতি ইহার প্রধান নিদর্শন।

এই কাব্যের স্বরূপ

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই ধরণের কাব্যের সঙ্গে প্রায়ই মিশ্রিত থাকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনাত্মক রচনা, যেমন 'মেঘদূত'-এ, বা উপদেশাত্মক কথা, যেমন অশ্বঘোষ এবং ভর্তৃহরির গ্রন্থে; অথবা এই কাব্যগুলি হয় পরস্পর নিরপেক্ষ পদ্যের সমষ্টি, যেমন 'অমরুশতক'-এ।

বর্তমানে আলোচ্য কাব্যগুলিতে চিত্তাকর্ষক বস্তু নাই, এমন নহে। কিন্তু, প্রায়ই কবি নিজের রচনাকৌশলের পরিচয় দিবার জন্ত যে সচেতন প্রয়াস করেন, তাহাতে কাব্যের স্বচ্ছন্দগতি বা ভাবের হৃদয়গ্রাহিতা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে।

'চৌরপঞ্চাশিকা'

ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম কাব্য মনে হয় 'চৌর-পঞ্চাশিকা' (অপর নাম—চৌর বা চৌরী-সুরত-পঞ্চাশিকা)।

ইহাতে পঞ্চাশটি শ্লোকে গোপন প্রেমের কাহিনী বর্ণিত আছে। এই কাব্যের মুখ্য বিষয়বস্তু কামোদ্দীপক পরিবেশে রমণীর রূপলাবণ্যের বর্ণনা এবং গোপন সম্ভোগের চিত্র। কাব্যটির জনপ্রিয়তার একটি প্রধান নিদর্শন এই যে, ইহা তিনটি রূপে বর্তমানে বিদ্যমান। কাব্যহিসাবে ইহা অত্যন্ত সরস ও সুখপাঠ্য।

রচয়িতা

ইহার রচয়িতা নিঃসন্দেহে নির্ণীত হয় নাই। বিহ্লণ, চোর, সুন্দর এবং বররুচি—এই বিভিন্ন নামগুলি ইহার সঙ্গে রচয়িতৃস্বরূপে যুক্ত আছে।

গোবর্ধনের 'আর্যাসপ্তশতী'

গোবর্ধনের 'আর্যাসপ্তশতী' সুবিখ্যাত শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্য।

ইহাতে সপ্তশতাধিক পৃথক্ পৃথক্ শ্লোক ব্রজ্যাক্রমে আর্যাছন্দে রচিত হইয়াছে; শ্লোকগুলি শৃঙ্গাররসপ্রধান। কবি সম্ভবতঃ হালের 'সপ্তশতী'কে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু, হালের কাব্যের ন্যায় ইহা তেমন হৃদয়গ্রাহী নহে।

গোবর্ধনের কাল

গোবর্ধন বঙ্গের রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত ও কবি জয়দেবের সমসাময়িক ছিলেন।

জগন্নাথের 'ভামিনীবিলাস'

এই জাতীয় অন্যতম কাব্য জগন্নাথের 'ভামিনীবিলাস'। চারি ভাগে রচিত এই কাব্যে শৃঙ্গাররসের সহিত নীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। কাব্যটিতে স্থানে স্থানে প্রকাশভঙ্গী অনবদ্য।

এই যুগে মৌলিক চিন্তার দৈন্য ছিল বলিয়াই 'মেঘদূত'-এর অনুকরণে

অনেক কাব্য রচিত হইয়াছে। কিন্তু, কি ভাবে, কি ভাষায়, এই সমস্ত কাব্য 'মেঘদূত'-এর সমকক্ষ হইতে ত পারেই নাই, বরং অনেক পরিমাণে ইহারা নিকৃষ্টতর রচনা হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে 'মেঘদূত'-এর sequel বা পরিশিষ্টরূপ রচনাও দেখা যায়; যক্ষপত্নীর প্রতিসন্দেশও কোন কোন কাব্যের বিষয়বস্তু। এই সমস্ত কাব্যে মন্দাক্রান্তা ছাড়া মালিনী, শার্দূলবিক্রীড়িত প্রভৃতি ছন্দেরও ব্যবহার আছে। ইহাদের মধ্যে অনেক কাব্যের কামার্ত নায়ক চেতন অচেতনে ভেদজ্ঞানশূন্য হন নাই। সেইজন্য বায়ু, চন্দ্র, তুলসী প্রভৃতি অচেতন পদার্থ ছাড়াও কোকিল, ভ্রমর প্রভৃতি সচেতন জীবও দৌত্যকার্যে নিযুক্ত হইয়াছে। এই ধরণের কতক কাব্যে প্রেম-সন্দেশের পরিবর্তে দেখা যায় শিষ্যকর্তৃক দূরদেশে গুরুর নিকট প্রেরিত বিজ্ঞপ্তিপত্র অথবা বৈষ্ণবগণের ভক্তিতত্ত্ব-প্রকাশের প্রয়াস। আমরা এই জাতীয় কয়েকটি মাত্র অপেক্ষাকৃত প্রধান দূতকাব্যের উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দূতকাব্য

গ্রন্থ (বর্ণানুক্রমিক)	গ্রন্থকার
চন্দ্রদূত	জম্বু
পবনদূত	ধোয়ী
পদাঙ্কদূত	কৃষ্ণসার্বভৌম
ভ্রমরদূত	রুদ্র
মনোদূত	ব্রজনাথ
হংসদূত	রূপগোস্বামী

(ঘ) ভক্তিমূলক কাব্য

এই জাতীয় কাব্যের দুইটি ধারা লক্ষণীয়। এক জাতীয় রচনাতে পাওয়া যায় ভক্তিরসের সহিত শৃঙ্গাররসের সংমিশ্রণ এবং অপর জাতীয় রচনা বর্ণনাত্মক বা দার্শনিক স্তোত্র।

এই কাব্যের স্বরূপ

প্রথমোক্তপ্রকার কাব্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'। ইহা দ্বাদশ সর্গে রচিত। প্রতি সর্গেই কৃষ্ণ, রাধা বা তাঁহার সখীর গান রহিয়াছে।

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'

বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বসন্তলীলা এই কাব্যের উপজীব্য ; এই লীলা শৃঙ্গাররস-প্রধান। রাধার বিরহ, অপর গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের কেলি, রাধার আর্তি, মিলনের আকাঙ্ক্ষা ও ঈর্ষা, রাধাসখীকর্তৃক অনুরোধ উপরোধ, কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তন, অনুতাপ ও রাধার অনুনয়, পরিশেষে মিলনের আনন্দ—এই সমস্ত বিষয় লইয়াই কাব্যটি রচিত।

জয়দেব-ভারতী কবির নিজের ভাষায় মধুর, কান্ত এবং কোমল। ইহাতে কাব্যের স্বরূপ-বর্ণনাই হইয়াছে, আত্মপ্রশংসার আধিক্য নহে।

সাহিত্যিক বিচার

হরিস্মরণে সরস মন নিয়াই কবি কাব্যটি রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিলাসকলায় তাঁহার কৌতূহল ছিল। এই উভয় কারণেই, কবির মনের সরসতা ও বিলাসকলায় কৌতূহল পাঠকের মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে। সেইজন্যই কবির যশ বঙ্গদেশের সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া সারা ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি, ইহা ল্যাসেন (Lassen), জোন্‌স্ (Jones), লেভি (Levi), পিসেল (Pischel), শ্রেডার (Schroeder) প্রভৃতি আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমালোচকগণেরও সপ্রশংস দৃষ্টির অগোচর হয় নাই।

জয়দেবের রচনার কয়েকটি নিদর্শন, কবিশেখর কালিদাস রায়-কৃত পদ্যানুবাদ সহ, নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে॥
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে।
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে॥

"মৃদুলবঙ্গলতাফুলপরশনে আমোদিত
মলয়সমীর বহে মন্দ,
বনকুঞ্জকুটীরে করে মুখরিত অলিতান-
মিশ্রিত পিককলছন্দ।
কোথা কোন্ যুবতীর সনে নাচিছে সে বনে বনে
বিরহিণী রবে কি জীবন্ত ?"

চন্দ্রকচারুময়ূরশিখণ্ডকমণ্ডলবলয়িতকেশং
প্রচুরপুরন্দরধনুরনুরঞ্জিতমেদুরমুদিরসুবেশম্
রাসে হরিরিহ বিহিতবিলাসং
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥

"চারু চন্দ্রক আঁকা সুন্দর শিখিপাখা
বলয়িত হ'য়ে শোভে তাহার কেশে,
আরক্ত সুষমাময় ইন্দ্রধনুতে যেন
নবজলধর শোভে রুচিরবেশে
পরিহাসে বিলাসে যে মানস হরে
মম মন রাসে সেই হরিরে স্মরে।"

পততি পতত্রে বিচলিতপত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্।
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী ॥

"পাখীটি উড়িলে পাতাটি নড়িলে
ভাবে তুমি এলে বুঝি,
রচিয়া শয়ন চকিত নয়ন
বনপথে মরে খুঁজি।
ধীর সমীরণে আজ
যমুনার কূলে আছে পথ চেয়ে
বনমালী রসরাজ।"

ভোজদেব ও রামাদেবীর (বা, বামাদেবীর) পুত্র জয়দেব বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকাল আঃ ১১৮৫—১২০৫ খ্রীষ্টাব্দ। জয়দেবের নিবাস ছিল কেন্দুবিল্ব নামক স্থানে; ইহাই সম্ভবতঃ বীরভূম জেলার অজয় নদীর তীরবর্তী কেন্দুলী গ্রাম।

জয়দেবের কাল ও জন্মস্থান

লীলাশুকের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' অন্যতম ভক্তিমূলক কাব্য। ইহাতে ভক্তিমূলক গীতিধর্মী শ্লোকসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শৃঙ্গাররসপূর্ণ পরিবেশে স্থাপিত ইষ্টদেবতা কৃষ্ণের প্রতি ভক্তির উচ্ছ্বাস ও ভক্তের প্রণতি

লীলাশুকের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'

এই কাব্যের বিষয়বস্তু। ইহাতে যে ভাবাবেগ তাহাতে sentimentalism নাই, আছে দিব্যোন্মাদ। ইহার আবেদন বুদ্ধির কাছে নহে, হৃদয়ের কাছে। বস্তুতঃ ইহাতে ভক্তিতত্ত্বের যে অপূর্ব প্রকাশ রহিয়াছে, তাহাতেই এই কাব্যটি মধ্যযুগীয় ভক্তিমূলক রচনার অন্যতম প্রধান নিদর্শনস্বরূপ পরিগণিত হইয়াছে।

সাহিত্যিক বিচার

এই যুগের স্তবস্তোত্রগুলি সংখ্যাতীত। এইগুলিকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা—বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু। বর্তমান প্রসঙ্গে প্রত্যেক জাতীয় স্তোত্রগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বৌদ্ধস্তোত্র

নাম	রচয়িতা
ভক্তিশতক	রামচন্দ্র কবিভারতী
লোকেশ্বরশতক	বজ্রদত্ত

জৈনস্তোত্র

চতুর্বিংশতিজিনস্তুতি বা চতুর্বিংশিকা	নানা ব্যক্তিরই এই জাতীয় রচনা পাওয়া যায়
ভক্তামর	মানতুঙ্গ

হিন্দুস্তোত্র

এক শঙ্করাচার্যের নামেই প্রায় দুইশত স্তোত্র প্রচলিত আছে। সবগুলিই প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক শঙ্করের রচিত কিনা বলা কঠিন। কতক স্তোত্র ঐ সম্প্রদায়ের পরবর্তী কালের অপর কোন শঙ্করের রচিত হইতে পারে। নিম্নলিখিত স্তোত্রগুলিই সমধিক প্রসিদ্ধ :—

নাম	রচয়িতা
(বর্ণানুক্রমিক)	
অর্ধনারীশ্বর স্তোত্র	কহ্লণ
আত্মষট্ক (বা নির্বাণষট্ক)	শঙ্কর
আনন্দমন্দাকিনী	মধুসূদন সরস্বতী
আনন্দলহরী	শঙ্কর
গঙ্গাষ্টক	শঙ্কর
দশশ্লোকী	শঙ্কর
দেবীশতক	আনন্দবর্ধন
পঞ্চশতী	মূককবি
মুকুন্দমালা	কুলশেখর
মোহমুদ্গর (বা চর্পটপঞ্জরিকা বা দ্বাদশপঞ্জরিকা)	শঙ্কর
বেদসারশিবস্তুতি	শঙ্কর
শিবাপরাধক্ষমাপণস্তোত্র	শঙ্কর
শিবমহিম্নঃস্তোত্র	শঙ্কর
স্তবমালা	রূপগোস্বামী
স্তোত্রাবলী	উৎপলদেব
হস্তামলক	শঙ্কর

(ঙ) নীতিমূলক ও ব্যঙ্গাত্মক কাব্য

বাস্তব জীবন সম্বন্ধে উপদেশাত্মক কথা ও পার্থিব ভোগাদির প্রতি বৈরাগ্য এই জাতীয় কাব্যের বিষয়বস্তু। সাধারণতঃ ইহারা পরস্পর-নিরপেক্ষ সুভাষিতবহুল শতকজাতীয় শ্লোকের সমষ্টি। ভর্তৃহরির প্রভাব এই সকল কাব্যের উপর যথেষ্ট আছে মনে হয়, কিন্তু কোন কোন কাব্যে

মৌলিক চিন্তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। মানবচরিত্রের দুর্বলতার প্রতি ব্যঙ্গও কতক কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু। নিম্নে অপেক্ষাকৃত প্রধান গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের নাম দেওয়া গেল।

গ্রন্থ (বর্ণানুক্রমিক)	রচয়িতা
অন্যোক্তিমুক্তালতা	শম্ভু
কলাবিলাস	ক্ষেমেন্দ্র
দেশোপদেশ	ক্ষেমেন্দ্র
নর্মমালা	ক্ষেমেন্দ্র
শান্তিশতক	শিল্হণ
সুভাষিতরত্নসন্দোহ	অমিতগতি

(চ) কোষকাব্য ও মহিলাকবির কাব্য

কোষকাব্যের লক্ষণ পূর্বে বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকে এই শ্রেণীর কাব্যরচনার সূত্রপাত। ইহাদের মধ্যে সহস্রাধিক কবির রচিত শ্লোক সংগৃহীত আছে; তাঁহাদের মধ্যে অনেক কবির অন্য পরিচয় বা গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে। ইহাদের সাহিত্যিক মূল্য এই যে, বর্ণনীয় বিষয়ের বিভিন্নতা ও অলঙ্কার এবং ছন্দের বিপুল বৈচিত্র্য পাঠকের চিত্তে রস হইতে রসান্তরের উৎপাদন করে এবং চিত্তবিনোদনার্থী পাঠক ইহাদের শ্লোকগুলির মধ্যে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন। কোষকাব্যগুলির ঐতিহাসিক মূল্যও নগণ্য নহে। পাণিনি নামে যে একজন কবিও ছিলেন তাহার সাক্ষী কোষকাব্য। বাক্‌কূট নামে জনৈক কবির পরিচয় কোষকাব্য ছাড়া অন্য কোথাও মিলে না।

এই কাব্যের রচনাকাল

সাহিত্যিক মূল্য

ঐতিহাসিক মূল্য

প্রধান প্রধান কোষকাব্যগুলির নাম, রচয়িতা ও রচনাকাল পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল।

গ্রন্থ (কালানুক্রমিক)	রচয়িতা	রচনাকাল
সুভাষিতরত্নকোষ	বিদ্যাকর (বাঙ্গালী)	খ্রীঃ ১২শ শতকের প্রথম পাদ

(ইহাই পূর্বে খণ্ডিত পুথি অবলম্বনে 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ পুথিতে গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের নাম ছিল না।)

গ্রন্থ	রচয়িতা	রচনাকাল
সদুক্তিকর্ণামৃত	শ্রীধরদাস (বাঙ্গালী)	লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে, খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে
সুভাষিতমুক্তাবলী বা সূক্তিমুক্তাবলী	জহ্লণ	খ্রীষ্টাব্দ ১২৫৭
শার্ঙ্গধরপদ্ধতি	শার্ঙ্গধর	আঃ ১৩৬৩ খ্রীষ্টাব্দ
পদ্যাবলী	রূপগোস্বামী (বাঙ্গালী)	খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দী
সুভাষিতাবলী	শ্রীবর	ঐ
সুভাষিতাবলী	বল্লভদেব	আঃ ১৫শ শতাব্দী
পদ্যবেণী	বেণী দত্ত	আঃ খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দী
সুভাষিতহারাবলী	হরিকবি	ঐ

কোষকাব্যগুলিতে পুরুষ কবির রচনা ছাড়া প্রায় চল্লিশটি মহিলাকবির[১] রচিত শ্লোকও অনেক আছে। ইঁহাদের মধ্যে অধিকতর পরিচিত বিজ্জা, বিকটনিতম্বা, শীলাভট্টারিকা, ভাবদেবী, গৌরী, পদ্মাবতী ও বিজ্জাবতী। ইঁহাদের রচিত শ্লোকগুলির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ঐগুলি সবই প্রেমাত্মক। কাব্য হিসাবে আধুনিক পণ্ডিতগণ এই শ্লোকগুলিকে খুব উচ্চাদের বলিয়া মনে করেন না।

মহিলা কবি

১। মহিলাকবিদিগের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য জে বি. চৌধুরীর *Sanskrit Poetesses*, Part A ও Part B দ্রষ্টব্য।

কোষকাব্যে বিক্ষিপ্ত শ্লোক ছাড়া মহিলাকবিগণের রচিত কয়েকটি কাব্যগ্রন্থও পাওয়া যায়। কাব্যগ্রন্থরচয়িত্রীগণের মধ্যে ইঁহারাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

রামভদ্রাম্বা—ইঁহার রচিত কাব্যের নাম 'রঘুনাথাভ্যুদয়'; ইহা কবির প্রেমিক তাঞ্জোরের রঘুনাথ নায়কের মহিমাকীর্তনে রচিত। কাব্যটির রচনাকাল আঃ ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দ।

তিরুমলাম্বা—'বরদাম্বিকা-পরিণয়' কাব্য ইঁহার রচিত। বিজয়নগরের রাজা অচ্যুতরায়ের সহিত বরদাম্বিকার পরিণয়ের বিচিত্র কাহিনী এই কাব্যের উপজীব্য। ইহার রচনাকাল আঃ ১৫৩০

গঙ্গাদেবী— ইঁহার কাব্যের নাম 'মধুরা-বিজয়' বা 'বীরকম্পরায়চরিত'। স্বীয় পতি কম্পরায়ের মাদুরা-বিজয় কাহিনী অবলম্বনে ইহা রচিত। কাব্যটির রচনাকাল আঃ খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় পাদ।

———

আটার

গদ্যকাব্য

'গদ্য' শব্দে কি বুঝায় ?

পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, (সংস্কৃতে কাব্য বলিতে কাব্যলক্ষণাক্রান্ত গদ্যরচনাকেও বুঝায়। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, "বৃত্তবন্ধোজ্ঝিতং গদ্যম্"[১], অর্থাৎ কিনা যে রচনা বৃত্তবন্ধ বা ছন্দোবদ্ধপদবিহীন তাহাই গদ্য।)

গদ্য-রচনার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

(অধিকাংশ সভ্যদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায়, প্রাচীনতম নিদর্শন পদ্যে রচিত। ভারতবর্ষেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্য ঋগ্বেদ পদ্যে রচিত। প্রাচীন ভারতে যে গদ্য অপেক্ষা পদ্যের আদর অধিকতর ছিল, ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, আইন কানুনের গ্রন্থ, এমন কি শুষ্ক ব্যাকরণ শাস্ত্র পর্যন্তও কোন কোন ক্ষেত্রে পদ্যে রচিত।)

বৈদিক কর্মকাণ্ডের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে গদ্য-রচনারও উৎপত্তি হয়।

যজুর্বেদ — যজুর্বেদে যাগযজ্ঞ-সংক্রান্ত নির্দেশগুলি গদ্যে রচিত।

অথর্ববেদ — অথর্ববেদেও কিছু কিছু গদ্যরচনা দেখা যায়। কর্মকাণ্ডের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গদ্যও পুষ্টিলাভ করিতে থাকিল।

ব্রাহ্মণ — যাগযজ্ঞাদির খুঁটিনাটি নিয়ম-প্রণালীগুলি গদ্যে লিপিবদ্ধ হইল বিশালাকায় 'ব্রাহ্মণ' নামক গ্রন্থসমূহে। এই ব্রাহ্মণগুলি অতিশয় নীরস ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাক্যে রচিত। জনৈক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত এইগুলি সম্বন্ধে

---

১ সাঃ দঃ ৬।৩০৯ (পাঠান্তর—'বৃত্তগন্ধোজ্ঝিতম্'।)
অপাদঃ পদসন্তানো গদ্যম্—কাব্যাদর্শ—১।২৩

মন্তব্য করিয়াছেন যে, কোন ব্রাহ্মণগ্রন্থের মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার বেশী ধৈর্যসহকারে পড়া যায় না। আরণ্যক ও উপনিষদ্—এই দুই প্রকার গ্রন্থাবলীর মধ্যে অনেক গ্রন্থ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গদ্যে রচিত। 'সূত্র' যুগে পৌছিয়া আমরা গদ্যের একটি বিশিষ্ট রূপ দেখিতে পাই। শ্রৌত-, গৃহ্য-, ধর্ম- ও শুল্বসূত্র—কল্পসূত্রের এই চারি প্রকার রচনাতেই গদ্যের ব্যবহার হইয়াছে। ইহা ছাড়া, অন্যান্য বেদাঙ্গও সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছিল। এই সূত্রগুলিতে গ্রন্থকারগণের উদ্দেশ্য ছিল যতদূর সম্ভব অল্প পরিসরে বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করা। ফলতঃ টীকাটিপ্পনীর সাহায্য ছাড়া সূত্রগুলি হইয়া পড়িল দুর্বোধ্য।

আরণ্যক, উপনিষদ্

কল্পসূত্র

অপরাপর বেদাঙ্গ

'মহাভারতে'র কিয়দংশ গদ্যে রচিত; 'বিষ্ণু' ও 'ভাগবত' প্রভৃতি কতক পুরাণেরও অংশবিশেষ গদ্যে রচিত। এই প্রসঙ্গে চরক ও সুশ্রুত কর্তৃক রচিত আয়ুর্বেদশাস্ত্রের গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য।

মহাভারত, পুরাণ, আয়ুর্বেদ

এই পর্যন্ত যে গদ্যরচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিল, সেই গদ্য সুখপাঠ্য ও শ্রুতিমধুর নহে। গদ্যরচনাবলীর ইতিহাসে পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। 'বাসবদত্তা', 'সুমনোত্তরা' ও 'ভৈমরথী' নামে তিনটি গদ্যকাব্যের উল্লেখ মহাভাষ্যে আছে। পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' নামক ব্যাকরণ গ্রন্থের এই বিস্তৃত ও প্রামাণ্য টীকার রচনাশৈলী হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ঐ যুগে গদ্য-রচনার যথেষ্ট উন্নতিসাধন হইয়াছিল। মূল গ্রন্থাদির ব্যাখ্যা ও ভাষ্যাদিতে যে গদ্যের ব্যবহার দেখা যায়, তাহাও উচ্চস্তরের গদ্য-রচনার পরিচায়ক। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ব্রহ্মসূত্রের 'শাঙ্করভাষ্য', মীমাংসাসূত্রের 'শাবরভাষ্য', মনুসংহিতার 'মেধাতিথিভাষ্য' প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারা যায়। গদ্য-রচনার ক্রম-বিকাশের ইতিহাসে সংস্কৃত নাটক-সমূহের গদ্যাংশের উল্লেখও করিতে হয়।

পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য'

শাঙ্করভাষ্য

শাবরভাষ্য

মেধাতিথিভাষ্য

কতকগুলি প্রাচীন লেখমালায় (inscriptions) কাব্যলক্ষণাক্রান্ত গদ্য-রচনার

নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য

লেখমালা

গির্ণার প্রশস্তি (আ: ১৫০ খ্রীষ্টাব্দ) এবং হরিষেণের এলাহাবাদ প্রশস্তি (আ: ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ)।

'হর্ষচরিতে'র প্রারম্ভিক শ্লোকসমূহে বাণভট্ট ভট্টার হরিচন্দ্র এবং আঢ্যরাজ নামক দুইজন গদ্যকাব্য-রচয়িতার নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত সাক্ষ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে, গদ্যকাব্যের উৎপত্তি হইয়াছিল অতি প্রাচীন কালে এবং ইহা অনেক পরিমাণে উৎকর্ষলাভও করিয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ আদি গদ্যকাব্যগুলি কালক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

গদ্যকাব্যের প্রকারভেদ ও যুগবিভাগ

অলঙ্কার-শাস্ত্রের সূক্ষ্ম ভাগ বিভাগের কথা ছাড়িয়া দিলে আমরা দেখিতে পাই যে, গদ্যকাব্য মোটামুটি দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—কথা ও আখ্যায়িকা। এই দুই শ্রেণীর পরস্পর ভেদ অনেক আলঙ্কারিকই দেখাইতে

কথা

চেষ্টা করিয়াছেন। এই দুই জাতীয় গদ্য-রচনার স্থূল ভেদ এই যে, 'কথা'র বিষয়বস্তু নিছক কাল্পনিক, আর 'আখ্যায়িকা'র উপজীব্য এমন একটি ঘটনা যাহার ঐতিহাসিক সত্য

আখ্যায়িকা

কতক পরিমাণে বিদ্যমান। তবে এই ভাগ দুইটির পরস্পর ভেদ যে প্রাচীন কালেই তেমনভাবে মানা হইত না, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দণ্ডী (আ: ৮ম শতাব্দী)। তিনি বলিয়াছেন—কথাখ্যায়িকেত্যেকা জাতিঃ, সংজ্ঞাদ্বয়াঙ্কিতা; অর্থাৎ এক জাতীয় সাহিত্যেরই এই দুইটি সংজ্ঞামাত্র।

ইংরেজী নামকরণ করিতে গিয়া পণ্ডিতগণ সমগ্র সংস্কৃত গদ্য-সাহিত্যকে

Fable, Romance, Tale

fable, romance ও tale—এই তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। আমরা নিম্নলিখিতরূপে ভাগগুলি করিয়া লইতে পারি :—

(১) নীতিমূলক সাহিত্য,
(২) ঐতিহাসিক রচনা,
(৩) রমন্যাস (romance),
(৪) গল্প।

কালিদাসের গদ্যরচনা কিছু নাই বটে, তথাপি তাঁহাকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া গদ্যকাব্যের প্রাক্-কালিদাস যুগ ও কালিদাসোত্তর যুগ—এই দুইটি বিভাগ করিলে গদ্যকাব্যের ক্রমবিকাশের ধারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

কালিদাসপূর্ব যুগের গদ্য

এই যুগের গদ্যরচনাগুলি নীতিমূলক এবং দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(ক) অবদান সাহিত্য, (খ) পশুপাখীর গল্প।

(ক) অবদান গ্রন্থাবলী

বিষয়বস্তু ও রচনাপ্রণালী

জাতকের গল্পের ন্যায় অবদান গ্রন্থসমূহেও বোধিসত্ত্বের বিগত জীবনগুলির মহীয়সী কীর্তির বিবরণ পাওয়া যায়। মানবজীবনে কর্মফল ও বুদ্ধ এবং তন্মতাবলম্বী মহাপুরুষগণের প্রতি ভক্তি দ্বারা কঠোর কর্মফল হইতে অব্যাহতির উপায়—ইহা বোঝানই অবদানগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাদের রচনার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, গদ্যের সঙ্গে গাথা ও অন্যান্য প্রকারের শ্লোক সন্নিবেশিত হইয়াছে।

অবদানশতক

রচনাকাল

জাতীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে বোধ হয় 'অবদানশতক' প্রাচীনতম। ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে আমরা দুই একটি অনুমান করিতে পারি মাত্র। ইহাতে প্রচলিত মুদ্রা হিসাবে 'দীনার'-এর উল্লেখ হইতে মনে হয়, ইহা ১০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রচিত হয় নাই। খ্রীঃ তৃতীয় শতকে ইহা চীনা ভাষায় অনূদিত হয়—সুতরাং, এই গ্রন্থ এই যুগের পরের রচনাও হইতে পারে না।

দিব্যাবদান, মহাবস্তু, ললিতবিস্তর—রচনাকাল

এই শ্রেণীর অপর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'দিব্যাবদান'। এই গ্রন্থে কুমারলাতের 'কল্পনামণ্ডিতিকা'র বহুল ব্যবহারের নিদর্শন হইতে মনে হয়, ইহার রচনাকাল খ্রীঃ ১ম শতকের পূর্বে হইতে পারে না। এই গ্রন্থের সম্ভবতঃ সমসাময়িক অপর একটি গ্রন্থ 'মহাবস্তু' নামে খ্যাত। 'ললিতবিস্তর' শ্লোকবহুল গদ্যে রচিত এই জাতীয় আর একটি গ্রন্থ।

আর্যশূরের 'জাতকমালা' বা 'বোধিসত্ত্বাবদানমালা'য় পালি জাতক ও চর্যাপিটক হইতে সংগৃহীত কতক কাহিনীর সংস্কৃত গদ্যপদ্যে অনুবাদ আছে। এই গ্রন্থের রচনায় অশ্বঘোষের প্রভাব লক্ষিত হয়। আর্যশূর খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের পূর্ববর্তী লেখক।

বোধিসত্ত্বাবদানমালা

(খ) পশুপাখীর গল্প

এই জাতীয় গল্প ভারতবর্ষে কখন উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ঋগ্বেদের ভেক-সূক্তে (৭।১০৩), ব্রাহ্মণের শুনঃশেপের আখ্যানে বা উপনিষদের সারমেয়ের আখ্যানে (ছান্দোগ্য ১।১২) পশুপাখী প্রভৃতি ইতর প্রাণী লইয়া গল্প পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পরবর্তী যুগের গল্পগুলিতে যেমন একটি নীতিশিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য নিহিত আছে ঠিক তেমন উদ্দেশ্য বৈদিক যুগের উল্লিখিত গল্পগুলিতে পাওয়া যায় না, ঐগুলি প্রায়শঃই allegory (রূপক) বা satire (ব্যঙ্গরচনা)।

ঋগ্বেদ
ব্রাহ্মণ
উপনিষদ্

খ্রীষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতকের জাতকে অনেক পশুপাখীর গল্প আছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, এই জাতীয় গল্পের জন্য ভারত গ্রীসদেশের নিকট ঋণী। আবার, ইহার বিপরীত মতও অনেকে পোষণ করেন।

পূর্ববর্তী যুগের ঐরূপ রচনাগুলি পরবর্তী যুগের পশুপাখীর গল্পের অগ্রদূত হয়ত ছিল, কিন্তু পরবর্তী কালের রচনাবলীর পরিবেশ ও উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। বর্তমানে আলোচ্য গল্পগুলি রাজপুত্রদের বাল্যাবস্থায় নীতিশিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল—ইহা 'পঞ্চতন্ত্রকথামুখম্' হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। পশুপাখীতে মানুষের আচার ব্যবহার আরোপিত করিয়া বালকের চিত্তাকর্ষক গল্পের মাধ্যমে নীতি শিক্ষা দেওয়াই ছিল এই জাতীয় সাহিত্যের লক্ষ্য। নীতি প্রধানতঃ দ্বিবিধ—রাজনীতি ও বাস্তব-জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতা-প্রসূত নীতি।

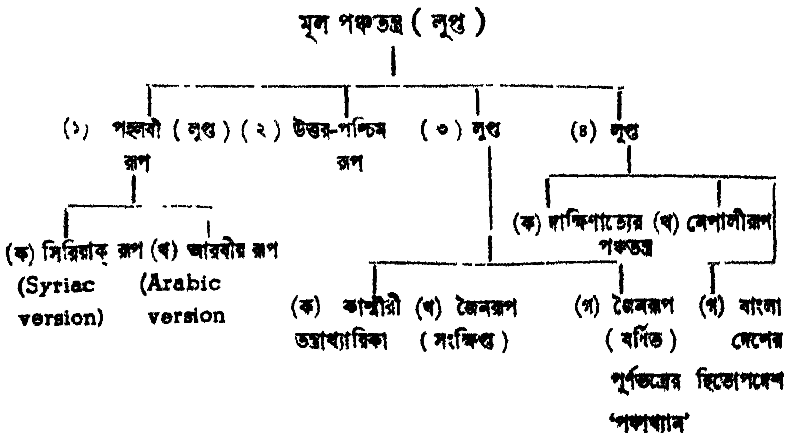
পরবর্তী গল্পের পরিবেশ ও উদ্দেশ্য

পঞ্চতন্ত্র

এই জাতীয় গল্পের একমাত্র নিদর্শন 'পঞ্চতন্ত্র'। নামটির সার্থকতা এই যে, ইহাতে পাঁচটি বিশিষ্ট ভাগ রহিয়াছে—(১) মিত্রভেদ, (২) মিত্রপ্রাপ্তি, (৩) সন্ধি-বিগ্রহ, (৪) লব্ধনাশ ও (৫) অপরীক্ষিতকারিত্ব। 'পঞ্চতন্ত্রে'র রচনার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উল্লিখিত প্রত্যেকটি ভাগই স্বয়ংসম্পূর্ণ, অথচ সমস্ত ভাগ একটি কাঠামোর অন্তর্গত। ইহাও লক্ষণীয় যে, প্রতিটি ভাগের মধ্যে যে একটি গল্প রহিয়াছে তাহা নহে ; বহু ছোট ছোট গল্প প্রধান গল্পটির মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। গল্পগুলি গদ্যে রচিত হইলেও মাঝেমাঝে নীতিগর্ভ শ্লোক আছে এবং এক একটি গল্পের উপসংহারে সেই সেই গল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি শ্লোকাকারে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

মূল পঞ্চতন্ত্র লুপ্ত ও বর্তমান রূপ

দুঃখের বিষয় এই যে, এমন একটি উপাদেয় গ্রন্থ, অপর অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের ন্যায়, বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এই 'পঞ্চতন্ত্র' এখন নানারূপে পাওয়া যায়। 'পঞ্চতন্ত্রে'র বিভিন্ন প্রধান রূপগুলিকে পণ্ডিতগণ নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন :—



'পঞ্চতন্ত্রে'র বর্তমান বিভিন্ন রূপগুলির মধ্যে 'তন্ত্রাখ্যায়িকা'কে সর্বাপেক্ষা

প্রাচীন সংস্কৃত রূপ বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। তাঁহাদের মতে, ইহাতেই মূল 'পঞ্চতন্ত্রে'র স্বরূপ সর্বাধিক রক্ষিত হইয়াছে। এই গোষ্ঠীর অপর দুই শাখাতে, অর্থাৎ 'সংক্ষিপ্ত' ও 'বর্ধিত' রূপে, মূল বিষয়বস্তুর বিকৃতি বহুল পরিমাণে ঘটিয়াছে। অধুনা-লুপ্ত পহ্লবীরূপের মাধ্যমেই এই গ্রন্থ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ইউরোপের fable সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম রূপটি কাশ্মীরী লেখক ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেবের উপজীব্য; ইহাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহারা যথাক্রমে 'বৃহৎকথামঞ্জরী'তে ও 'কথাসরিৎসাগর'-এ গল্পগুলিকে পরিবর্তিতরূপে সন্নিবেশিত করেন।

অন্যান্য শাখা

দাক্ষিণাত্যের রূপটি সংক্ষিপ্ত এবং ইহাতে একটি নূতন গল্প (মেষপালিকা ও তাহার প্রেমিকবৃন্দ) সংযোজিত হইয়াছে। এই রূপের কতক উপরূপও (sub-version) রহিয়াছে।

নেপালীরূপে কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, শ্লোকগুলিই মাত্র লিপিবদ্ধ আছে, আবার কোন ক্ষেত্রে গদ্য পদ্য দুইই আছে। 'হিতোপদেশ' ও নেপালীরূপের উপজীব্য এক—ইহা মনে করার একটি প্রধান কারণ এই যে, এই দুই রূপেই প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের ক্রম-বিপর্যয় দেখা যায়।

হিতোপদেশ

'হিতোপদেশে' 'পঞ্চতন্ত্রে'র পাঁচটি ভাগের মধ্যে মাত্র চারিটি ভাগ আছে। ইহা ছাড়া, ইহাতে সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন যথেষ্ট পরিমাণে আছে। 'কামন্দকীয় নীতিসার' হইতে বহু নীতিমূলক অংশ ইহাতে সন্নিবেশিত দেখা যায়। ইহার রচয়িতা নারায়ণ নিশ্চয়ই ১৩৭৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেকার লোক, কারণ, 'হিতোপদেশ'-এর উপলভ্যমান পুথিগুলির মধ্যে প্রাচীনতম পুথি এই তারিখে লিখিত। এই গ্রন্থে ভট্টারকবারের উল্লেখ আছে; এই শব্দটির প্রচলন ৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ছিল না। সুতরাং ইহাই 'হিতোপদেশ'-এর রচনাকালের ঊর্ধ্বতর সীমারেখা। নারায়ণের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে জনৈক ধবলচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়।

হিতোপদেশের রচয়িতা ও রচনাকাল

'পঞ্চতন্ত্রে'র উক্ত রূপগুলির মধ্যে পহ্লবী রূপটির সৃষ্টি হইয়াছিল

৫৩১-৭৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। সুতরাং, অধুনা-লুপ্ত মূল 'পঞ্চতন্ত্র' ঐ সময়ের পূর্বেকার রচনা, কত পূর্বের তাহা অবশ্য অনির্ণেয়। মূল গ্রন্থের রচয়িতা কে তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। 'কথামুখে' যে বিষ্ণুশর্মার উল্লেখ আছে, তাহা অনেক আধুনিক পণ্ডিতের মতে কাল্পনিক নাম। মূলটি ভারতের কোন্ অঞ্চলে রচিত হইয়াছিল এই বিষয়ে কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই—কেহ বলেন কাশ্মীরে, কেহ বলেন গৌড়ে; 'পঞ্চতন্ত্রকথামুখ' হইতে মনে হয়, ইহার উদ্ভব হইয়াছিল দাক্ষিণাত্যে। আরবী ও ফার্সী অনুবাদের মাধ্যমে 'পঞ্চতন্ত্রে'র গল্প প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহুদেশে পৌছিয়াছে এবং প্রায় পঞ্চাশটি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

মূল পঞ্চতন্ত্রের রচনাকাল ও উৎপত্তিস্থল

কালিদাসোত্তর যুগের গদ্য

এই যুগের গদ্যরচনাগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:

(১) ঐতিহাসিক রচনা,

(২) রমন্যাস (Romance),

(৩) গল্প।

১) ঐতিহাসিক রচনা

বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' একমাত্র ঐতিহাসিক গদ্যরচনা। গ্রন্থের প্রারম্ভে লেখক কতকগুলি শ্লোকে ভাস, কালিদাস প্রভৃতি পূর্ববর্তী আদর্শ কবিগণের গুণকীর্তন করিয়াছেন। গ্রন্থটি আটটি উচ্ছ্বাসে[১] বর্তমানে পাওয়া যায়। প্রথম উচ্ছ্বাসে বাণ নিজের বংশাবলী বর্ণনা করিয়া নিজের যৌবন পর্যন্ত কার্যকলাপ বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসে হর্ষবর্ধনের আদেশে তাঁহার সভায় বাণের আগমন, রাজার অশ্বের বর্ণনা প্রভৃতি আছে। তৃতীয় উচ্ছ্বাসে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাণ কিরূপে স্বজনদের নিকট রাজা হর্ষ ও স্থাণ্বীশ্বরের বিস্তৃত বর্ণনা করিলেন, তাহাই লিখিত আছে। চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে প্রধান বর্ণিত বিষয়গুলি পুষ্পভূতি নামক রাজা হইতে মহান্ রাজবংশের উদ্ভব, প্রভাকরবর্ধনের কার্যকলাপ, রাজ্যবর্ধন, হর্ষ ও রাজ্যশ্রীর জন্মবৃত্তান্ত, গ্রহবর্মার সহিত রাজ্যশ্রীর পরিণয়, হূণগণের বিরুদ্ধে

বাণভট্টের 'হর্ষচরিত'

১। অধ্যায়ের নাম উচ্ছ্বাস।

রাজ্যবর্ধনের অভিযান, প্রভাকরের মৃত্যু, মালবরাজ কর্তৃক গ্রহবর্মার হত্যা ও রাজ্যশ্রীর কারারোধ, গৌড়রাজকর্তৃক রাজ্যবর্ধনের হত্যা প্রভৃতি। সপ্তম উচ্ছ্বাসে বর্ণিত হইয়াছে গৌড়রাজের বিরুদ্ধে হর্ষের যুদ্ধযাত্রা, প্রাগ্‌-জ্যোতিষের রাজা কর্তৃক হর্ষের নিকট প্রেরিত উপঢৌকন, রাজ্যবর্ধন কর্তৃক পরাজিত মালবরাজের নিকট হইতে লুণ্ঠিত দ্রব্য সহ আগত ভণ্ডীর সহিত হর্ষের সাক্ষাৎকার, হর্ষকর্তৃক রাজ্যশ্রীর বিন্ধ্যপর্বতে গমনের সংবাদপ্রাপ্তি, গৌড়রাজের বিরুদ্ধে ভণ্ডীকে প্রেরণ এবং হর্ষ কর্তৃক স্বয়ং রাজ্যশ্রীর উদ্ধারার্থে গমন প্রভৃতি। অষ্টম উচ্ছ্বাসের বিষয়বস্তু বিন্ধ্যপর্বতে হর্ষকর্তৃক রাজ্যশ্রীর অন্বেষণ ও মরণোন্মুখী ভগিনীর উদ্ধার। এই ঘটনাপ্রসঙ্গে একটি আগতপ্রায় রাত্রির বর্ণনা চলিতে থাকিলে গ্রন্থটি অপ্রত্যাশিতভাবে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে কবিকল্পনা ও কবিসুলভ অতিরঞ্জন প্রভৃতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। মনে হয়, ইতিহাস অপেক্ষা সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে বিদগ্ধজনের চিত্তাকর্ষক একটি কাব্যরচনাই কবির উদ্দেশ্য। 'বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্ব' প্রভৃতি প্রশংসাসূচক মন্তব্য করিয়া দেশীয় সমালোচকগণ বাণকে অতি উচ্চস্তরের লেখক বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য কাব্যরসিকগণের দৃষ্টি-ভঙ্গীতে বাণভট্ট খুব উঁচুদরের কবি নহেন, তাঁহাদের মতে তিনি কঠিন কঠিন শব্দের ও দীর্ঘসমাসবহুল পদের প্রয়োগ করিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্য জাহির করিয়াছেন মাত্র এবং ফলে তাঁহার গ্রন্থপাঠে লোকের মনোরঞ্জন দূরের কথা, বরঞ্চ তাঁহাদের ক্লান্তি ও বিরক্তিই বোধ হয়। বাণভট্টের রচনাশৈলীর তারতম্য বিচারে নিরপেক্ষ মত দিতে হইলে বলা যায় যে, বাণভট্টের সুকবি-খ্যাতি তৎকালের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও রুচির উপর নির্ভরশীল। যে দীর্ঘ সমাসাদি বর্তমান রুচিতে বিরক্তিকর, সেই সমস্তই তৎকালে প্রশংসার বিষয় ছিল। দণ্ডী বলিয়াছেন, 'ওজঃসমাসভূয়স্ত্বমেতদ্ গদ্যস্য জীবিতম্' (কাব্যাদর্শ—১।৮০)। বর্তমান যুগে বাণভট্টের প্রতি যে কটাক্ষ, তাহার জন্য বহু শতাব্দীর ব্যবধানজনিত রুচি-পরিবর্তনই দায়ী। এই কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, শব্দের ঝঙ্কারে, বর্ণনার বাস্তবতায় ও কল্পনার গরিমায় বাণের গ্রন্থ সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্যিক বিচার

বাণভট্টের জীবনী সম্বন্ধে সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার 'কাদম্বরী'র কতক প্রারম্ভিক শ্লোকে এবং 'হর্ষচরিতে'র প্রথম দুই অধ্যায়ে ও তৃতীয় অধ্যায়ের প্রায় অর্ধাংশ পর্যন্ত আমরা অনেক তথ্য পাই। চিত্রভানু ও রাজ্যদেবীর পুত্র বাণ বাল্যাবস্থায় মাতা-পিতৃহীন হইয়া অসৎসঙ্গে পড়েন। নানাস্থানে ভ্রমণ করিবার পর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে, তিনি হর্ষবর্ধনের আদেশক্রমে তাঁহার সভায় উপস্থিত হন। ইহাতে তাঁহার জীবনে মহা পরিবর্তন ঘটে। কালক্রমে তিনি সুকবি-খ্যাতি অর্জন করেন। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল ৬০৬-৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং, বাণভট্ট ঐ সময়েরই লেখক ছিলেন, ইহা নিশ্চিত।

বাণভট্টের জীবনী ও কাল

(২) রমন্যাস

এই জাতীয় সাহিত্যের আলোচনায় দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত' অগ্রগণ্য। শুনিতে একটু অদ্ভুত মনে হয় যে, 'দশকুমারচরিতে' দশটির স্থলে রাজবাহন প্রভৃতি মাত্র আটজন রাজপুত্রের কার্যকলাপ বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থের নামের সার্থকতার জন্য 'পূর্বপীঠিকা' নামক আদ্য অংশে অপর দুইটি রাজপুত্রের কীর্তিকাহিনীর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 'বিশ্রুত' নামক একটি রাজকুমারের অসমাপ্ত কাহিনী 'উত্তর-পীঠিকা' নামক উপসংহারাংশে সমাপিত হইয়াছে। নানা কারণে, পূর্বপীঠিকা ও উত্তরপীঠিকাকে পণ্ডিতগণ পরবর্তী কোন লেখকের রচনা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত'

পূর্বপীঠিকা ও উত্তরপীঠিকা

'অবন্তিসুন্দরীকথা' নামক একটি গ্রন্থকে দণ্ডীর রচিত বলিয়া অনেকে মনে করেন; তাঁহাদের মতে, ইহাই 'দশকুমারচরিতে'র লুপ্ত আদ্য অংশ। 'অবন্তিসুন্দরীকথাসার' নামে ইহার ছন্দোবদ্ধ রূপও আছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে 'অবন্তিসুন্দরীকথা' দণ্ডীর রচিত হইতে পারে না।

অবন্তিসুন্দরীব

'দণ্ডিনঃ পদলালিত্যম্' ভারতীয় সুধীসমাজে দণ্ডী সম্বন্ধে সুপ্রচলিত প্রশংসাবাণী। দণ্ডীর ভাষার পারিপাট্য ও সুললিত শব্দবিন্যাস যথার্থই

প্রশংসার্হ। স্থানে স্থানে দীর্ঘসমাসবহুল বাক্যের প্রয়োগে অর্থবোধে পাঠকের কষ্ট হয় বটে, কিন্তু গ্রন্থের কাব্যরস উপভোগ্য। দণ্ডীর রচনা বৈদর্ভী রীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সাধারণ আখ্যানকে কল্পনার রঙে রঞ্জিত করিয়া উহাকে সরস ভাষায় মণ্ডিত করা দণ্ডীর কৃতিত্বের পরিচায়ক। তাৎকালিক সমাজের

সাহিত্যিক চিত্র

চিত্রটিও এই গ্রন্থে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। চরিত্র-চিত্রণে, হাস্যরসের সৃষ্টিতে ও রচনার কৌশলে দণ্ডী গদ্যকাব্যলেখকগণের শীর্ষস্থানীয়।

দণ্ডীর জীবনকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়।

দণ্ডীর জীবনকাল

বিভিন্ন মতগুলি সংক্ষেপে এইরূপ :—

(১) এই দণ্ডী ও 'কাব্যাদর্শ' নামক অলঙ্কারগ্রন্থের রচয়িতা

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের পরবর্তী

দণ্ডী অভিন্ন। 'কাব্যাদর্শ'-প্রণেতা দণ্ডীকে রাজা প্রবরসেনের পরবর্তী লেখক বলিয়া মনে করা হয়। 'রাজতরঙ্গিণী'র সাক্ষ্য অনুসারে প্রবরসেন ষষ্ঠ শতাব্দীতে কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

(২) দণ্ডীর সঙ্গে আলঙ্কারিক ভামহের কালানুক্রমিক সম্বন্ধ পণ্ডিতগণের মধ্যে ভীষণ বিতর্কের বিষয়। কেহ বলেন, দণ্ডী ভামহের মতের সমালোচনা করিয়াছেন, আবার কেহ বিপরীত মতও পোষণ করিয়া থাকেন। ভামহের কাল আঃ অষ্টম শতাব্দী বলিয়া কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন।

(৩) কেহ কেহ মনে করেন যে, দণ্ডী নিশ্চয়ই 'ভট্টিকাব্যে'র সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। ভট্টির কাল আঃ ৭ম শতাব্দী; সুতরাং দণ্ডীর কাল ইহার পরে।

অধ্যাপক সুশীল দে মহাশয়ের মতে দণ্ডী সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী

প্রথমার্ধের লোক।

দণ্ডী প্রণীত 'কাব্যাদর্শ' ও 'দশকুমারচরিতে'র আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে

দণ্ডী দাক্ষিণাত্যবাসী

দণ্ডী দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' এই জাতীয় অপর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। রাজকুমার কন্দর্পকেতু এবং রাজকুমারী বাসবদত্তার প্রেমের কাহিনী এই গ্রন্থের বিষয়-

বন্ধু। কন্দর্পকেতু রাত্রিতে স্বপ্নে বাসবদত্তাকে দেখেন এবং তাঁহার অন্বেষণে যাত্রা করেন। এদিকে বাসবদত্তাও তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া রাজকুমারের অন্বেষণে একজনকে প্রেরণ করেন। পথে কন্দর্পকেতু এক বিহগ-দম্পতী হইতে বাসবদত্তার কথা জানিতে পারেন। ভ্রমণ করিতে করিতে রাজকুমার পাটলিপুত্রে আসেন। সেখানে বাসবদত্তার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটিল বটে, কিন্তু বাসবদত্তার পিতা তাঁহাকে পাত্রান্তরে সমর্পণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অতঃপর, তাঁহারা উভয়ে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বিন্ধ্যপর্বতে প্রস্থান করেন। একদিন প্রভাতে জাগরিত হইয়া রাজকুমারীকে কন্দর্পকেতু দেখিতে পাইলেন না। অনেক অনুসন্ধানের পরে তিনি বাসবদত্তাকে এক মুনির আশ্রমে পাইলেন; কিন্তু রাজকুমারী তখন শিলায় পরিণতা। রাজকুমারের স্পর্শে তিনি পুনর্জীবিতা হন।

সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'

সুবন্ধুর রচনা সেকালে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল, ইহার প্রমাণ নিম্নোক্ত সমালোচকোক্তিতে পাওয়া যায় :—

খ্যাতি ও তাক 'বচার

সুবন্ধুর্বাণভট্টশ্চ কবিরাজ ইতি ত্রয়ঃ।
বক্রোক্তিমার্গনিপুণাশ্চতুর্থো বিদ্যতে ন বা॥

নানাবিধ শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারে, বিশেষতঃ অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বিরোধাভাস প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রয়োগে সুবন্ধুর রচনা স্থানে স্থানে মনোজ্ঞ, সন্দেহ নাই। নিজেকে 'প্রত্যক্ষরশ্লেষময়বিন্যাসবৈদগ্ধ্যনিধি' বলিয়া সুবন্ধু যে আত্মপ্রসাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আধুনিক রুচিতে তাঁহার রচনার ক্লিষ্টত্বের পরিচায়ক। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর বর্ণনায়ও সুবন্ধুর রচনা প্রয়াসপ্রসূত, স্বচ্ছন্দগতি নহে।

'কাদম্বরী'তে বাসবদত্তার উল্লেখ হইতে বুঝা যায়, সুবন্ধু বাণের পূর্ববর্তী। 'বাসবদত্তা'তে[১] লেখক বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ করিয়াছেন —ইহা হইতে কেহ কেহ সুবন্ধুকে গুপ্তরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক লেখক বলিয়া মনে করেন। পাশ্চাত্ত্য

সুবন্ধুর কাল

১ প্রারম্ভিক দশম শ্লোকে।

পণ্ডিতগণের মতে, 'বাসবদত্তা'তে গ্রন্থকার নৈয়ায়িক উদ্দ্যোতকরের ও ধর্মকীর্তির 'বৌদ্ধসঙ্গত্যালঙ্কার' নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতই যদি উক্ত ব্যক্তি ও বৌদ্ধগ্রন্থের উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে সুবন্ধুকে খ্রীঃ সপ্তম শতকের প্রারম্ভকালের লেখক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

বাণভট্টের 'কাদম্বরী' সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত রমন্যাস। তিনি ইহার পূর্ব ভাগটি রচনা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পুত্র পুলিন্দ বা ভূষণভট্ট অবশিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ করেন।

বাণভট্টের 'কাদম্বরী'

ইহজীবনে এবং বিগত জীবনসমূহে চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরীর প্রেমের কাহিনী এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। এই মূল আখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতার প্রণয়োপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। মহাশ্বেতার প্রণয়-ক্লিষ্ট পুণ্ডরীক কর্তৃক অভিশপ্ত চন্দ্রমা মর্ত্যে চন্দ্রাপীড় রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া গন্ধর্বরাজকুমারী কাদম্বরীর প্রেমপাশে আবদ্ধ হন। আবার, চন্দ্রমার শাপে পুণ্ডরীক চন্দ্রাপীড়ের সখা বৈশম্পায়নরূপে জাত হন। বর্তমান জন্মে চন্দ্রাপীড় রাজা শূদ্রক ও বৈশম্পায়ন শুক আকারে জন্মগ্রহণ করেন।

সাহিত্যিক বিচার

এই কাহিনী অবলম্বনে বাণভট্ট অদ্ভুত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কল্পনার বিচিত্র রঙে, প্রাকৃতিক দৃশ্যের মনোজ্ঞ বর্ণনায়, প্রেমিক-প্রেমিকার চিত্তের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ও চরিত্র-চিত্রণে বাণভট্ট গদ্যকাব্য-রচয়িতৃগণের মধ্যে অগ্রগণ্য। বাণের শব্দ-সম্পদ এবং অলঙ্কারশাস্ত্রে পারদর্শিতা তাঁহার যশোভাণ্ডারের অতুলনীয় রত্ন। সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যের যদি এই একটি মাত্র গ্রন্থই থাকিত, তাহা হইলেও ভারতবর্ষ গদ্যরচনার গর্ব করিতে পারিত। প্রাচীন ভারতীয় সমালোচকগণের মতে, গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি; অর্থাৎ, গদ্যরচনাতে কবির রচনাশক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়। এই পরীক্ষায় বাণভট্ট কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বাণের এই গ্রন্থ যে এককালে ভারতবর্ষে পণ্ডিতগণের একান্ত প্রিয় হইয়াছিল, তাহার একটি প্রমাণ নিম্নোক্ত উক্তি :—

'কাদম্বরীরসজ্ঞানামাহারোঽপি ন রোচতে।' বর্তমান যুগে, আধুনিক সমালোচকের দৃষ্টিতে, বাণের ভাষা দুরূহশব্দবহুল, বাক্যগুলি এত বিরাট যে এক নিঃশ্বাসে পড়া যায় না এবং গল্পসমূহের অনুপ্রবেশ হেতু স্থানে স্থানে মূল উপাখ্যানের সূত্র হারাইয়া যায়। পাশ্চাত্ত্য সমালোচক Weber বলিয়াছেন যে, বাণের গদ্য একটি মহারণ্য, ইহাতে পথিককে ঝোপ ঝাড় কাটিয়া কাটিয়া অগ্রসর হইতে হয় এবং এইভাবে কিছুদূর যাইয়া সে দুরূহ শব্দরূপ হিংস্র জন্তুর সম্মুখীন হইয়া ভয়াতুর হইয়া পড়ে।

Weber-এর এই উক্তি বর্তমান রুচিতে সমর্থনীয় হইতে পারে। কিন্তু, আমাদের ভুলিয়া যাওয়া সমীচীন নহে যে, রাজার সাহায্যপুষ্ট কবি শান্তিময় পরিবেশে বসিয়া যে-যুগের পাঠকের জন্য এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন সে-যুগ বহু শতাব্দী পূর্বে অতীত হইয়াছে।[১]

বাণভট্টের জীবনী ও কাল

গদ্যকাব্য-রচয়িতৃগণের অগ্রগণ্য বাণভট্টের জীবনী ও জীবনকাল সম্বন্ধে বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

(৩) গল্প

সিংহাসন-দ্বাত্রিংশিকা' এই জাতীয় একখানি সুবিদিত গ্রন্থ। ইহার অপর নাম 'বিক্রম-চরিত'।

সিংহাসন-দ্বাত্রিংশিকা বা বিক্রম-চরিত

এই গ্রন্থখানি বত্রিশটি গল্পের সমষ্টি। বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনটি ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়া ভোজরাজের হস্তগত হইল। ভোজ সিংহাসনে আরোহণ করিবার উপক্রম করিলে, যে বত্রিশটি পুত্তলিকার উপরে সিংহাসনটি স্থাপিত ছিল তাহারা প্রত্যেকে এক একটি গল্পে বিক্রমাদিত্যের গুণকীর্তন করিতে থাকে। গল্পগুলি বলার উদ্দেশ্য এই যে,

১ 'কাদম্বরী' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' দ্রষ্টব্য।

বিক্রমাদিত্যের ন্যায় গুণসম্পন্ন না হইয়া এই সিংহাসনে কেহ বসিবার উপযুক্ত হইতে পারে না।

মূল গ্রন্থ অনাবিষ্কৃত ; বর্তমান রূপ

মূলগ্রন্থটি অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত। ইহা নিম্নলিখিত রূপে এখন পাওয়া যাইতেছে :—

মূল (লুপ্ত)

- উত্তরভারতীয়
  - জৈন ক্ষেমঙ্কর মুনি কর্তৃক রচিত গ্রন্থ [একটি মহারাষ্ট্র-রূপ অবলম্বনে 'লিখিত বলিয়া কথিত]
  - বররুচির নামে প্রচারিত বঙ্গদেশীয় রূপ [জৈনরূপের অবলম্বনে লিখিত]
  - অজ্ঞাত ব্যক্তি কর্তৃক রচিত সংক্ষিপ্ত রূপ
- দক্ষিণভারতীয় (বিক্রম চরিত নামে প্রচলিত)
  - গদ্যরূপ
  - পদ্যরূপ

সাহিত্যিক বিচার

গ্রন্থটি অতিশয় জনপ্রিয়। তবে, গল্পগুলি প্রায়শঃই বৈচিত্র্যহীন এবং নৈতিক উপদেশের আধিক্য হেতু পাঠকের বিরক্তিজনক।

মূলগ্রন্থের রচয়িতা ও রচনাকাল

এই গ্রন্থের রচয়িতা অজ্ঞাত এবং রচনাকালও নিশ্চিতভাবে অনির্ণেয়। জৈন এবং দক্ষিণ ভারতীয় রূপে হেমাদ্রির 'চতুর্বর্গচিন্তামণি' নামক গ্রন্থের উল্লেখ হইতে পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, ইহা সম্ভবতঃ খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হয় নাই।

'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'

'বেতালপঞ্চবিংশতি' গল্প-গল্পের অন্যতম গ্রন্থ। ইহাতে পঁচিশটি গল্প মূল গল্পটিতে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে, এই পঁচিশটি গল্প বর্তমানে চারিটি আকারে পাওয়া যায়।

(১) শিবদাস-কথিত—ইহাতে গদ্যের সহিত শ্লোকের সংমিশ্রণ আছে।

(২) জম্ভলদত্ত-রচিত—ইহাতে নীতিশ্লোক নাই।

(৩) বল্লভদাসকৃত সংক্ষিপ্ত রূপ।

(৪) অজ্ঞাত লেখকের রচিত রূপ।

ত্রিবিক্রমসেন বা বিক্রমসেন নামে এক রাজা ছিলেন। ইনি পরবর্তীকালে বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত হইয়াছেন। ইঁহাকে এক তাপস প্রত্যহ একটি করিয়া ফল দিতেন, সেই ফলে একটি রত্ন লুক্কায়িত থাকিত। এই তাপসের প্রীতি-উৎপাদনের জন্য রাজা বৃক্ষ হইতে দোদুল্যমান একটি মানুষের মৃতদেহ আনিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ঐ মৃতদেহ আনিতে গেলে উহার রক্ষক এক পিশাচ বা বেতাল রাজাকে বলে যে, তাহার কয়েকটি প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিলে রাজাকে ঐ দেহটি সে ছাড়িয়া দিবে। বেতালের প্রশ্নগুলি সব ধাঁধা। ধাঁধাগুলির মধ্যে দুই একটির নিদর্শন দেওয়া গেল। অন্নভক্ষণে প্রবৃত্ত জনৈক ব্যক্তি ঘ্রাণশক্তিদ্বারা বুঝিতে পারিল যে, ঐ অন্ন যে ধান্য হইতে প্রস্তুত সেই ধান্য শ্মশান-সন্নিহিত কোন ক্ষেত্রে জাত; এইজন্য সে ভক্ষণ হইতে বিরত হইল। এক ব্যক্তি দিব্য সুকোমল শয্যোপকরণের বহুস্তরের নীচে একটি কেশখণ্ড থাকা হেতু তাহাতে শয়ন করিতে পারিল না। এই ভোজন-বিলাসী ও শয্যা-বিলাসীর মধ্যে কে অধিকতর বিলাসী? কে সর্বাধিক প্রেমিক—যে প্রিয়ার মৃতদেহের সঙ্গে একই শ্মশানানলে নিজেকে দগ্ধ করে, না যে প্রিয়ার শ্মশান-প্রান্তে কুটীর নির্মাণ করিয়া তথায় শোকাকুল জীবন যাপন করে, অথবা যে মৃতা প্রিয়াকে ঘটনাক্রমে প্রাপ্ত মন্ত্রদ্বারা পুনর্জীবিত করে?

'বৃহৎকথা'র কাশ্মীরী দুইটি রূপেই 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র গল্পগুলির প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু 'বৃহৎকথা'র নেপালীরূপে ইহাদের সন্ধান মিলে না।

সাহিত্যিক মূল্য

সুতরাং, ঐ গ্রন্থই 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র উপজীব্য, এমন কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। লেখকের মৌলিকতা থাকুক বা না থাকুক, ইহা অবিসংবাদিত যে, গল্পগুলি চিত্তাকর্ষক, বৈচিত্র্যময় ও অনেক ক্ষেত্রে হাস্যরসপ্রধান। এইগুলিতে খাঁটি লোকসাহিত্যের ছাপ রহিয়াছে।

'বেতালপঞ্চবিংশতি'র চারিটি রূপের মধ্যে শিবদাসকৃত রূপটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ও বিখ্যাত। শিবদাসের কাল অজ্ঞাত।

'শুকসপ্ততি'
—তিনটি বর্তমান রূপ

গদ্য-পদ্যের অপর একখানি গ্রন্থের নাম 'শুকসপ্ততি'। এই গ্রন্থটির তিনটি রূপ বর্তমানে পাওয়া যাইতেছে:—

(১) Simplicior বা সংক্ষিপ্ত রূপ—জনৈক জৈনধর্মাবলম্বী ব্যক্তি কর্তৃক রচিত।

(২) Ornatior বা বর্ধিত রূপ—চিন্তামণি ভট্ট কৃত।

(৩) দেবদত্তকৃত।

এক ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাঁহার পত্নী অন্য ব্যক্তির প্রতি আসক্তা হইয়া গৃহত্যাগের উপক্রম করিলে অনুপস্থিত ব্যক্তির পালিত শুকপাখীটি একাদিক্রমে সত্তরটি গল্প বলিয়া ঐ পত্নীর কৌতূহল উদ্দীপিত করিয়া রাখে; ইতোমধ্যে তাঁহার পতি প্রত্যাবর্তন করেন। এইরূপে বিশ্বস্ত শুকপাখীর কৌশলে তাহার প্রভু মহা অনর্থ হইতে নিষ্কৃতি পান। সংক্ষেপে ইহাই এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। গল্পগুলি নিপুণভাবে লিখিত। সংক্ষিপ্ত রূপের লেখক অপেক্ষা বর্ধিত রূপের রচয়িতার রচনাকৌশলের প্রতি লক্ষ্য অধিকতর। ইহাও সংস্কৃত গদ্যে রচিত লোকসাহিত্যের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

এই গ্রন্থের বর্ধিত রূপের রচয়িতা চিন্তামণি সম্ভবতঃ খ্রীঃ দ্বাদশ শতকের পূর্বেকার লোক নহেন। সংক্ষিপ্ত রূপটিতে প্রাকৃত শ্লোক থাকায় কেহ কেহ মনে করেন যে, ইহা সম্ভবতঃ প্রাকৃতে রচিত কোন মূলগ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত।

রচনাকাল

সাধারণ গদ্যসাহিত্য

এ পর্যন্ত যে গদ্যসাহিত্যের আলোচনা করা গেল, তাহাই সংস্কৃত গদ্য-কাব্যের গৌরব। উক্ত গ্রন্থাবলী ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং সাধারণ বহু গদ্যকাব্য পাওয়া গিয়াছে। তবে, এগুলি তেমন প্রসিদ্ধ নয় এবং ইহাদের রচনাশৈলী বা বিষয়বস্তু তত উপাদেয় নয়। বস্তুতঃ, বাণভট্টের পরবর্তী গদ্য-সাহিত্যে যেন কবি-প্রতিভা ক্রমক্ষীয়মাণ। এইজন্যই বাণভট্টোত্তর যুগের গদ্যকাব্যকে ইদানীন্তন পণ্ডিতগণ 'decadent prose' (ক্ষয়িষ্ণু গদ্য) আখ্যা দিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা সাধারণ রচনাগুলির মধ্যে অপেক্ষা-কৃত উৎকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ রচনাগুলির একটি অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

গ্রন্থনাম [বর্ণানুক্রমে লিখিত]	রচয়িতার নাম ও কাল	সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু
কথার্ণব	শিবদাস [কাল অজ্ঞাত]	প্রধানতঃ মূর্খ ও তস্করের পঁয়ত্রিশটি গল্প
কথাকোষ	বর্ধমান সূরি	নলোপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত।
কথারত্নাকর	হেমবিজয়গণি (আঃ খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দী)	মূর্খ ও দুষ্ট ব্যক্তি এবং ধূর্ত নারীগণ সম্বন্ধে ২৫৮টি বিবিধ গল্প।
চম্পকশ্রেষ্ঠিকথানক	জিনকীর্তি (খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দী)	রূপকথা।
পুরুষপরীক্ষা	মৈথিল বিদ্যাপতি (খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দী)	পুরুষজনোচিত গুণ সম্বন্ধে ৪৪টি গল্প।
প্রবন্ধকোষ	রাজশেখর সূরি (খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দী)	কতিপয় রাজা, জৈন মহাপুরুষ এবং কবির জীবনী অবলম্বনে লিখিত।
প্রবন্ধচিন্তামণি	মেরুতুঙ্গ (খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দী)	বিক্রমাদিত্য ও ভোজ প্রভৃতি রাজাদের কাহিনী।
ভরটক-দ্বাত্রিংশিকা	অজ্ঞাত	ভরটকাখ্য উপহাসাস্পদ সন্ন্যাসিগণের গল্প।
ভোজপ্রবন্ধ	বল্লালসেন (খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দী— বাংলার রাজা বল্লালসেন হইতে ভিন্ন ব্যক্তি)	ধারারাজ ভোজের গল্প।
সম্যক্ত্বকৌমুদী	অজ্ঞাত	কি করিয়া সম্যক্ ধর্ম লাভ হইল, সেই সম্বন্ধে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীগণের নিকট গল্প এবং স্ত্রীগণ কর্তৃক স্বামীর নিকট কথিত গল্প

ঊনত্রিংশ

চম্পূকাব্য

'চম্পূ' শব্দটির উৎপত্তি কখন কেমন করিয়া হইল, বলা যায় না। প্রাচীন আলঙ্কারিক দণ্ডী তাঁহার 'কাব্যাদর্শে' (১৷৩১) এই জাতীয় কাব্যকে 'গদ্যপদ্যময়' বলিয়াছেন। পরবর্তী কালে, অনেক আলঙ্কারিকই চম্পূ কাব্যের লক্ষণ বলিয়াছেন; কিন্তু, কতটুকু গদ্য এবং কি পরিমাণে পদ্য থাকিবে, এই সম্বন্ধে কেহই কিছু বলেন নাই। কথা ও আখ্যায়িকারূপ গদ্যসাহিত্যে গদ্যের সঙ্গে সঙ্গে পদ্য মিশ্রিত আছে; কিন্তু ইহাদের তুলনায় চম্পূতে পদ্যাংশ অধিকতর। পঞ্চতন্ত্রে পদ্যের প্রয়োগ প্রায়ই হইয়াছে কোন নৈতিক উপদেশচ্ছলে অথবা একটি বর্ণনার উপসংহারস্বরূপে। চম্পূতে গদ্যপদ্যের মিশ্রণে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম দেখা যায় না। সম্ভবতঃ বৈচিত্র্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অথবা পদ্যকাব্যের প্রতি পাঠকসমাজের সমধিক প্রীতিহেতু চম্পূ-রচয়িতা ইতস্ততঃ পদ্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। চম্পূকাব্যের সহিত দণ্ডীর (খ্রীষ্টীয় ৮ম শতক) পরিচয় থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে আমরা খ্রীঃ দশম শতকের পূর্বের কোন চম্পূর নিদর্শন পাই না। সময়ের অত্যন্ত ব্যবধান এবং পদ্যাংশের প্রয়োগের পদ্ধতির প্রভেদ প্রভৃতি কারণে চম্পূকে পদ্যাংশসম্বলিত পালি জাতক এবং 'পঞ্চতন্ত্রে'র আদর্শে সৃষ্ট মনে না করাই সঙ্গত মনে হয়। কথা ও আখ্যায়িকারূপ গদ্যকাব্যের সঙ্গে চম্পূর সাদৃশ্য যথেষ্ট। সুতরাং পদ্য ও উক্ত প্রকার গদ্যের প্রভাবের সংমিশ্রণেই এই জাতীয় কাব্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা মনে করা সম্ভবতঃ অযৌক্তিক নহে।

চম্পূকাব্যের লক্ষণ ও প্রাচীনত্ব

গদ্যকাব্য এবং চম্পূর সাদৃশ্য ও প্রভেদ

পালি জাতক ও চম্পূ

চম্পূর বিষয়বস্তু প্রায়ই legend বা উপকথা। কোন কোন চম্পূ অবশ্য নানা বিষয় অবলম্বনে রচিত।

চম্পূর বিষয়বস্তু

এপর্যন্ত যে সমস্ত চম্পূকাব্য পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ত্রিবিক্রমভট্টের বা

সিংহাদিত্যের 'নল-চম্পূ' বা 'দময়ন্তী-কথা' প্রাচীনতম। গ্রন্থের নামটিই ইহার বিষয়বস্তুর পরিচায়ক। নলদময়ন্তীর প্রসিদ্ধ উপাখ্যানের কিয়দংশ অবলম্বন করিয়া কবি সাতটি 'উচ্ছ্বাসে' কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। ইহার রচনাতে কবি নিজের পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের অনেক চেষ্টা করিতে গিয়া কবিত্ব অপেক্ষা সাহিত্যিক ব্যায়ামের (literary exercise) পরিচয়ই বেশী দিয়াছেন।

চম্পূকাব্যের বিভিন্ন গ্রন্থ—'নলচম্পূ'

ত্রিবিক্রম সম্ভবতঃ খ্রীঃ দশম শতকের প্রথম পাদের লোক।

জৈন সোমপ্রভ সূরির রচিত 'যশস্তিলকচম্পূ' এই জাতীয় গ্রন্থ।

'যশস্তিলকচম্পূ'

ইহাতে অবন্তিরাজ যশোধরের গম্ভীর চক্রান্ত, মৃত্যু ও বহুবার পুনর্জন্ম এবং পরিশেষে জৈনধর্মগ্রহণ প্রভৃতি কাহিনী বর্ণিত আছে।

গল্পে নূতনত্ব নাই, অনেক জৈন গ্রন্থেই ইহা আছে। আটটি 'আশ্বাসে' লিখিত এই গ্রন্থে কবির অলঙ্কার ও ছন্দশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু চম্পূটিকে কবির স্বীয় জৈন ধর্ম প্রচারের একটি উপায়স্বরূপ মনে হয়, ইহাতে কাব্যটির সাহিত্যিক মূল্য অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

এই চম্পূ ৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।

উক্ত দুইটি চম্পূ ব্যতীত আরও কয়েকটি চম্পূ আছে, উহাদের মধ্যে প্রধান চম্পূগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল।

গ্রন্থনাম	রচয়িতা	কাল
(বর্ণানুক্রমিক)		
উদয়সুন্দরীকথা	সোড্ঢল	১০৪০ খ্রীষ্টাব্দ
গোপালচম্পূ	জীবগোস্বামী	খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দী
তিলকমঞ্জরী	ধনপাল	৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি
ভারতচম্পূ	অনন্ত	?
রামায়ণচম্পূ	ভোজরাজ	?
	ও লক্ষ্মণ ভট্ট	?

কুড়ি

দৃশ্যকাব্য

এই অধ্যায়ের নাম 'নাটক' না দিয়া 'দৃশ্যকাব্য' কেন দেওয়া হইল, তাহা প্রথমে বলা প্রয়োজন। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, দৃশ্যকাব্যের প্রধান দুইটি ভাগ—রূপক ও উপরূপক। রূপক দশবিধ; ইহাদের মধ্যে একপ্রকার রূপকের নাম 'নাটক'। নাট্যগ্রন্থমাত্রকেই বাংলার ন্যায় সংস্কৃতে নাটক বলা হয় না। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা শুধু দৃশ্যকাব্যের একদেশ নাটকের আলোচনাই করিব না, কিন্তু 'দৃশ্যকাব্য' নামে অভিহিত সমগ্র সাহিত্যের আলোচনাই করিব।

দৃশ্যকাব্যের প্রকারভেদ

এই জাতীয় কাব্যের ভাগ-বিভাগগুলি নিম্নলিখিতরূপ :—

দৃশ্যকাব্য

রূপক | উপরূপক

রূপক:
(১) নাটক (২) প্রকরণ (৩) ভাণ (৪) ব্যায়োগ
(৫) সমবকার (৬) ডিম (৭) ঈহামৃগ (৮) অঙ্ক (৯) বীথী (১০) প্রহসন

উপরূপক:
(১) নাটিকা (২) ত্রোটক (৩) গোষ্ঠী (৪) সট্টক (৫) নাট্যরাসক (৬) প্রস্থান (৭) উল্লাপ্য (৮) কাব্য
(৯) প্রেঙ্খণ (১০) রাসক (১১) সংলাপক (১২) শ্রীগদিত (১৩) শিল্পক (১৪) বিলাসিকা
(১৫) দুর্মল্লিকা (১৬) প্রকরণী (১৭) হল্লীশ (১৮) ভাণিকা

ইহাদের মধ্যে নাটক, নাটিকা, প্রকরণ ও ভাণই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং, ইহাদের লক্ষণ সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে।

নাটক

'সাহিত্যদর্পণ'কার বিশ্বনাথের মতে, নাটকের বস্তু হইবে বিখ্যাত কোন বৃত্তান্ত; ইহার নায়ক হইবেন গুণবান্, প্রখ্যাতবংশ

ও ধীরোদাত্ত[1] রাজা অথবা দিব্য পুরুষ। নাটকের প্রধান রস শৃঙ্গার বা বীর; অন্যান্য রস অঙ্গস্বরূপে থাকিবে। অঙ্কসংখ্যা হইবে পাঁচ হইতে দশ। দূরাহ্বান, বধ, যুদ্ধ, মৃত্যু, ব্রীড়াকর বা অশ্লীল কোন ব্যাপার নাটকে থাকিবে না।[2]

নাটিকা

নাটিকার বিষয়বস্তু কাল্পনিক এবং নায়ক ধীরললিত[3] রাজা। ইহাতে মহিষীর মান প্রভৃতি বাধা অতিক্রম করিয়া অন্য 'নবানুরাগা' নারীর সহিত রাজার পরিণয়ের বর্ণনা থাকিবে। নাটিকার অঙ্কসংখ্যা হইবে চার।[4]

প্রকরণ

কবিকল্পিত লৌকিক বৃত্তান্ত লইয়া প্রকরণ রচিত হইবে। ইহাতে প্রধান রস শৃঙ্গার। প্রকরণের নায়ক ধীরপ্রশান্ত[5] ব্রাহ্মণ, অমাত্য বা বণিক্ এবং নায়িকা কুলবধূ বা বেশ্যা অথবা, কোন কোন ক্ষেত্রে, উভয়ই। নায়িকার প্রকার অনুসারে প্রকরণ তিন প্রকার হইবে; তন্মধ্যে তৃতীয় প্রকারের রচনায় ধূর্ত, দ্যূতকার ও বিট প্রভৃতি চরিত্রের প্রাচুর্য থাকিবে। প্রকরণের অঙ্কসংখ্যা সাধারণতঃ দশ।[6]

ভাণ

ভাণ একাঙ্ক নাট্যগ্রন্থ। ইহাতে বিট একমাত্র চরিত্র, বিষয়বস্তু ধূর্ত নায়কের কার্যকলাপ এবং রস শৃঙ্গার ও বীর।[7]

দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত

ভারতবর্ষে দৃশ্যকাব্যের ধারণা কোন সুদূর অতীতে জন্মিয়াছিল, তাহা অনির্ণেয়। এই সম্বন্ধে ভারতীয় ও বৈদেশিক পণ্ডিতগণ কতকগুলি অনুমান

১ দ্রষ্টব্য : সাহিত্য দর্পণ, ৬।৩৭
২ ঐ ৬।১৬
৩ ঐ ৬।৩৯
৪ ঐ ৬।২৮১
৫ ঐ ৬।৪০
৬ ঐ ৬।২২৩

করিয়াছেন। তাঁহাদের বিভিন্ন মতাবলীর মধ্যে প্রধান প্রধান মতগুলি নিম্নলিখিতরূপ—

ঋগ্বেদের সংবাদসূক্ত (Dialogue hymns)

(১) কোন কোন পণ্ডিতের মতে, ঋগ্বেদের পুরূরবা-উর্বশী, যম-যমী প্রভৃতি সংবাদ-সূক্তগুলি হইতেই সর্বপ্রথম দৃশ্যকাব্যের ধারণা সেই যুগে জন্মিয়াছিল।

Puppot-play বা পুতুল-নাচ (পিশেল)

(২) প্রাচীন ভারতে বহুকাল হইতেই জনসাধারণের আমোদের জন্য পুতুল-নাচের প্রচলন ছিল। পিশেল (Pischel) মনে করেন যে, এই পুতুলনাচ হইতেই দৃশ্যকাব্যের উদ্ভব, ইহার একটি প্রমাণ, নাটকে ব্যবহৃত দুইটি শব্দ—সূত্রধার (যিনি সূত্র ধরিয়া থাকেন) ও স্থাপক (যিনি পুতুলগুলিকে স্থাপন করেন)।

বসন্তোৎসব

(৩) কেহ কেহ মনে করেন, শীতের পরে যে বসন্তোৎসব প্রচলিত ছিল সেই উৎসবই দৃশ্যকাব্যের উৎস।

পরলোকগত পূর্বপুরুষগণের উদ্দেশে অনুষ্ঠান (রিজওয়ে)

(৪) রিজওয়ে (Ridgeway)-র মতে, পরলোকগত পূর্বপুরুষগণের উদ্দেশে প্রাচীন কালে যে অনুষ্ঠান বিহিত ছিল, তাহারই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ দৃশ্যকাব্য।

ব্রহ্মার সৃষ্টি (নাট্যশাস্ত্র)

(৫) ভরতের নাট্যশাস্ত্রে লিখিত আখ্যানে দেখা যায় যে, স্বয়ং ব্রহ্মা দৃশ্যকাব্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি চতুর্বেদ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; শিবের তাণ্ডব এবং পার্বতীর লাস্যও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। এই আখ্যান হইতে আরও জানা যায় যে, ব্রহ্মা নিজে 'অমৃতমন্থন' ও 'ত্রিপুরদাহ' নামে দুইটি দৃশ্যকাব্য রচনা করেন।

গ্রীক্‌প্রভাব (Weber, প্রভৃতি)

(৬) পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত Weber ও তাঁহার মতানুসারিগণের মতে, গ্রীসদেশ হইতে ভারতীয়েরা দৃশ্যকাব্যের ধারণা প্রথম পাইয়াছিল। এই মতের সমর্থনে গ্রীক ও ভারতীয় উভয় প্রকার দৃশ্যকাব্যের মধ্যে বহু সাদৃশ্য দেখান যায়। আলেকজাণ্ডারের অভিযানের (খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতক) পর হইতে গ্রীস্‌দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল এবং ভারতে গ্রীক্

কেন্দ্র আলেকজান্ড্রিয়া নগরী ছিল প্রসিদ্ধ। ভারতের উজ্জয়িনীর সঙ্গে ঐ স্থানের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল। তখন হইতে ভারতবাসিগণ সংস্কৃতে দৃশ্যকাব্য রচনা করিবার প্রেরণা পাইয়াছিল। এই মতের সমর্থনে আরও বলা যায় যে, সংস্কৃত নাটকে 'যবনিকা' শব্দটির প্রয়োগ হইল 'যবন' (=গ্রীকবাসী) হইতে। তাহা ছাড়া, সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থে রাজার দেহরক্ষিণীর 'যবনী' বলিয়া যে পরিচয় আছে উহাও গ্রীক্ প্রভাবের ইঙ্গিত দেয়। দক্ষিণ-ভারতে সীতাবেঙ্গা গুহায় গ্রীক্ রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে নির্মিত যে ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা গ্রীক্ প্রভাবের একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া এই মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ মনে করিয়া থাকেন।

সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের উপরে গ্রীক্ প্রভাব প্রমাণ করিতে যাইয়া এই মতের সমর্থকগণ উভয় দেশের নাট্যগ্রন্থের বস্তুগত অনেক সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। অজ্ঞাত কোন যুবতীর প্রতি রাজার অনুরাগ, বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিবার পর যুবতীর প্রকৃত পরিচয় লাভ ও রাজার সহিত মিলন—এইরূপ ব্যাপার গ্রীক্ ও ভারতীয় নাট্যগ্রন্থের মধ্যে রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, পরিচয়-জ্ঞাপনে স্মারক দ্রব্যের প্রয়োগ উভয় দেশের নাট্যগ্রন্থেই বিদ্যমান। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা'র অভিজ্ঞানরূপ অঙ্গুরীয়ক, 'বিক্রমোর্বশীয়ে'র সঙ্গমমণি প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়।

'মৃচ্ছকটিকে' প্রেমঘটিত ব্যাপারের সহিত রাজনৈতিক ঘটনার যে সংমিশ্রণ দেখা যায়, উহাও গ্রীস্ দেশের নিকট হইতে প্রাপ্ত—এই যুক্তিও উক্ত মতের সমর্থকগণ প্রদর্শন করেন। এ্যারিস্টটল নির্দেশ দিয়াছেন যে, একদিনের বা তাহার কিছু বেশী সময়ের ঘটনা নাটকীয় বস্তুরূপে গৃহীত হইতে পারে। উক্ত মতের সমর্থকগণ বলেন, ইহারই প্রভাবে সংস্কৃত নাটকের অঙ্ক সম্বন্ধে নির্দেশ হইয়াছিল যে, ইহা হইবে 'নানেকদিননির্বর্ত্যকথাভিঃ সম্প্রযোজিতঃ'; অর্থাৎ এক একটি অঙ্কে এমন ঘটনার বিন্যাস থাকিবে, যাহা একদিনে ঘটিতে পারে।

লেভি (Levi) প্রমুখ কতক পণ্ডিত উক্তমতের বিরোধিতা করিয়াছেন। গ্রীকপ্রভাবের বিরুদ্ধে বহু যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে; দেখান হইয়াছে যে, 'যবন' শব্দে শুধু যে গ্রীস-দেশীয় লোককে বুঝাইত তাহা নহে।

পারস্ত, মিশর, সিরিয়া প্রভৃতি স্থানের লোককে বুঝাইতেও এই শব্দের প্রয়োগ হইত।

সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যে গ্রীক্ প্রভাবের সমর্থনে উল্লিখিত যুক্তিগুলির মধ্যে কোনটিই অকাট্য নহে। উভয় দেশের নাট্য-সাহিত্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে বটে; কিন্তু, ইহা হইতে একের উপরে অন্যের প্রভাব প্রমাণিত হয় না। সংস্কৃত নাট্যকারগণ হয়ত গ্রীক্ নাট্যকারগণের প্রভাব-মুক্ত ছিলেন না, হয়ত ভারতীয় নাট্যসাহিত্য গ্রীক্ লেখকগণের ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু, ভারতীয় লেখকগণ বৈদেশিকগণের নিকট হইতে কিছু কিছু উপাদান গ্রহণ করিয়া থাকিলেও তাহাকে স্বীয় প্রতিভার স্পর্শে এমন স্বকীয় করিয়া লইয়াছিলেন যে, তাহাতে ঋণের কোন স্পষ্ট স্বাক্ষর নাই।

দৃশ্যকাব্যের যুগবিভাগ

কালিদাস সংস্কৃত কবিগোষ্ঠীর মধ্যমণি। সুতরাং, তাঁহাকে কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত করিয়া দৃশ্যকাব্যের নিম্নলিখিতরূপ যুগবিভাগ করা যাইতে পারে:—

কালিদাসপূর্ব যুগ,
কালিদাস-যুগ,
কালিদাসোত্তর যুগ।

সংস্কৃত সাহিত্যে কবির জীবনকাল ও কাব্যের রচনার সময় এত অনিশ্চিত যে, দৃশ্যকাব্যের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন যুগগুলির কালসীমা নির্ধারণ দুঃসাধ্য বা অসাধ্য।

কালিদাসপূর্ব যুগ

এই যুগের প্রারম্ভকাল অজ্ঞাত। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'তে নটসূত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় (৪.৩.১১০)। ঐ শতকের কৌটিলীয় 'অর্থশাস্ত্র' নামক গ্রন্থে 'কুশীলব' শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। অষ্টাধ্যায়ীর পতঞ্জলিকৃত 'মহাভাষ্যে' 'কংসবধ' ও 'বলিবন্ধ' নামে দুইটি দৃশ্যকাব্যের উল্লেখ আছে। 'রামায়ণে' 'নাটক' শব্দটির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং 'মহাভারতে'র অন্তর্গত 'হরিবংশে' কৃষ্ণের বংশধরগণ কর্তৃক অভিনীত নাটকের কথা লিখিত আছে।

দৃশ্যকাব্যের উদ্ভবকাল
'অষ্টাধ্যায়ী'র সাক্ষ্য
'অর্থশাস্ত্র'
'মহাভাষ্য'
'রামায়ণ'
'মহাভারত'

'মালবিকাগ্নিমিত্র' নামক নাটকের প্রস্তাবনায়, কালিদাস ভাসের নামের সঙ্গে সৌমিল্ল ও কবিপুত্র (পাঠান্তর—রামিল ও সোমিল) নামে অপর দুইজন নাট্যকারের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

কালিদাসের সাক্ষ্য

এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত দৃশ্যকাব্যগুলির মধ্যে অশ্বঘোষের 'শারিপুত্রপ্রকরণ'ই প্রাচীনতম। নাম হইতেই বুঝা যায়, ইহা দৃশ্যকাব্যের অন্তর্গত একটি প্রকরণ; ইহার অপর নাম 'শারদ্বতীপুত্র-প্রকরণ'। মধ্য এশিয়ায় তালপত্রে লিখিত ইহার অংশমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নকে বুদ্ধকর্তৃক স্বীয় মতে দীক্ষিত করার কাহিনী ইহার বিষয়বস্তু।

অশ্বঘোষের 'শারিপুত্রপ্রকরণ'

আবিষ্কৃত অংশটুকু হইতে অশ্বঘোষের নাট্য-রচনাকৌশল সম্বন্ধে যেটুকু ধারণা হয়, তাহাতে এটুকু বুঝা যায় যে, তাঁহার সময়ে নাট্যসাহিত্য মাত্র রচিত হইতে আরম্ভ হয় নাই, এই সাহিত্য কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা লাভও করিয়াছে। অশ্বঘোষের এই খণ্ডিত গ্রন্থ হইতে মনে হয়, তাঁহার রচনার গতি স্বচ্ছন্দ এবং কাব্য সরস। পদ্যকাব্যের প্রসঙ্গে অশ্বঘোষের জীবন-কাল আলোচিত হইয়াছে।

সাহিত্যিক বিচার

অশ্বঘোষের জীবনকাল

এই যুগে মাত্র অপর একজন নাট্যকারের গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার নাম ভাস।

ভাস

ভাসের রচিত বলিয়া অনুমিত তেরটি নাট্যগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থগুলিকে বিষয়বস্তু অনুসারে নিম্নলিখিতরূপে ভাগ করা যাইতে পারে :—

তেরটি নাট্যগ্রন্থ

(ক) মহাভারত অবলম্বনে রচিত

১। মধ্যমব্যায়োগ,
২। পঞ্চরাত্র,
৩। দূতবাক্য,
৪। দূতঘটোৎকচ
৫। কর্ণভার,
৬। ঊরুভঙ্গ,
৭। বালচরিত (হরিবংশ অবলম্বনে)।

(খ) রামায়ণ অবলম্বনে রচিত

১। প্রতিমা,

২। অভিষেক।

(গ) উদয়নের কাহিনী অবলম্বনে

১। স্বপ্নবাসবদত্ত',

২। প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ।

(ঘ) অজ্ঞাতমূল

১ অবিমারক,

২ চারুদত্ত।

এই গ্রন্থগুলির মধ্যে 'স্বপ্নবাসবদত্তা'ই সমধিক প্রসিদ্ধ। ভাসের পদ্য ও গদ্য উভয়বিধ রচনাই প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায়, চরিত্রের বিশ্লেষণে এবং ঘটনার বিন্যাসে তিনি সিদ্ধহস্ত।

সাহিত্যিক বিচার

'স্বপ্নবাসবদত্তা' নাটকে বাসবদত্তাসক্ত উদয়নের সহিত পদ্মাবতীর পরিণয় সাধনের জন্য যে বিচিত্র ঘটনাপরম্পরা বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহা ভাসের নাট্যরচনাকৌশলের পরিচায়ক। পদ্মাবতীকে সপত্নী জানিয়াও বাসবদত্তার যে ধৈর্য, বাসবদত্তার স্বরূপ জানিয়াও নবোঢা রাজপুত্রী পদ্মাবতীর যে সংযম, প্রভুর মঙ্গলের নিমিত্ত মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের যে স্থির-প্রতিজ্ঞতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম, রূপবতী গুণবতী পদ্মাবতীকে পত্নীরূপে পাইয়াও বাসবদত্তার প্রতি রাজার যে অচল প্রেম—এই সমস্তই ভাসের চরিত্রচিত্রণ-কৌশলের প্রমাণ।

ভাসকে কেন্দ্র করিয়া একটি বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সমস্যা সমাধান করিতে যাইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে যে বাদবিতণ্ডার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার মীমাংসা আজ পর্যন্তও হয় নাই, কোন কালে হইবে কিনা সন্দেহ।

ভাস-সমস্যা (Bhasa-problem)

বর্তমান গ্রন্থের স্বল্প পরিসরে ভাস-সমস্যার বিশদ আলোচনা অসম্ভব। সুতরাং, এই সমস্যা সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি কথা বলা যাইতেছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্যন্ত ভাসকে আমরা নামে মাত্রই জানিতাম; কিন্তু তাঁহার কোন গ্রন্থের সহিত আমাদের কোন পরিচয় ঘটে নাই। ১৯১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে গণপতি শাস্ত্রী নামক একজন পণ্ডিত দাক্ষিণ ভারতের ত্রিবান্দ্রম্ (Trivandrum) নামক স্থানে এক গোছা প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করিলেন। ইহাতে ছিল তেরটি নাট্যগ্রন্থ, এইগুলিই তাঁহার মতে মহাকবি ভাসের বিস্মৃত নাট্যগ্রন্থ। এইগুলিকে ভাসের নাটক বলিয়া মনে করিবার কতকগুলি যুক্তিও তিনি দিলেন। তন্মধ্যে প্রধান যুক্তি এই যে, প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কারণহেতু সবগুলি গ্রন্থই একজনের রচিত বলিয়া মনে হয়—

ভাসের নামের সহিত যুক্ত গ্রন্থগুলি এক ব্যক্তির রচনা—এই সম্বন্ধে যুক্তি

(১) শকুন্তলা প্রভৃতি নাটকের ন্যায়, এই গ্রন্থগুলি নান্দীশ্লোকে আরম্ভ হয় নাই; ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম রহিয়াছে এই নির্দেশ—"নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ";

(২) পরবর্তী যুগের নাটকগুলিতে যাহাকে 'প্রস্তাবনা' নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে এই গ্রন্থসমূহে বলা হইয়াছে 'স্থাপনা';

(৩) অধিকাংশ নাটকগুলির ভরতবাক্য, অল্পবিস্তর ভেদসত্ত্বেও, অনেকটা একপ্রকার;

(৪) অনেকগুলি নাটকের মধ্যে একজাতীয় অপাণিনীয় প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়;

(৫) ভাষা, ভাব, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকাশভঙ্গী পর্যন্তও অনেকগুলি নাটকে একই প্রকার।

উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, এই নাটকগুলি এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া মনে হয়। পুনরায় কতক যুক্তির অবতারণা করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন যে, ঐ ব্যক্তি ভাস ভিন্ন অপর কেহ নহেন। এই সম্বন্ধে দুইটি প্রধান যুক্তি নিম্নলিখিতরূপ :—

ঐ ব্যক্তি ভাস—যুক্তি

১। 'স্বপ্নবাসবদত্তা' নাটকটি ভাস-রচিত—সুদীর্ঘকাল হইতে এই প্রসিদ্ধি প্রচলিত। ইহার একজন প্রধান সাক্ষী রাজশেখর। তিনি বলিয়াছেন—

ভাসনাটকচক্রেঽপি ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্।
স্বপ্নবাসবদত্তস্য দাহকোঽভূন্ন পাবকঃ॥

শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত নাটক-চক্রের মধ্যে 'স্বপ্নবাসবদত্তা' নামে একটি নাটক আছে। সুতরাং, ইহা মনে করা অযৌক্তিক নয় যে, সমলক্ষণবিশিষ্ট অপরাপর নাটকগুলিও সেই ভাসেরই রচিত।

২। হর্ষচরিতে[১] বাণভট্ট ভাসের নাটকের এইরূপ প্রশংসা করিয়াছেন :—

সূত্রধারকৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈঃ।
সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব[২]॥

বাণের মতে ভাসের নাটকের যে সকল বিশিষ্ট লক্ষণ, ঐগুলি উক্ত সব নাটকেই আছে।

শাস্ত্রী মহাশয়ের এত পরিশ্রম করিতে হইল শুধু এই কারণে যে, উক্ত আবিষ্কৃত পুঁথিগুলির কোনটিতেই নাট্যকারের নাম নাই। সুতরাং, তাঁহার যুক্তিগুলি সকলে মানিলেন না। তাঁহারা বহু বিরুদ্ধযুক্তিরও অবতারণা করিলেন। বিরুদ্ধযুক্তিগুলির মধ্যে প্রধান একটি যুক্তি এই যে, এ পর্যন্ত কোষকাব্যগুলিতে ভাসের যতগুলি শ্লোক পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনটিই উক্ত তথাকথিত ভাসনাটকসমূহে নাই। অন্যান্য নাট্যগ্রন্থের সহিত তুলনায় এই নাটকগুলির রচনাতে যে কতগুলি বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে সেরূপ বৈশিষ্ট্য কতক নাটকের দক্ষিণ ভারতীয় পুঁথিসমূহে বিদ্যমান। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, এখন পর্যন্তও ভাস-সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হয় নাই।

বিরুদ্ধ যুক্তি

১ প্রারম্ভিক শ্লোক ১৫।
২ সূত্রধারকর্তৃক আরব্ধ, বহুভূমিকাবিশিষ্ট, পতাকাস্থানযুক্ত ও দেবমন্দিরসদৃশ নাটকসমূহের দ্বারা ভাস যশ লাভ করিয়াছিলেন।
[মন্দির পক্ষে—সূত্রধার=স্থপতি, ভূমিকা=তল, পতাকা=নিশান।]

উক্ত নাটকগুলিকে যাঁহারা ভাসের বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান শাস্ত্রী মহাশয়, পারঞ্জপে, কীথ্ (Keith) ও টমাস্ (Thomas)। বিরুদ্ধবাদিগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় কানে, র‍্যাড্ডি, বার্ণেট (Barnett) ও পিসারোতি। সুকৃঠঙ্কর (Sukthankar) ও ভিন্টারনিৎস্ মধ্যপথাবলম্বী; তাঁহারা মনে করেন যে, এই পর্যন্ত যে প্রমাণসকল পাওয়া গিয়াছে তাহা দ্বারা ভাসের পক্ষে বা বিপক্ষে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

শাস্ত্রীমহাশয়ের সমর্থক—পারঞ্জপে, কীথ্, টমাস। বিরুদ্ধমতাবলম্বী—কানে, র‍্যাড্ডি, বার্ণেট ও পিসারোতি। মধ্যপথাবলম্বী—সুকৃঠঙ্কর ও ভিন্টারনিৎস্

ভাসের কাল সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত এখনও হয় নাই। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক পর্যন্ত নানা কালই ভাসের কাল বলিয়া বিভিন্ন পণ্ডিতগণ নানাপ্রকার যুক্তিবলে নির্দেশ করিয়া থাকেন।

ভাসের জীবনকাল

কালিদাস-যুগ

যদিও এই যুগে আমরা একমাত্র কালিদাসেরই আলোচনা করিব, তথাপি 'যুগ' শব্দটি এখানে অপ্রযোজ্য নহে। ইহার কারণ এই যে, সংস্কৃত নাট্যকারগণের মধ্যে কালিদাস যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন তাহার দাবীতেই তাঁহার কালকে 'যুগ' বলা যাইতে পারে।

কালিদাসের তিনটি নাটক আছে—(১) অভিজ্ঞানশকুন্তল, (২) বিক্রমোর্বশীয় ও (৩) মালবিকাগ্নিমিত্র।

এই নাটকগুলির মধ্যে প্রথমটি বিশ্ববিখ্যাত। ইহা সপ্তাঙ্ক নাটক। ইহার বিষয়বস্তু সুবিদিত। বর্তমানে ইহা চারিটি রূপে পাওয়া যাইতেছে—(১) দেবনাগরী, (২) বঙ্গদেশীয়, (৩) কাশ্মীরী ও (৪) দক্ষিণভারতীয়।

অভিজ্ঞানশাকুন্তল

'বিক্রমোর্বশীয়' পাঁচ অঙ্কে সম্পূর্ণ। এই নাটকের নায়ক পুরুরবা অসুর কর্তৃক লাঞ্ছিতা অপ্সরা উর্বশীকে উদ্ধার করিতে গিয়া তাঁহার সহিত প্রেমপাশে আবদ্ধ হইলেন। কিছুক্ষণ পরস্পর প্রেমালাপের পর, স্বর্গে ভারতরচিত

নাটকে অংশগ্রহণ করিবার জন্য উর্বশীকে যাইতে হইল। পুরূরবার মহিষী এই প্রণয়কাহিনী শুনিয়া অভিমানিনী। এদিকে ইন্দ্রের অনুগ্রহে রাজার সঙ্গে মর্ত্যে বাস করিবার অনুমতি উর্বশী পাইলেন, কিন্তু রাজার পুত্রমুখদর্শন হইলেই উর্বশীকে স্বর্গে ফিরিয়া আসিতে হইবে, এই নির্দেশ। রাজার অনুনয়ে মহিষী স্থির হইলেন, এবং উর্বশীর সহিত রাজার বাসে সম্মতি জানাইলেন। অপ্সরার সহিত রাজা সুখে মিলিত হইলে একদিন রাজার প্রতি রোষবশতঃ উর্বশী স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষিদ্ধ এক কুঞ্জে প্রবেশ করিবার ফলে সেখানে একটি লতায় পরিণতা হইলেন। উর্বশীর অদর্শনে বিরহকাতর রাজা কোকিল, ভ্রমর, হরিণ প্রভৃতির নিকট তাঁহার সন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, হয়ত উর্বশী নদীতে রূপান্তরিতা হইয়া গিয়াছেন শোকোন্মত্ত রাজা দৈববাণী হইতে একটি 'সংগমনীয় মণির'[১] কথা জানিতে পারিলেন। উহা লইয়া তিনি একটি লতাকে আলিঙ্গন করিবামাত্র লতাটি উর্বশীর রূপ ধারণ করিল। রাজা ও অপ্সরা পুনরায় সুখে কালযাপন করিতে থাকিলে একদিন একটি শকুন বাণাহত হইয়া পড়িয়া যায়, সেই বাণে লিখিত ছিল 'উর্বশী ও পুরূরবার পুত্র আয়ুর বাণ'। এই পুত্র ছিল রাজার নিকট অজ্ঞাত। ইত্যবসরে, পক্ষীকে হত্যা করিয়া তপোবনের নিয়মভঙ্গ করিবার অভিযোগে আয়ুকে নিজ মাতার নিকট প্রত্যর্পণ করিতে একটি নারী আসেন। উর্বশী ঐ বালকের মাতৃত্ব স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু ভাবী বিরহের বেদনায় কাতর হইয়া পড়িলেন, রাজার পুত্রমুখ দর্শন হইল, সুতরাং উর্বশীকে স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। এমন সময় নারদ উপস্থিত হইয়া শুভ সংবাদ জানাইলেন যে, স্বর্গে দেবাসুরের তুমুল সংগ্রাম বাধিয়াছে—ইহাতে পুরূরবার সাহায্যের প্রয়োজন হইবে এবং পুরস্কার স্বরূপ তিনি জীবনব্যাপী উর্বশীর সঙ্গসুখ লাভ করিতে পারিবেন।

বিক্রমোর্বশীয়

ইহার দুইটি রূপ

নাটকটি উত্তরভারতীয় ও দক্ষিণ-ভারতীয় এই দুইটি রূপে বর্তমানে পাওয়া যায়।

১। 'সংগমনীয়' অর্থাৎ যে মিলন ঘটায়।

ইহার বিষয়বস্তু অতি প্রাচীন আখ্যান; ঋগ্বেদেই পুরূরবা ও উর্বশীর কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু, আখ্যানের আদিম রূপটিকে কালিদাস ঢালিয়া সাজাইয়াছেন। মূলের বিয়োগান্তক ঘটনাটিকে তিনি মিলনে পর্যবসিত করিয়াছেন। উর্বশীর প্রতি ইন্দ্রের অনুগ্রহ এবং 'সংগমনীয় মণির' অবতারণা প্রভৃতি নাট্যকারের সৃষ্টি। নূতন সৃষ্টিতে কালিদাসের কল্পনাকৌতুকী মনের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এই সমস্ত কৃত্রিম ব্যাপারগুলিদ্বারা ঘটনার স্বাভাবিক পরিণতি ব্যাহত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। মূল আখ্যানে এইরূপ পরিবর্তনের জন্য কালিদাস অপেক্ষা তাঁহার যুগের রুচি ও নাট্যশাস্ত্রের অনুশাসনই সম্ভবতঃ অধিকতর দায়ী। যাহাই হউক, কালিদাসের আখ্যানভাগকে যদি মূলের সঙ্গে তুলনা না করিয়া উহার নিজস্ব রূপেই বিচার করা যায়, তাহা হইলে নাট্যকারের চরিত্র-চিত্রণের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কালিদাসের উর্বশী অনুরক্ত ব্যক্তির আসক্তি নিয়া শুধু কৌতুক করেন না, স্ত্রীসুলভ হৃদয়ও তাঁহার আছে। স্বর্গের অপ্সরা হইলেও মর্ত্যের প্রেম তাঁহার নিকট উপেক্ষণীয় নহে। পুরূরবা যে কামুক নহেন, প্রকৃত প্রেমিক, তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় চতুর্থ অঙ্কে যেখানে উর্বশীর বিরহে রাজা শোকে অধীর এবং উন্মত্ত। এখানে যদিও অঙ্কটিকে অতিনাটকীয় এবং রাজাকে একটু বেশী sentimental বা ভাবপ্রবণ মনে হয়, তথাপি তিনি যে সাধারণ রাজাদের ন্যায় পুষ্পে পুষ্পে মধু আহরণ করিয়া বেড়ান না, ইহা নিশ্চিত। অজ্ঞাত পুত্রের পরিচয় ও পুত্রলাভে পরিণয়ের চরম সার্থকতা—এই দুইটি কালিদাসীয় বৈশিষ্ট্য; অন্যত্র অনুরূপ অবস্থার বর্ণনা থাকিলেও বর্তমান নাটকে ইহারা উপভোগ্যই হইয়াছে।

সাহিত্যিক বিচার

'মালবিকাগ্নিমিত্র' পঞ্চাঙ্ক নাটক।

বিদর্ভরাজকুমারী মালবিকা নানা ঘটনাপরম্পরাক্রমে প্রচ্ছন্নরূপে রাজা অগ্নিমিত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পূর্বেই রাজা তাঁহার প্রতিকৃতি দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং মালবিকার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছিল। উদ্যানে মালবিকাকে চাক্ষুষ দেখিয়া এবং নিজের প্রতি তাঁহার অনুরাগ

মালবিকাগ্নিমিত্রম্

আছে জানিতে পারিয়া, রাজা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কনিষ্ঠা মহিষী ইরাবতী দূর হইতে এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত রুষ্টা হইলেন এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া রাজাকে অপমানিত করিলেন। জ্যেষ্ঠা মহিষী ধারিণী অনর্থ নিবারণের উদ্দেশ্যে মালবিকাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। বিদূষকের কৌশলে মালবিকার সহিত রাজার পুনরায় মিলন ঘটে, কিন্তু এবারও ইরাবতীর জন্য এই মিলন ব্যর্থ হইয়া যায়। পরিশেষে, প্রতিদ্বন্দ্বী বিদর্ভরাজের পরাজয়ের সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে বিদর্ভ হইতে আগত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে মালবিকার পরিচয় পাওয়া গেল। এদিকে, ধারিণীর পুত্র বসুমিত্র কর্তৃক যবনগণের পরাজয়ের সংবাদে ধারিণী পুলকিতা। পূর্বেই ধারিণীর নিকট মালবিকার পুরস্কার প্রাপ্য ছিল। সম্প্রতি স্বীয় পুত্রের বিজয়-সংবাদে হৃষ্টচিত্তা ধারিণী মালবিকার সহিত অগ্নিমিত্রের পরিণয় অনুমোদন করিলেন, ইরাবতীর ক্রোধও প্রশমিত হইল। এইভাবে আনন্দময় ব্যাপারে নাটকীয় বৃত্তান্তের পরিণতি ঘটিল।

সাহিত্যিক বিচার

এই নাটকটিকে কোন কোন সমালোচক কালিদাসের অপরিণত বয়সের রচনা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এই মতের একটি যুক্তি এই যে, ভাস প্রভৃতি প্রাচীন নাট্যকারগণের নাটক থাকা সত্ত্বেও কবি ইহাতে নিজের রচিত নূতন গ্রন্থ পাঠের জন্য পাঠকসমাজকে অনুরোধ জানাইয়াছেন।[১] তাহা ছাড়াও, কালিদাসের অপর দুইটি নাটকের তুলনায় ইহার বস্তুগত বৈশিষ্ট্য আছে। হীনকুলসম্ভূতা কন্যার প্রতি রাজার প্রেম, নানা অবস্থা বিপর্যয়ে রাজার উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে ব্যাঘাত, পরিশেষে ঐ কন্যার রাজপুত্রী বলিয়া পরিচয় এবং রাজার সহিত মিলন—এবম্বিধ বস্তু সংস্কৃত অনেক নাট্যগ্রন্থেই পাওয়া যায়; সুতরাং এইরূপ বস্তু নির্বাচনের জন্য কালিদাসের প্রাথমিক প্রয়াসই দায়ী—এমন কথা কেহ কেহ বলিয়া

১। পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ ভজন্তে
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ॥ (মালবিকাগ্নিমিত্র—প্রস্তাবনা)

থাকেন। কিন্তু, এই বিষয়ে কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ নাই। এই নাটকটিতেও কালিদাসের কালিদাসত্ব ভাষায় এবং ভাবে নানা স্থানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অগ্নিমিত্র বা মালবিকা হয়ত নায়ক বা নায়িকা হিসাবে উচ্চস্তরের নহেন, তথাপি কালিদাস নাট্যবস্তুর উপযোগী করিয়াই তাঁহাদের চরিত্র-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। যে যুগে কালিদাস এই নাটক রচনা করিয়াছিলেন, সেই সময়ের যে সমাজচিত্রের প্রতিফলন আমরা সমসাময়িক সাহিত্যে দেখিতে পাই তাহাতে জীবনের গতি ছিল সহজ স্বচ্ছন্দ, নাগরিকগণের কোন গভীর চিন্তার প্রয়োজন হয়ত ছিল না; তখন সম্ভবতঃ এইরূপ নাটকের সমাদর সমাজে ছিল বলিয়াই কালিদাস 'মালবিকাগ্নিমিত্র' রচনা করিয়াছিলেন, নিজের ভাবের বা রচনাশক্তির দৈন্যবশতঃ নহে।

কালিদাসের তিনটি নাটকেই তাঁহার কল্পনাশক্তি, নাট্যরচনাকৌশল, অলঙ্কার ও ছন্দশাস্ত্রে অধিকার, মার্জিত ভাষা ও রুচি প্রভৃতি পরিস্ফুট হইয়াছে। মানব-চরিত্রের বিশ্লেষণ ও প্রকৃতির অভূতপূর্ব বর্ণনায় কালিদাস অদ্বিতীয়। তাঁহার নাটকগুলির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ঐগুলি পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করা পর্যন্ত পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত হয় না। ঘটনার বাহুল্য বা কবির স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের প্রয়াস কোন নাটকেই দেখা যায় না। করুণরসের চিত্র কালিদাসের রচনায় যেন পাঠকের নিকট উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার দৃশ্যটি কি করুণ! "শকুন্তলা আজ পতিগৃহে যাইবে, এই কথা ভাবিয়া আমার হৃদয় আকুল, রুদ্ধবাষ্পে কণ্ঠরোধ হইতেছে, চিন্তাক্লিষ্ট চোখে যেন কিছুই দেখিতে পাইতেছি না"—কণ্বমুনির এই একটি মাত্র উক্তিতে যেন বিশ্বের পিতৃস্নেহ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত আশ্রমপ্রকৃতি যেন শকুন্তলার আসন্ন বিরহে মূহ্যমান! হরিণশিশুটিও শকুন্তলার পথ ছাড়িতেছে না। 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' এত সুন্দর এবং তাহার এই দৃশ্যটি এত মনোজ্ঞ বলিয়াই ভারতীয় সমালোচক বলিয়াছেন—

কাব্যেষু নাটকং রম্যং তত্র রম্যা শকুন্তলা।
তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কো যত্র যাতি শকুন্তলা॥

এই নাটকের খ্যাতি বহুকাল পূর্বেই ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া দেশ দেশান্তরে প্রসারিত হইয়াছিল। জার্মান মনীষী গ্যেটে (Goethe)

এই নাটক পাঠে মুগ্ধ হইয়া ইহার যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহার প্রধান কথা এই যে, ইহাতে স্বর্গের সহিত মর্ত্যের মিলন সাধিত হইয়াছে। আশ্রমলালিতা রূপযৌবনসম্পন্না শকুন্তলার প্রতি রাজা দুষ্মন্তের যে উদ্দাম প্রেম এবং রাজার প্রতি শকুন্তলার যে অনিবার্য আসক্তি সামাজিক বিধিনিষেধকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছিল, তাহার জন্য উভয়েই কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। তাহার পর উভয়ের যে মিলন হইল তাহা অত্যন্ত সুখময়; তাহাতে যৌবনের উন্মাদনা নাই, আছে বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম। উদ্দাম মর্ত্য প্রেমের মহৎ স্বর্গীয় প্রেমে পরিণতি—ইহাই ত নাটকটির মুখ্য প্রতিপাদ্য; তাই গ্যেটের উক্তি সার্থক।

'অভিজ্ঞানশকুন্তল' হইতে কয়েকটি শ্লোক, কালিদাসের রচনার নিদর্শন স্বরূপ, নিম্নে উদ্ধৃত হইল

শিশুর মনোজ্ঞ বর্ণন -

আলক্ষ্যদন্তমুকুলাননিমিত্তহাসৈ-
রব্যক্তবর্ণরমণীয়বচঃপ্রবৃত্তান্।
অঙ্কাশ্রয়প্রণয়িনস্তনয়ান্ বহন্তো
ধন্যাস্তদঙ্গরজসা মলিনীভবন্তি॥ (৭ ১৭)

[যাহাদের দন্ত ঈষৎ উদ্গত হইয়াছে, যাহারা অকারণে হাসে, যাহাদের অস্ফুট অক্ষরযুক্ত কথা হৃদয়গ্রাহী এবং ক্রোড়দেশে আশ্রয় যাহাদের নিকট প্রিয় সেই শিশুপুত্রগণের অঙ্গধূলিতে যাহারা ধূসরিত হন, তাঁহারা ধন্য।]

চিত্রে অঙ্কনীয় বিষয়ের অপূর্ব বর্ণনা—

কার্যা সৈকতলীনহংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী
পাদাস্তামভিতো নিষণ্ণহরিণা গৌরীগুরোঃ পাবনাঃ।
শাখালম্বিতবল্কলস্য চ তরোর্নির্মাতুমিচ্ছাম্যধঃ
শৃঙ্গে কৃষ্ণমৃগস্য বামনয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীম্॥ (৬।১৭)

[চিত্রে এইরূপ অঙ্কন হইবে—
মালিনীনদীর সৈকতে হংসমিথুন লুক্কায়িত, নদী অভিমুখে হিমালয়ের পবিত্র

পাদদেশে কুরঙ্গকুল উপবিষ্ট, বৃক্ষশাখা হইতে বল্কল লম্বমান, তাহার নীচে মৃগী কৃষ্ণসারের শৃঙ্গে স্বীয় বামনয়ন কণ্ডূয়ন করিতেছে।]

কালিদাস কর্তৃক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥ (৫।২)

[রমণীয় বস্তুদর্শনে এবং মধুরধ্বনি শ্রবণে সুখী লোকও যে উৎকণ্ঠাকুল হইয়া পড়ে, তাহার কারণ এই যে, অজ্ঞাতসারে জন্মান্তরের সুখস্মৃতি তাহার চেতনমনে আবির্ভূত হয়, এই সকল স্মৃতি বাসনাকারে মনের গভীরে অবস্থান করে।]

কালিদাসের জীবনী ও কাল

কালিদাসের জীবনী ও জীবনকাল সম্বন্ধে পদ্যকাব্যের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে।

কালিদাসোত্তর যুগ

পদ্যকাব্যের ক্ষেত্রে কালিদাসোত্তর যুগে কবিপ্রতিভার যেরূপ ক্ষীয়মাণতা লক্ষিত হয়, নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে ঠিক সেরূপ ঘটে নাই। এই যুগের নাট্যপ্রতিভা ম্লান হইতে আরম্ভ করিয়াছিল বহু পরবর্তী কালে। কালিদাসের পরেও উৎকৃষ্ট নাট্যসাহিত্য রচিত হইয়াছিল; কিন্তু, দুঃখের বিষয়, এই যুগের অল্পসংখ্যক নাট্যগ্রন্থই বর্তমানে পাওয়া যায়। বর্তমান প্রসঙ্গে এই যুগের নাট্যসাহিত্যের আলোচনা করা যাইতেছে।

শূদ্রক

শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক

ইঁহার রচিত 'মৃচ্ছকটিক' দশাঙ্ক প্রকরণ। ইহার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ :—

চারুদত্ত উজ্জয়িনীর বিত্তশালী একজন নাগরিক। দানদাতব্য প্রভৃতি নানা সৎকার্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি দারিদ্র্যদশায় উপনীত হইয়াছেন। রাজা পালকের চরিত্রহীন শ্যালক শকার (সংস্থানক) বসন্তসেনা নাম্নী এক গণিকাকে প্রণয় জানিবার জন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করেন। অনন্যোপায়

হইয়া বসন্তসেনা চারুদত্তের গৃহে প্রবেশ করেন। চারুদত্তের গুণাবলীর কথা শুনিয়া বসন্তসেনা পূর্বেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং দরিদ্র হইলেও তাঁহার প্রতি বসন্তসেনার গভীর অনুরাগ জন্মিয়াছিল। বসন্তসেনা নিজের অলঙ্কারগুলি চারুদত্তের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া চলিয়া গেলেন।

শর্বিলক নামে এক ব্রাহ্মণ বসন্তসেনার পরিচারিকা মদনিকার সহিত প্রেমপাশে আবদ্ধ হইলেন। তিনি দরিদ্র বলিয়া মদনিকার পাণিগ্রহণকল্পে চারুদত্তের গৃহ হইতে ঐ স্বর্ণালঙ্কারাদি অপহরণ করিয়া আনিলেন। চারুদত্তের পত্নী ধূতা ঐ অলঙ্কারের পরিবর্তে বসন্তসেনার জন্য নিজের গলার হারটি চারুদত্তকে দিলে চারুদত্ত উহা বসন্তসেনার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

মদনিকার কথানুসারে শর্বিলক অপহৃত অলঙ্কারগুলি বসন্তসেনাকে দিলেন। ওদিকে চারুদত্ত কর্তৃক ঐ হারটি বসন্তসেনার নিকট প্রেরিত হইলে সন্ধ্যাবেলা বসন্তসেনা তুমুল ঝড়ের মধ্যে চারুদত্তের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং 'অপহৃত' অলঙ্কারগুলি চারুদত্তকে দিলেন এবং চারুদত্ত কর্তৃক হার প্রেরণের রহস্যটি উদঘাটন করিয়া দিলেন। এইরূপে চারুদত্ত ও বসন্তসেনার প্রেম নিবিড়তর হইল। বসন্তসেনা সেই রাত্রিতে চারুদত্তের গৃহেই রহিলেন। পরদিন প্রত্যূষে গাড়ীতে বসন্তসেনাকে উদ্যানে লইয়া যাইবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ দিয়া চারুদত্ত বাহিরে গেলেন। গাড়ী প্রস্তুত হইলে চারুদত্তের পুত্র রোহসেন সোনার গাড়ী না পাইয়া মাটির গাড়ী (মৃৎ+শকটিকম্=মৃচ্ছকটিকম্) পাইয়াছে বলিয়া কাঁদিতে থাকে। বসন্তসেনা সোনার শকট নির্মাণ করাইবার জন্য তাহাকে নিজের অলঙ্কারগুলি দিলেন। এই সময়ে তিনি বাহিরে যাইবার জন্য সজ্জিত হইয়া আসিলে একটি গাড়ী দেখিয়া ভ্রমে উহাতে আরোহণ করিলেন। এই গাড়ী শকারের এবং ইহা উদ্যানাভিমুখে চলিতেছিল।

এদিকে আর্যক নামে এক ব্যক্তি কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হওয়ার ভয়ে রাজা তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। ঠিক ঐ সময়ে আর্যক কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া বসন্তসেনার জন্য রক্ষিত চারুদত্তের গাড়ীতে আরোহণ করেন। সেই গাড়ীর চালক আরোহীকে বসন্তসেনা মনে করিয়া উক্ত

উদ্যানে লইয়া যায়। উদ্যানে চারুদত্ত বসন্তসেনার প্রতীক্ষায় ছিলেন। কিন্তু গাড়ীতে আর্যককে দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহার পলায়নের সুযোগ করিয়া দিলেন। রাজার শত্রুকে সহায়তা করিয়া চারুদত্ত ভয়ে সেই স্থান ত্যাগ করিলেন।

উদ্যানে শকার নিজের গাড়ীর প্রতীক্ষায় থাকিয়া দেখিলেন সেই গাড়ী হইতে বসন্তসেনা অবতরণ করিতেছেন। তখন তিনি বসন্তসেনাকে স্ববশে আনিবার জন্য পুনরায় চেষ্টা করিলেন। বসন্তসেনা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে তিনি তাঁহাকে কণ্ঠরোধ করিয়া হত্যা করার চেষ্টা করিলেন। বসন্তসেনা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। শকার বসন্তসেনাকে নিহত মনে করিয়া এবং তাঁহার মৃত্যুর জন্য চারুদত্তকে দায়ী করিবার অভিসন্ধি লইয়া চলিয়া গেলেন। ইহার পরে এক ভিক্ষু সেস্থানে আসিয়া বসন্তসেনাকে দেখিলেন এবং তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন।

বিচারালয়ে নানা ঘটনা-বিপর্যয়ের জন্য শকারের অভিযোগই সত্য বলিয়া বিবেচিত হইল এবং চারুদত্তের মৃত্যুদণ্ড হইল। বধ্যভূমিতে চারুদত্ত উপস্থিত। ঠিক এই সময়ে, উক্ত ভিক্ষু বসন্তসেনাকে লইয়া সেখানে আসিলেন। চারুদত্তের প্রতি অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল। অপর দিকে আর্যক পালককে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বিপদকালের সহায় চারুদত্তকে একটি রাজ্য দান করিলেন। বসন্তসেনা চারুদত্তের বধূপদ লাভ করিলেন।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে 'মৃচ্ছকটিক' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বিষয়বস্তুর নূতনত্ব ইহার একটি প্রধান কারণ। রাজার জীবন ও রাজসভার গণ্ডীর বাহিরে আসা সংস্কৃত নাট্যকারের পক্ষে অভিনব প্রচেষ্টা।

সাহিত্যিক বিচার

চারুদত্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তাঁহার প্রতি বিত্তশালিনী বারাঙ্গনা বসন্তসেনার অকৃত্রিম অনুরাগ—এই প্রণয়-কাহিনীর সহিত রাজনৈতিক ঘটনার এমন সংমিশ্রণ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে অদ্বিতীয়। যে সামাজিক চিত্রটি এই গ্রন্থে পরিস্ফুট, তাহা তৎকালীন বৃহত্তর সমাজের বাস্তব রূপ। চরিত্র-বিশ্লেষণে শূদ্রকের ক্ষমতা অসীম। এতগুলি চরিত্রের মধ্যে

প্রত্যেকটিরই একটি স্বতন্ত্র রূপ আছে। আকারে বৃহৎ হইলেও গ্রন্থের কোথাও পাঠকের বিরক্তি জন্মে না; বহু ঘটনার সমাবেশ হইলেও ঘটনা-বিন্যাস স্বচ্ছ এবং পরিণতি স্বাভাবিক। শূদ্রকের ভাষা সাবলীল, ছন্দের প্রয়োগ নিপুণ, কিন্তু কোথাও কবি স্বীয় রচনাকৌশলের পরিচয় দিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কোন কোন আধুনিক সমালোচক ইহাকে বলিয়াছেন—most Shakespearian of all Sanskrit plays.

ভাসের 'চারুদত্তে'র সহিত সম্বন্ধ

কোন কোন পণ্ডিতের মতে, ইহা ভাসের 'চারুদত্ত' নামক নাটকের বর্ধিত সংস্করণ; আবার কাহারও কাহারও মতে, 'চারুদত্ত'ই ইহার সংক্ষিপ্ত রূপ।

শূদ্রকের কাল

শূদ্রক সম্বন্ধে 'মৃচ্ছকটিকে'র প্রারম্ভে যে বর্ণনা আছে তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি নানাশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন এবং একশত দশবৎসর বয়সে তিনি নিজেকে অগ্নিদগ্ধ করেন। এই রাজা কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা সেই বিষয়ে এখনও কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না; সুতরাং শূদ্রকের কাল অজ্ঞাত। শূদ্রক নামক কোন ব্যক্তি আদৌ এই গ্রন্থের রচয়িতা কিনা, এই বিষয়েও অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন; কেহ কেহ মনে করেন, ইহা ভাসেরই রচনা, আবার কাহারও কাহারও মতে, ইহা প্রকৃতপক্ষে শূদ্রক নামে কোন রাজার সভাপণ্ডিতের রচনা; রচয়িতা নিজের নামের পরিবর্তে স্বীয় পৃষ্ঠপোষকের নামের সহিত গ্রন্থটি যুক্ত করিয়াছেন।

খ্রীঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত নানা কালই ইহার রচনাকাল বলিয়া বিভিন্ন পণ্ডিতগণ মনে করেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আলঙ্কারিক বামন শূদ্রকের উল্লেখ করিয়াছেন, কালিদাসের গ্রন্থে প্রসিদ্ধ নাট্যকারগণের নামের সঙ্গে শূদ্রকের উল্লেখ নাই—এই সমস্ত কারণে শূদ্রককে কালিদাসোত্তর যুগের নাট্যকার বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহার সমর্থনে কোন অবিসংবাদিত প্রমাণ নাই।

চতুর্ভাণী

ইহাদের রচয়িতৃগণের নাম তেমন প্রসিদ্ধ নহে, 'চতুর্ভাণী' নামেই ইহারা অধিকতর পরিচিত। ইহাদের নাম—(১) উভয়াভিসারিকা, (২) পদ্মপ্রাভৃতক, (৩) ধূর্তবিটসংবাদ ও (৪) পাদ-তাড়িতক। ইহাদের রচয়িতা যথাক্রমে বররুচি, শূদ্রক, ঈশ্বরদত্ত এবং শ্যামলিক।

(১) উভয়াভিসারিকা
(২) পদ্মপ্রাভৃতক
(৩) ধূর্তবিটসংবাদ
(৪) পাদ-তাড়িতক

ইহাদের বিষয়বস্তু অনেক পরিমাণে 'মৃচ্ছকটিকে'র অনুরূপ ; বাস্তবজীবনে ধূর্ত, বিট প্রভৃতির চরিত্র লইয়াই ইহাদের রচনা। প্রত্যেকটিই একাঙ্ক ভাণ-জাতীয় দৃশ্যকাব্য ; প্রতি গ্রন্থেই একজনের উক্তি। ইহাদের সাহিত্যিক আকর্ষণ ও মূল্য নগণ্য, তবে সমাজের বাস্তব রূপের প্রতিচ্ছবি হিসাবে এই ভাণগুলি উপেক্ষণীয় নহে।

স্বরূপ ও সাহিত্যিক মূল্য

এই ভাণগুলি সম্ভবতঃ ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' এবং ধনঞ্জয়ের 'দশরূপকে'র রচনাকালের মাঝামাঝি কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল। অর্থাৎ, খ্রীষ্টীয় দশম শতকের শেষ ভাগের পূর্বে ইহাদের রচনা সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন ; কিন্তু, কত পূর্বে, সেই সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয় নাই। টমাসের মতে, গুপ্তরাজত্বকালের শেষভাগে অথবা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ইহাদের রচনা হইয়া থাকা সম্ভব। 'পদ্মপ্রাভৃতক'-রচয়িতা শূদ্রক 'মৃচ্ছকটিক'-রচয়িতা শূদ্রক হইতে অভিন্ন কিনা তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

রচনাকাল

শ্রীহর্ষ

ইঁহার রচিত তিনখানি নাট্যগ্রন্থের নাম—

(১) প্রিয়দর্শিকা, (২) রত্নাবলী ও (৩) নাগানন্দ।

'প্রিয়দর্শিকা' চতুরঙ্ক নাটিকা। ইহার বিষয়বস্তু মোটামুটি এই :—রাজা দৃঢ়বর্মার কন্যা প্রিয়দর্শিকার পাণিগ্রহণ করিতে কলিঙ্গরাজ সমুৎসুক। কিন্তু, ঘটনাপরম্পরাক্রমে প্রিয়দর্শিকা বৎসরাজের নিকট উপস্থাপিতা হইলেন। আরণ্যিকা নাম দিয়া তাঁহাকে

'প্রিয়দর্শিকা'

মহিষী বাসবদত্তার পরিচারিকা নিযুক্ত করা হইল। কালক্রমে বৎসরাজ আরণ্যিকার প্রতি প্রেমাসক্ত হইলেন। একদিন উদ্যানে ভ্রমণকালে তিনি সখীর সহিত আলাপরতা আরণ্যিকার মনোভাব জানিতে পারিলেন যে, তিনিও রাজার প্রেমাতুরা। এমন সময় একটি ভ্রমর আরণ্যিকাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, এবং তিনি সন্ত্রস্ত হইয়া চলিতে চলিতে রাজার বাহুতে আসিয়া পড়েন। বৎসরাজ ও বাসবদত্তার পরিণয় সম্বন্ধে একটি নাটকের অভিনয়ে বৎসরাজ রাজার এবং আরণ্যিকা মহিষীর অংশ গ্রহণ করেন। সেই নাটক অভিনয়মাত্র হইলেও বাসবদত্তা রাজা ও আরণ্যিকার পরস্পরের প্রতি আসক্তির অভিনয় দর্শনে কোপান্বিতা হন। বিদূষকের নিকট হইতে আরণ্যিকার প্রতি রাজার যথার্থ অনুরাগের বিষয় জানিয়া তাঁহার ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তিনি আরণ্যিকাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। পরিশেষে নানা ঘটনাচক্রে বাসবদত্তা জানিতে পারেন যে, আরণ্যিকা তাঁহারই আত্মীয়কন্যা। তৎপর বৎসরাজের সহিত তিনি আরণ্যিকার বিবাহ ঘটাইয়া দেন।

বৎসরাজের এই কাহিনী ভারতবর্ষে পুরাকাল হইতে প্রচলিত। এই কাহিনী 'রত্নাবলী' নাটিকারও উপজীব্য। শেষোক্ত গ্রন্থে বৎসরাজের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের কৌশলে নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এবং বিচিত্র ঘটনাবলীর সাহায্যে রাজার সহিত সিংহলরাজকন্যা রত্নাবলীর পরিণয়-সাধনের বর্ণনা আছে।

সাহিত্যিক বিচার

সুতরাং, উভয় নাটিকারই মুখ্য বিষয়বস্তু একই ধরণের, প্রভেদ শুধু প্রাসঙ্গিক ঘটনার বিন্যাসে। বিষয়বস্তুর পরিকল্পনায় নাট্যকারের মৌলিকতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া না গেলেও, তিনি যেভাবে ঘটনার পারম্পর্য বিন্যাস করিয়া আখ্যানভাগের পরিণতি দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাট্যরচনাকৌশলের প্রকৃষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তা' নাটকে বৎসরাজের যে চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার তুলনায় হর্ষের বৎসরাজচরিত্র হীনতর। ভাসের উদয়নের দাম্পত্যপ্রেম অনেক মহত্তর; পদ্মাবতীকে তিনি বিবাহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু 'দগ্ধীভূতা' প্রিয়াকে এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। ভাসের বাসবদত্তা পতির হিতে আত্মত্যাগের

প্রতিমূর্তি ; আর হর্ষের বাসবদত্তা অন্য নারীর প্রতি পতির আসক্তি হেতু অতিশয় মুহ্যমানা।

'নাগানন্দ' পঞ্চাঙ্ক নাটক। ইহার বিষয়বস্তু এইরূপ :—

নাগানন্দ

জীমূতবাহন বিদ্যাধরগণের যুবরাজ। সিদ্ধগণের রাজকুমারী মলয়বতী ও জীমূতবাহন পরস্পরের প্রতি প্রেমাসক্ত। নানা অবস্থাবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া তাঁহাদের পরিণয় ঘটিল। একদিন গরুড় কর্তৃক নিহত সর্পগণের বৃত্তান্ত জানিয়া জীমূতবাহন নাগকুলের প্রতি গরুড়ের অত্যাচারে সহানুভূতিবশতঃ নিজেকে গরুড়ের নিকট অর্পণ করেন। গরুড় কর্তৃক নিহত জীমূতবাহন গৌরীদেবীর কৃপায় পুনর্জীবিত হইয়া পুনরায় মলয়বতীর সহিত কালযাপন করিতে থাকেন।

এই নাটকে বৌদ্ধ উপাখ্যান হর্ষের উপজীব্য। দুইটি নাটিকার ন্যায় এখানেও তিনি নানা অলৌকিক ঘটনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু,

সাহিত্যিক বিচার

পরহিতে আত্মবলিদানের মহিমা তিনি জীমূতবাহনের চরিত্রে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহার এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। বিদূষক ও বিটের কার্যকলাপে নাট্যকার যথেষ্ট হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। সবগুলি নাট্যগ্রন্থই সুললিত ভাষায় স্বচ্ছন্দ রচনা। তাঁহার প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনাশক্তি প্রশংসনীয়। 'রত্নাবলী'তে (৪।৬) যুদ্ধের বর্ণনায় যেন যুদ্ধের ভীষণ রূপটিই প্রকট হইয়াছে। শব্দের এবং অর্থের অলঙ্কার-প্রয়োগের বাহুল্য হর্ষের গ্রন্থগুলিতে দেখা যায় না। কিন্তু, মাঝে মাঝে বিরাট বিরাট ছন্দের প্রয়োগ অনাটকীয় মনে হয়। এক 'রত্নাবলী'তেই ২৩ বার শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের প্রয়োগ ইহার প্রমাণ।

এই নাট্যগ্রন্থগুলির রচয়িতা শ্রীহর্ষের পরিচয় সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও,

হর্ষের পরিচয় ও কাল

ইনি স্থাণ্বীশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধন—এই মতের সমর্থনে অনেক যুক্তি রহিয়াছে। যদি হর্ষবর্ধনই ইহাদের রচয়িতা হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহাদের রচনাকাল খ্রীঃ সপ্তম শতকের পূর্বার্ধ।

বিশাখদত্ত

ইঁহার রচিত 'মুদ্রারাক্ষস' নামক নাটক সপ্তাঙ্কে রচিত। নানা কৌশলে চন্দ্রগুপ্ত-মন্ত্রী চাণক্যকর্তৃক নন্দরাজগণের মন্ত্রী রাক্ষসের স্বপক্ষে আনয়ন—এই নাটকের মূল বিষয়বস্তু।

বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস'

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে এই নাটকের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কেবল মাত্র রাজনৈতিক ব্যাপার অবলম্বনে আর দ্বিতীয় নাটক সংস্কৃতে নাই; বিষয়বস্তুর পরিকল্পনায় এবং রচনাশৈলীতে ইহা সাধারণ সংস্কৃত নাটক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহাতে একটি মাত্র নগণ্য নারীচরিত্র আছে। এই নাটকের অনেক ঘটনা বা চরিত্র অনৈতিহাসিক হইতে পারে, কিন্তু তাহাই ইহার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নহে। বিশাখদত্ত নাটকের ছলে কবিত্বের পরিচয় দেন নাই, জটিল ঘটনাজাল সৃষ্টি করিয়া সুষ্ঠুভাবে মূলবস্তুর পরিণতি সাধন করিয়াছেন। চাণক্য ও রাক্ষসের চরিত্র-চিত্রণে নাট্যকারের যথেষ্ট নৈপুণ্য আছে। দুইজনই কুশাগ্রবুদ্ধি মন্ত্রী; কিন্তু চাণক্য স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন, আত্ম-প্রত্যয়ী ও সতর্ক; রাক্ষস অপেক্ষাকৃত কোমলচিত্ত, আবেগ- ও ভ্রম-প্রবণ। চন্দ্রগুপ্ত ও মলয়কেতুর চরিত্রে যে বিপরীত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে উভয়ের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের বুদ্ধি পরিপক্ক, আর মলয়কেতুর বুদ্ধি যুবজনসুলভ দোষদুষ্ট। বিশাখদত্তের রচনা সহজ ও স্বচ্ছন্দগতি। দীর্ঘ সমাসবহুল পদের প্রয়োগে বা অসংযত কল্পনার আশ্রয়ে অথবা অলঙ্কারসমূহের বাহুল্যে নাটকটি দোষযুক্ত হয় নাই।

ইহার বৈশিষ্ট্য ও সাহিত্যিক গুণাগুণ

নাটকের প্রারম্ভে বিশাখদত্ত যে স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন, তাহার অধিক আমাদের আর কিছু জানিবার উপায় নাই। বিশাখদত্ত ছিলেন মহারাজ ভাস্করদত্ত বা পৃথুর পুত্র এবং সামন্ত বটেশ্বরদত্তের পৌত্র। 'মুদ্রারাক্ষসে'র অন্তিম শ্লোকে নাট্যকার অবন্তিবর্মা (কোন পুথিতে রন্তিবর্মা বা দন্তিবর্মা) নামক রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। অবন্তিবর্মা নামক দুইজন রাজা ছিলেন—একজন খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকের লোক এবং অপরজনের কাল খ্রীষ্টীয় ৯ম শতক। 'মুদ্রারাক্ষসে'র কোন কোন পুথিতে উক্ত নামের স্থলে চন্দ্রগুপ্তের নাম আছে। ইহা হইতে

বিশাখদত্তের জীবনী ও কাল

কেহ কেহ মনে করেন, এই রাজা গুপ্তবংশের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (খ্রীঃ ৪র্থ-৫ম শতক)। বিশাখদত্তের কাল নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত না হইলেও তিনি যে খ্রীষ্টীয় নবম শতকের পূর্ববর্তী সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

ভট্টনারায়ণ

'বেণীসংহার' ইঁহার রচিত ষড়ঙ্ক নাটক। 'মহাভারতে'র প্রসিদ্ধ কাহিনী এই নাটকের উপজীব্য। ভীম কর্তৃক দুঃশাসন-বধ ও তাহার রক্তে দ্রৌপদীর বেণীবন্ধন এবং কালক্রমে দুর্যোধনের নিধন—সংক্ষেপে ইহাই এই নাটকের বস্তু।

ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার'

এই নাটকে নানা ঘটনার সন্নিবেশে মূল বস্তু কণ্টকিত হওয়ায় পাঠকের কৌতূহল নানাস্থানে ব্যাহত হইয়া যায়। কিন্তু, চরিত্রের যে চিত্রগুলি ভট্টনারায়ণ অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্যোধনের নৃশংসতা, ভীমের দর্পপূর্ণ বীরত্ব, অর্জুনের সংযত শৌর্য, যুধিষ্ঠিরের ন্যায়- ও ধর্ম-পরায়ণতা—প্রভৃতি নাট্যকার কর্তৃক মনোজ্ঞভাবে চিত্রিত হইয়াছে। ভট্টনারায়ণের রচনা ঋজু ও হৃদয়গ্রাহী। বীররস, করুণরস ও ভীতি নাট্যকারের লেখনীতে মনোজ্ঞরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভট্টনারায়ণের নির্বাচিত ছন্দগুলি চিত্তাকর্ষক।

সাহিত্যিক বিচার

ভট্টনারায়ণকে খ্রীষ্টীয় ৮ম-৯ম শতকের লেখক বলিয়া মনে করা হয়। ইনি বঙ্গরাজ আদিশূর কর্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম—বাংলা দেশের এই জনশ্রুতির কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন না।

ভট্টনারায়ণের কাল

ভবভূতি

ইঁহার রচিত 'উত্তররামচরিত' নামক সপ্তাঙ্ক নাটক সুপ্রসিদ্ধ।

ভবভূতির রামায়ণমূলক অপর নাটক 'মহাবীরচরিত' সপ্তাঙ্কে রচিত। ইহাতে রামোপাখ্যানের পূর্বভাগ, অর্থাৎ রামের বনগমনের পূর্ব পর্যন্ত বর্ণিত আছে।

ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' 'মহাবীরচরিত'

ভবভূতির 'মালতীমাধব' সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকার গ্রন্থ। ইহা দশাঙ্কে রচিত

প্রকরণ। তরুণ ছাত্র মাধব এবং মন্ত্রিকন্যা মালতীর প্রণয়-কাহিনী এই গ্রন্থের মূল বা আধিকারিক বস্তু। নানা বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়া এবং মালতী ও মাধবের পিতার বান্ধবী বুদ্ধিমতী বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা কামন্দকীর কৌশলে প্রণয়ের সার্থকতা—'মালতীমাধব' প্রকরণের প্রতিপাদ্য বিষয়।

'মালতীমাধব'

'উত্তররামচরিত'-এর নাম হইতেই উহার বিষয়বস্তুর আভাস পাওয়া যায়। রামায়ণের আখ্যান ইহার উপজীব্য। কিন্তু, সমগ্র আখ্যানটিকে এই নাটকের বিষয়ীভূত করা হয় নাই। রামচরিতের উত্তরভাগ, অর্থাৎ সীতার উদ্ধারের পর রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও রাজ্যাভিষেকের পরবর্তী ঘটনাসমূহ লইয়া এই নাটক রচিত। মূল আখ্যানকে নাট্যকার অনেক পরিমাণে পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মধ্যে প্রধান প্রধানগুলি এইরূপ—রামের সহিত বনদেবতা বাসন্তীর সাক্ষাৎকার এবং ছায়াসীতা, লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ, বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী ও রামের মাতৃগণের বাল্মীকির আশ্রমে অবস্থান ইত্যাদি। প্রত্যেকটি নূতন ঘটনাই নাটকীয় বস্তুর পরিণতির সহায়ক। কিন্তু, নাট্যশাস্ত্রের অনুশাসনের অন্ধ আনুগত্যে ভবভূতি মূল আখ্যানটিকে বিসদৃশ ভাবে বিকৃত করিয়াছেন। বাল্মীকির আখ্যান বিয়োগান্তক; কিন্তু, নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশে নাটককে মিলনাত্মক করিতে হইবে। ফলে, ভবভূতি অলৌকিক ঘটনাবলীর অবতারণা করিয়া সীতার সহিত রামের মিলন ঘটাইয়াছেন। ইহাতে সুপ্রচলিত আখ্যানের স্বাভাবিক পরিণতির ব্যাঘাত ঘটিয়াছে এবং ভবভূতিরচিত বস্তুর কৃত্রিমতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। 'উত্তররামচরিতে' ভবভূতির নাট্যরচনাকৌশলের যথেষ্ট পরিচয় আছে। প্রথম অঙ্কে আলেখ্য-দর্শনে সীতার অরণ্যদর্শনের সঙ্কল্প রামের সীতাকে বনবাসে প্রেরণ করিবার সুযোগ ঘটাইয়া দিল। তৃতীয় অঙ্কে ছায়াময়ী সীতা রামের দুঃখের আন্তরিকতা অনুভব করিলেন; ভবিষ্যতে রামের সহিত তাঁহার মিলনের পথ সুগম হইল।

সাহিত্যিক বিচার

চরিত্র-বিশ্লেষণে ভবভূতি সিদ্ধহস্ত। তরুণ ও বলদৃপ্ত লবের চরিত্র মনোরম। রাজা হিসাবে রামের কর্তব্যপরায়ণতা ও স্বার্থত্যাগ, মানুষ হিসাবে

নির্বাসিতা সীতার জন্য তাঁহার 'অন্তর্গূঢ়ঘনব্যথা' এবং অনুতাপানলে অন্তর্দাহ অতি মনোজ্ঞভাবে ভবভূতি বর্ণনা করিয়াছেন। পতির আন্তরিক পত্নীপ্রেমের পরিচয় লাভে 'শরীরিণী বিরহব্যথা' জানকীর স্ত্রীসুলভ কোমলতা ও ক্ষমার প্রকাশ অনবদ্য।) করুণরসের যে চিত্র ভবভূতি নাট্যগ্রন্থগুলিতে, বিশেষতঃ 'মালতীমাধবে' ও 'উত্তররামচরিতে', অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে 'কারুণ্যং ভবভূতিরেব তনুতে' এই উক্তি সার্থক হইয়াছে। ('উত্তরচরিতে' সীতার বিরহে শোকাতুর রামের আর্তনাদে 'অপি গ্রাবা রোদিতি, অপি দলতি বজ্রস্য হৃদয়ম্'—হৃদয়-বিদারক করুণ রসের কী চমৎকার বর্ণনা। দাম্পত্যপ্রেম এবং বাৎসল্য রসেরও বিচিত্র বর্ণনা 'উত্তররামচরিতে'র পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় রহিয়াছে।) 'মালতীমাধবে' নাট্যকার গতানুগতিক বিষয়বস্তু অবলম্বন না করিয়া মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন, এবং উহাতে বিভিন্ন ঘটনাবলীর অপূর্ব বিন্যাস রহিয়াছে। মালতী ও মাধবের প্রণয়কাহিনীর সহিত মদয়ন্তিকা ও মকরন্দের প্রেমের প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তটি ভবভূতি অতি নৈপুণ্য সহকারে গ্রথিত করিয়াছেন। ভবভূতির অপর একটি গুণ, প্রাকৃতিক দৃশ্যের অপরূপ বর্ণনা। কালিদাসের বর্ণনার মাধুর্য হয়ত ভবভূতির গ্রন্থে নাই; কিন্তু ভবভূতির বর্ণনায় প্রকৃতির বাস্তব রূপটি পাঠকের নিকট উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। দণ্ডকারণ্যের একটি দৃশ্যের বর্ণনাচ্ছলে তিনি লিখিয়াছেন :—

কণ্ডূলদ্বিপগণ্ডপিণ্ডকষণোৎকম্পেন সম্পাতিভি
র্ঘর্মস্রংসিতবন্ধনৈঃ স্বকুসুমৈরর্চন্তি গোদাবরীম্।
ছায়াপস্কিরমাণবিষ্কিরমুখব্যাকৃষ্টকীটত্বচঃ
কূজৎক্লান্তকপোতকুক্কুটকুলাঃ কূলে কুলায়দ্রুমাঃ ॥

(উত্তররামচরিত—২।৯)

[তীরস্থিত নীড়বহুল তরুরাজি স্বীয়পুষ্পসম্ভারে গোদাবরীর অর্চনা করিতেছে; (ঐ) পুষ্পসমূহ আতপক্লিষ্ট হইয়া শ্লথবৃন্ত অবস্থায় কণ্ডুয়মান-গজগণ্ডঘর্ষণে ভূপাতিত হইতেছে, ছায়াস্থিত ভূমি-আলেখনকারী বিহগকুল বৃক্ষরাজির কীটদষ্ট বল্কলগুলি আকর্ষণ করিতেছে, বৃক্ষোপরি সুন্দর কপোত ও কুক্কুটের দল কূজন করিতেছে।]

দাম্পত্যপ্রেমের বর্ণনা—

অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগতং সর্বাস্ববস্থাসু যদ্
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতং
ভদ্রং তস্য সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে ॥

(উত্তরচরিত– ১।৩৯)

[যাহা সুখ ও দুঃখে একরূপ, যাহা সকল অবস্থারই অনুকূল, যাহা হৃদয়ের বিশ্রামস্থল, যাহার রস জরা হরণ করিতে পারে না, কালবশে লজ্জাদি আবরণের অভাবহেতু যাহা স্নেহসারে পরিণত হয়, সেই অদ্বিতীয় বস্তু কষ্টে লব্ধ হয়; যে সজ্জন উহা লাভ করিয়াছেন তাঁহার মঙ্গল হউক।]

নাট্যকারের মতে, বিভিন্ন রস একই মূলীভূত করুণরসের অভিব্যক্তি; এই মত তিনি প্রকাশ করিয়াছেন নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে—

একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদা-
ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্তান্।
আবর্তবুদ্বুদতরঙ্গময়ান্ বিকারা
নম্ভো যথা সলিলমেব হি তৎ সমস্তম্ ॥

(উত্তরচরিত—৩।৪৭)

[একমাত্র করুণরস নিমিত্তভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়, যেমন একই জলকে আবর্ত, বুদ্বুদ ও তরঙ্গ প্রভৃতি রূপে দেখা যায়।]

পতি-পত্নীর পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ভবভূতি বলিয়াছেন—

প্রেয়ো মিত্রং বন্ধুতা বা সমগ্রা
সর্বে কামাঃ শেবধির্জীবিতং বা।
স্ত্রীণাং ভর্তা ধর্মদারাশ্চ পুংসাম্
ইত্যন্যোন্যং বৎসয়োর্জ্ঞাতমস্তু ॥ (মালতীমাধব)

[তোমরা জানিও যে, স্বামীর পক্ষে স্ত্রী এবং স্ত্রীর পক্ষে স্বামী প্রিয়তম বন্ধু, সমগ্র আত্মীয়তার প্রতীক, সমস্ত কাম্যবস্তু, নিধি, এমন কি প্রাণ।]

'মহাবীরচরিতে' ভবভূতির একটি ত্রুটি এই যে, মাঝে মাঝে কোন কোন চরিত্র অতিদীর্ঘ কথা বলিয়া পাঠকের বিরক্তি জন্মায়। ভবভূতির ভাষা

স্থানে স্থানে দীর্ঘসমাসবহুল ও দুরূহ। ভবভূতির নাট্যগ্রন্থগুলিতে হাস্যরসের স্বল্পতা বর্তমান যুগে পাঠকের নিকট বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। ভবভূতির শ্লোকসমূহে ছন্দ ও অলঙ্কারের বৈচিত্র্য প্রচুর পরিমাণে আছে।)

ভবভূতির জীবনী ও কাল

স্বীয় গ্রন্থসমূহে ভবভূতি কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দিয়াছেন। সম্ভবতঃ বিদর্ভের পদ্মপুরে কাশ্যপগোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। ভবভূতি ভট্টগোপালের পৌত্র এবং নীলকণ্ঠ ও জাতুকর্ণীর পুত্র। ভবভূতির একটি উপাধি ছিল 'শ্রীকণ্ঠ'।

ভবভূতির কাল খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকের শেষভাগে বা ৮ম শতকের প্রথম ভাগে বলিয়া অনুমিত হয়।

কালিদাসোত্তর যুগের অপরাপর নাট্যকারগণের মধ্যে যশোবর্মণ ও মায়ুরাজ সমধিক প্রসিদ্ধ।

যশোবর্মণের 'রামাভ্যুদয়' মায়ুরাজের 'উদাত্তরাঘব'

যশোবর্মণের 'রামাভ্যুদয়' লুপ্ত। কিন্তু, আনন্দবর্ধন কর্তৃক ইহার উল্লেখ ও অলঙ্কারশাস্ত্রগ্রন্থসমূহে এবং কোষকাব্যগুলিতে ইহার শ্লোকসমূহের উদ্ধৃতি হইতে মনে হয়, এককালে ইহা প্রসিদ্ধ নাটক ছিল। মায়ুরাজের 'উদাত্তরাঘব'ও লুপ্ত এবং অনুরূপ ভাবেই ইহার খ্যাতি অনুমেয়।

'মল্লিকামারুত', 'পার্বতীপরিণয়', 'মুকুট-তাডিতক', 'আশ্চর্যচূড়ামণি'

এই যুগের অন্যান্য নাট্যগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদ্দণ্ডনাথের 'মল্লিকামারুত', বাণভট্টের রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ 'পার্বতী-পরিণয়', অধুনালুপ্ত 'মুকুট-তাডিতক' ও শক্তিভদ্রের 'আশ্চর্যচূড়ামণি'।

ক্ষয়িষ্ণু দৃশ্যকাব্য

ভবভূতির সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় নাট্যপ্রতিভার গৌরবময় যুগের অবসান ঘটিয়াছিল। তাঁহার পরেই এই প্রতিভার ক্ষীয়মাণ রূপটির পরিচয় পাওয়া যায়। এই ক্ষয়িষ্ণু যুগে বহু নাট্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল; কিন্তু ইহারা নাট্যশাস্ত্রের নিয়মে নিগড়িত, নাটক হিসাবে নগণ্য এবং অনেক ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বিখ্যাত নাটকসমূহের অনুকরণ মাত্র। ইহাদের মধ্যে পদ্য-কাব্যরচনার কৌশল আছে বটে; কিন্তু নাট্যরচনাকৌশলের পরিচয় নাই।

এই যুগের নাট্যকারগণের রচনা সাহিত্যিক ব্যায়াম ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক মাত্র। খ্রীষ্টীয় নবম শতক হইতে মোটামুটি ভাবে এই যুগের প্রারম্ভ বলা যায়।

এই যুগের অপেক্ষাকৃত অধিকতর পরিচিত নাট্যকারগণের ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থগুলির নাম নিয়ে দেওয়া গেল :—

গ্রন্থকার	গ্রন্থ
(বর্ণানুক্রমিক)	
কবিকর্ণপুর (১৬শ শতক)	চৈতন্যচন্দ্রোদয়
কৃষ্ণমিশ্র (১১শ শতক)	প্রবোধচন্দ্রোদয়
ক্ষেমীশ্বর (১০ম শতক)	চণ্ডকৌশিক
জয়দেব (১৩শ শতক)	প্রসন্নরাঘব
(বেরারের)	
দামোদর মিশ্র (১১শ শতক ?)	মহানাটক বা হনুমন্নাটক
বীরনাগ	কুন্দমালা
বিহ্লণ (১১শ শতক)	কর্ণসুন্দরী
মুরারি (১০ম শতক)	অনর্ঘরাঘব
রাজশেখর	বালরামায়ণ
	বালভারত (অসম্পূর্ণ)

উল্লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর নাটক। ইহা একটি রূপকনাট্য। ইহাতে প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, মন, ধর্ম, বিবেক, দম্ভ, লোভ, ভক্তি প্রভৃতিকে এক একটি চরিত্ররূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে। অদ্বৈত বেদান্ত-মতের সহিত বিষ্ণুভক্তির সমন্বয়সাধন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

পরিশিষ্ট

(ক) সংস্কৃতে ঐতিহাসিক রচনাবলী

কোন কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের মতে, ভারতীয় সাহিত্যে কোন ইতিহাস নাই, এমন কি ভারতীয়দের ঐতিহাসিক বোধও নাই। এই অভিযোগ সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রে কতদূর সত্য, তাহাই বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য।

ভারতীয় সাহিত্যে ঐতিহাসিক রচনার অভাব সম্বন্ধে অভিযোগ

ভারতীয় সাহিত্যে ইতিহাস নাই, এই অভিযোগটি সম্পূর্ণ সত্য নহে। 'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে' আমরা যে কাহিনী পাইয়া থাকি, তাহার ঐতিহাসিকত্বের কোন প্রমাণ নাই; রামচন্দ্র বলিয়া প্রকৃতই কোন রাজা ছিলেন কিনা, অথবা রাবণ নামে তাঁহার কোন প্রতাপশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কিনা তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। 'মহাভারতে'র পাণ্ডব এবং কৌরবগণের যে যুদ্ধকাহিনী আমরা পাই তাহার যথার্থতা-নির্ণয়ের জন্য নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ নাই। তবে, ঐ উভয় গ্রন্থেরই মূলে কোন প্রকৃত ঘটনা থাকা খুব সম্ভব, অনেকে এইরূপ মনে করেন। তাঁহাদের মতে, কোন বাস্তব ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া সম্ভবতঃ ঐ গ্রন্থদ্বয়ের আদি রচয়িতৃগণ রাজাদের কাল্পনিক নাম দিয়া এবং নিজেদের কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য নূতন ঘটনাবলীর সৃষ্টি করিয়া গ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থগুলিতে রাজনৈতিক ইতিহাসের উপকরণ থাকুক বা নাই থাকুক, উহাদের মধ্যে যে সামাজিক আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির পরিচয় আমরা পাইতেছি, তাহাদের একটা মূল্য আছে, একথা অস্বীকার করা যায় না।

উক্ত অভিযোগের অযৌক্তিকতা

পুরাণ

পুরাণ নামক যে গ্রন্থগুলি আমরা পাইতেছি, তাহাদের মধ্যে সামাজিক চিত্র ছাড়াও, রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক উপকরণ পাওয়া যায়। পুরাণে বর্ণিত রাজগণের বংশাবলীতে ভ্রমপ্রমাদ এবং অতিশয়োক্তি ও অতিরঞ্জন থাকিলেও তাহাদের

মধ্যে কিছু পরিমাণে ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে, ইহা পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন।

স্তম্ভ এবং মন্দির প্রভৃতিতে ক্ষোদিত লেখমালায় এবং তাম্রশাসনগুলিতে প্রকৃত ইতিহাস আমরা পাইয়া থাকি। উহাদের মধ্যে প্রশস্তিজাতীয় লেখমালাতে কবিসুলভ অতিশয়োক্তি, অতিরঞ্জন প্রভৃতি থাকিলেও রাজগণের বংশাবলী এবং মঠ, মন্দির ও স্তম্ভাদি নির্মাণ এবং প্রতিষ্ঠার তারিখ ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত প্রাচীন প্রশস্তিগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে :—

প্রশস্তি প্রভৃতি লেখমালা

(১) গীর্ণার প্রশস্তি (আঃ ১৫০-১৫২ খ্রীষ্টাব্দ),

(২) হরিষেণ-রচিত সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তি,

(এলাহাবাদ—আঃ ৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দ)

(৩) বৎসভট্টি-রচিত প্রশস্তি (মান্দাসোর, ৪৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দ)।

ক্লাসিক্যাল যুগের কাব্যেও কতক পরিমাণে ঐতিহাসিক তথ্য আছে। পদ্যকাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে, নিম্নলিখিত কাব্যগ্রন্থগুলিতে কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীরও কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায় :—

কাব্যে ঐতিহাসিক তথ্য

পদ্যকাব্য

পদ্মগুপ্তের 'নবসাহসাঙ্কচরিত', বিল্‌হণের 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত', কল্‌হণের 'রাজতরঙ্গিণী' ও সন্ধ্যাকরের 'রামচরিত'।

ইহাদের মধ্যে 'রাজতরঙ্গিণী'র ঐতিহাসিক মূল্যই পণ্ডিতসমাজে সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া বিবেচিত হয়। এই সমস্ত গ্রন্থ ছাড়াও ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে এমন অনেক পদ্যকাব্য রচিত হইয়াছে, যাহাদের নাম তত প্রসিদ্ধ নহে।

গদ্যকাব্যের ক্ষেত্রেও বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে'র ঐতিহাসিকত্ব, যত অল্পপরিমাণই হউক, স্বীকৃত হইয়াছে। অশ্বঘোষের 'শারিপুত্রপ্রকরণ', বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' প্রভৃতি দৃশ্যকাব্যে কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে।

গদ্যকাব্য

দৃশ্যকাব্য

উল্লিখিত আলোচনা হইতে ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, সংস্কৃত

সাহিত্যে ইতিহাস একেবারেই নাই, এই অভিযোগ অমূলক। তবে একথা ঠিক যে, এই সাহিত্যের বিশালত্বের তুলনায় মনে হয় যে, ইহাতে ঐতিহাসিক তথ্য অতি নগণ্য। যেসব গ্রন্থগুলিতে ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যেও অলঙ্কার ও বাগ্‌বাহুল্য হইতে খাঁটি ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করা কঠিন এবং ঐ সব গ্রন্থে ইতিহাস রচনা অপেক্ষা কাব্যকৌশলের প্রতিই লেখকের প্রয়াস অধিকতর। কিন্তু, ঐ লেখকগণের ঐতিহাসিক বোধ ছিল না, এমন নহে। ঐতিহাসিক বোধ না থাকিলে, তাঁহারা ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া গ্রন্থরচনার প্রচেষ্টা হয়ত করিতেনই না।

ঐতিহাসিক রচনার স্বল্পতার কারণ

এখন প্রশ্ন এই—সংস্কৃত সাহিত্যে ঐতিহাসিক রচনা এত কম কেন? এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। ইহার অনেকগুলি কারণের মধ্যে প্রধান এই যে, যে জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া লোকে ইতিহাস রচনা করিয়া থাকে, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে দেখা যায়, সেই জাতীয়তাবোধ লোকের মনে জাগিবার অবকাশ হয় নাই। রাজবংশগুলির দ্রুত উত্থান পতন, প্রতাপশালী রাজ্যগুলির মধ্যে পরস্পর কলহ, এবং কোন একটি কেন্দ্রীয় শক্তির প্রতি সমগ্র ভারতের আনুগত্যের অভাব এই জাতীয়তাবোধের পরিপন্থী। দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন ভারতবাসিগণের মনের গঠন এই ব্যাপারের জন্য কতক পরিমাণে দায়ী। কর্মবাদ, অলৌকিক ঘটনাবলীতে বিশ্বাস প্রভৃতি তাঁহাদের মনে বদ্ধমূল হওয়ায়, তাঁহারা কোন স্মরণীয় ঘটনার কার্য-কারণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্ধারণ করিবার প্রচেষ্টা করিতেন না।

জাতীয়তাবোধের অভাব

কর্মবাদ, অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস

(খ) গীতিকাব্য

'গীতিকাব্য' বলিতে সেই ধরণের কাব্যকে বুঝায়, যাহা গীত হওয়ার যোগ্য। ইহাতে কবি-চিত্তের স্বতঃস্ফূর্ত একটি ভাব বা আবেগ প্রকাশিত হয়। এইরূপ কাব্য সাধারণতঃ অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের তুলনায় সংক্ষিপ্ত।

ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্যে গীতিকাব্য প্রচুর। ইহাদের বিষয়বস্তু বিবিধ প্রকার; যথা—শৃঙ্গাররসাত্মক, ভক্তিমূলক ও নীতিমূলক। এই জাতীয় অনেকগুলি কাব্যে প্রকৃতির সহিত মানুষের নিবিড় যোগের বর্ণনা করা হইয়াছে। কোষকাব্যসমূহে গীতিধর্মী অসংখ্য শ্লোক নানা কবির নামের সহিত যুক্ত দেখা যায়। পদ্যকাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এই জাতীয় প্রধান প্রধান কাব্যগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্তমান প্রসঙ্গে কোষকাব্যের কবিগণের কথা উল্লেখ না করিয়া উল্লেখযোগ্য গীতিকাব্যগুলির নাম একত্র সন্নিবেশিত হইল।

শৃঙ্গাররসাত্মক, ভক্তিমূলক, নীতিমূলক

কাব্য	রচয়িতা
(বর্ণানুক্রমিক)	
অমরুশতক	অমরু
আর্যাসপ্তশতী	গোবর্ধন
ঋতুসংহার	কালিদাস
কৃষ্ণকর্ণামৃত (বা কৃষ্ণলীলামৃত)	লীলাশুক বা বিল্বমঙ্গল
গীতগোবিন্দ	জয়দেব
ঘটকর্পরকাব্য	ঘটকর্পর
চণ্ডীশতক	বাণভট্ট
চৌরপঞ্চাশিকা	বিল্হণ
নীতিশতক	ভর্তৃহরি
মেঘদূত	কালিদাস
বৈরাগ্যশতক	ভর্তৃহরি
শৃঙ্গারশতক	
শৃঙ্গারতিলক	কালিদাস (?)
সূর্যশতক	ময়ূর

উল্লিখিত কাব্যগুলি ছাড়াও, স্তবস্তোত্রের মধ্যে অনেকগুলি গীতিধর্মী।

স্তবস্তোত্র

এই শ্রেণীর গীতিকাব্যে শঙ্করাচার্যের নামে প্রচলিত শিব ও গঙ্গা প্রভৃতি দেবদেবীর উদ্দেশ্যে রচিত স্তবস্তোত্রগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ।

(গ) প্রধান প্রধান গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

গ্রন্থ

অমরকোষ—অমরসিংহ-রচিত 'নামলিঙ্গানুশাসন' নামক অভিধান 'অমরকোষ' নামে প্রচলিত। এই অভিধানে কতকগুলি সংস্কৃত শব্দকে স্বরাদিকাণ্ড, ভূম্যাদিকাণ্ড ও সামান্যকাণ্ড—এই তিন কাণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক কাণ্ডকে কতক বর্গে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই অভিধানে মূল সংস্কৃত শব্দের প্রতিশব্দ ও লিঙ্গ শ্লোকাকারে লিখিত হইয়াছে; কতক সমধ্বনিবিশিষ্ট ভিন্নার্থক শব্দও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অমরসিংহ সম্ভবতঃ ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী লেখক। এই অভিধানের ক্ষীরস্বামি-রচিত টীকা প্রাচীনতম ও সর্বাধিক পরিচিত।

কথাসরিৎসাগর—অধুনালুপ্ত বৃহৎকথার অন্যতম পদ্যরূপের নাম। ইহা কাশ্মীরী সোমদেব-রচিত। ১০৬৩-১০৮১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন কালে ইহা রচিত হইয়াছিল। বৃহৎকথার অধুনাপ্রাপ্ত তিনটি রূপের মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

কর্পূরমঞ্জরী—ইহা চারিটি অঙ্কে রচিত সট্টকশ্রেণীর নাট্যগ্রন্থ। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি প্রাকৃতে রচিত। কোনও এক রাজকুমারীর সহিত এক রাজার গোপন প্রণয়ের কাহিনী, মহিষীর কোপ এবং শেষ পর্যন্ত প্রণয়িনীর সহিত রাজার মিলন—সংক্ষেপে গ্রন্থটির বিষয়বস্তু এইরূপ। ইহার রচয়িতা রাজশেখর আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দশম শতকের লেখক।

কাদম্বরী—বাণভট্ট-রচিত প্রসিদ্ধ গদ্যকাব্য। ইহা কথাশ্রেণীর কাব্য; ইহাতে বর্ণিত ঘটনাবলী কাল্পনিক। এই গ্রন্থের রচনা দীর্ঘসমাসবহুল এবং কঠিন শব্দের প্রয়োগে কণ্টকিত। ইহার মূল আখ্যানে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যান অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে; ফলে অনেক সময়ে মূল আখ্যানের সূত্রটি পাঠক হারাইয়া ফেলেন। ইহার রচয়িতা বাণভট্ট হর্ষবর্ধনের সভাশ্রিত ছিলেন; সুতরাং, তিনি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের আবির্ভাগের লোক।

কুমারসম্ভব—কালিদাস-রচিত মহাকাব্য। ইহা সপ্তদশ সর্গে রচিত। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, ইহার নবম হইতে অবশিষ্ট সর্গগুলি কালিদাস-রচিত নহে। এই অনুমানের প্রধান কারণ এই যে, এই অংশের মল্লিনাথ-রচিত টীকা পাওয়া যায় না এবং প্রথম আট সর্গের তুলনায় শেষ নয় সর্গের রচনাশৈলী নিকৃষ্টতর। তারকাসুর কর্তৃক উৎপীড়িত দেবগণ কর্তৃক শিব-পার্বতীর পরিণয়কল্পে মদনদেবের মাধ্যমে শিবের তপোভঙ্গের পরিকল্পনা, শিব কর্তৃক মদন-নিধন, পার্বতীর তপস্যা-তুষ্ট শিব কর্তৃক পার্বতীর পরিণয়, তারকারি কার্তিকেয়ের জন্ম—সংক্ষেপে ইহাই এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। এই গ্রন্থে হিমালয় ও বসন্তের বর্ণনা অতি মনোজ্ঞ।

গীতগোবিন্দ—জয়দেব-রচিত দ্বাদশ সর্গাত্মক প্রখ্যাত ভক্তিমূলক গীতিকাব্য। ইহাতে বহু গান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের শৃঙ্গার-রসাশ্রিত বসন্তলীলা এই কাব্যের উপজীব্য। কবির নিজের ভাষাতেই জয়দেব-ভারতী মধুর, কান্ত এবং কোমল। হরিস্মরণে সরস মন ও বিলাসকলায় কৌতূহল লইয়া কবি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার খ্যাতি বাংলাদেশের চতুঃসীমা লঙ্ঘন করিয়া সারা ভারতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। কাব্যরসজ্ঞ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণও ইহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। জয়দেব ছিলেন বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের সভাশ্রিত; লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল আনুমানিক ১১৮৫-১২০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপী ছিল।

জানকীহরণ—কালিদাসোত্তর যুগের অন্যতম মহাকাব্য। ইহা কুমারদাস-রচিত। সিংহলে প্রচলিত কিম্বদন্তী এই যে, কুমারদাস ছিলেন সিংহলের রাজা (আনুমানিক ৫১৭-৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ)। সিংহলী ভাষায় রচিত একটি টীকার সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, কাব্যখানি পঞ্চবিংশতি সর্গে রচিত হইয়াছিল; বর্তমানে ইহার অংশমাত্র পাওয়া যায়। রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে ইহা রচিত। উল্লিখিত সিংহলী গ্রন্থ হইতে মনে হয়, জানকীর হরণেই কাব্যের

পরিসমাপ্তি নহে, রামের পুনরায় রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত ঘটনাবলী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

ধ্বন্যালোক—অলঙ্কারশাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ এবং 'কাব্যালোক' বা 'সহৃদয়ালোক' নামেও পরিচিত। কারিকা ও বৃত্তি—এই দুই অংশে গ্রন্থখানি রচিত। টীকাকার অভিনবগুপ্তের সাক্ষ্য হইতে অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, কারিকা ও বৃত্তির রচয়িতৃদ্বয় পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি। বৃত্তি আনন্দবর্ধনের রচিত। কিন্তু, কারিকাংশের রচয়িতার প্রকৃত নাম জানা যায় না; তাঁহাকে কেহ বলেন ধ্বনিকার, কেহ বা মনে করেন তাঁহার নাম সহৃদয়। কারিকাগুলি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় নবম শতকের পূর্বেকার রচনা। আনন্দবর্ধন খ্রীষ্টীয় নবম শতকের মধ্যভাগের লেখক। এই গ্রন্থে কাব্যের আত্মা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের বিচারপূর্বক নানা যুক্তিবলে প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যার্থই কাব্যের আত্মা।

নলচম্পূ—ত্রিবিক্রমভট্ট বা সিংহাদিত্য কর্তৃক সাত উচ্ছ্বাসে রচিত এবং উপলভ্যমান চম্পূকাব্যসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম। ইহা 'দময়ন্তীকথা' নামেও পরিচিত। এই গ্রন্থে রচয়িতার পাণ্ডিত্যপ্রদর্শনের সচেতন প্রয়াস লক্ষণীয়।

নৈষধচরিত—শ্রীহর্ষ (আঃ খ্রীষ্টীয় ১২শ শতক) কর্তৃক দ্বাবিংশতি সর্গে রচিত প্রখ্যাত মহাকাব্য। 'মহাভারতে'র নল-দময়ন্তীর কাহিনী অবলম্বনে নলের সহিত দময়ন্তীর বিবাহ ও নলের রাজধানীতে কলির আগমন পর্যন্ত ঘটনাবলী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

পরম্পরাগত ভারতীয় সমালোচনায় 'নৈষধে পদলালিত্যং' সবিশেষ উপভোগ্য ও কবির রচনাকৌশলের পরিচায়ক। কিন্তু, আধুনিক সমালোচকগণের, বিশেষতঃ পাশ্চাত্ত্য সমালোচকগণের, মতে কাব্যটি কবির পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক হইলেও ইহাতে কাব্যোৎকর্ষ বিশেষ কিছু নাই। কবির মাত্রাবোধের অভাব, দুরূহ শব্দের প্রয়োগ এবং দার্শনিক মতবাদের অবতারণা হেতু অনেক

সমালোচকের মতে কাব্যখানি কুরুচি ও নিকৃষ্ট রচনাশৈলীর উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

পার্বতীপরিণয়—বাণের (খ্রী ৭ম শতক) নামাঙ্কিত পঞ্চাঙ্ক নাটক। প্রকৃতপক্ষে ইহা খ্রীষ্টীয় ১৪শ-১৫শ শতকের জনৈক অভিনববাণ কর্তৃক রচিত। ইহার বিষয়বস্তু হইতে মনে হয়, ইহা কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে'র নাট্যরূপমাত্র। নাটক হিসাবে ইহা উৎকর্ষহীন।

প্রবোধচন্দ্রোদয়—কৃষ্ণমিশ্র (খ্রীষ্টীয় ১১শ শতক)-রচিত ষড়ঙ্ক নাটক। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, গতানুগতিক কাহিনী অবলম্বনে ইহা রচিত হয় নাই। ইহা একখানি রূপক নাট্য (allegorical drama)। মন, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, মোহ, লোভ, দম্ভ, ধর্ম, বিবেক প্রভৃতি এই গ্রন্থে নাটকীয় চরিত্ররূপে উপস্থাপিত হইয়াছে। অদ্বৈত বেদান্ত মতের সঙ্গে বিষ্ণুভক্তির সমন্বয় এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য।

বাসবদত্তা—সুবন্ধু (খ্রীষ্টীয় ৭ম শতক)-রচিত কথাশ্রেণীর গদ্যকাব্য। রাজকুমার কন্দর্পকেতু ও রাজকুমারী বাসবদত্তার প্রণয়কাহিনী এই গ্রন্থের উপজীব্য; মূল কাহিনীটির উৎস গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'। পরম্পরাগত ভারতীয় সমালোচনায় সুবন্ধুকে বাণভট্টের সমকক্ষ বলা হইয়াছে। নানা অলঙ্কারের সুনিপুণ প্রয়োগে সুবন্ধুর রচনাটি উপাদেয়।

বুদ্ধচরিত—অশ্বঘোষ (আঃ খ্রীষ্টীয় ১ম শতক)-কর্তৃক বুদ্ধের জীবনকাহিনী অবলম্বনে রচিত। ইহার অধুনাপ্রাপ্ত সংস্কৃত রূপে সর্গসংখ্যা ১৭; কিন্তু, ইহার চীনা ও তিব্বতীয় অনুবাদে সর্গসংখ্যা ২৮। ইহার শেষাংশ অশ্বঘোষ-রচিত কিনা সেই বিষয়ে সংশয় আছে। অষ্টাবিংশতি সর্গাত্মক 'বুদ্ধচরিতে'র প্রারম্ভে আছে গৌতমের জন্মবৃত্তান্ত এবং ইহার শেষ হইয়াছে অশোকের রাজত্ববর্ণনায়। এই কাব্যের রচনা প্রাঞ্জল, ভাষা স্বচ্ছন্দগতি এবং ভাব হৃদয়গ্রাহী। এই গ্রন্থে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর প্রাণস্পর্শী চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

বৃহৎকথা—প্রসিদ্ধি এই যে, ইহা গুণাঢ্য কর্তৃক পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত হইয়াছিল।

ইহার রচনাকাল, কাহারও কাহারও মতে, খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতক। মূল গ্রন্থখানি লুপ্ত। ইহার সংস্কৃতে রচিত তিনটি রূপ বর্তমান আছে—ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী' সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' এবং বুধস্বামীর 'বৃহৎকথাশ্লোক-সংগ্রহ'; প্রথম দুইটির রচয়িতা কাশ্মীরী, শেষোক্ত গ্রন্থের প্রণেতা নেপালী। 'বৃহৎকথা' পরবর্তী কালের বহু শ্রব্যকাব্য ও দৃশ্যকাব্যের উপজীব্য।

ভট্টিকাব্য—ইহার প্রকৃত নাম 'রাবণবধ' এবং ভট্টি বা ভর্তৃহরি (আঃ ৭ম শতক) কর্তৃক রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে দ্বাবিংশ সর্গে রচিত। প্রকীর্ণ, অধিকার, প্রসন্ন ও তিঙন্ত—এই চারিটি 'কাণ্ডে' কাব্যখানি সম্ভবতঃ সরসভাবে ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্র সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল। মল্লিনাথ ইহাকে বলিয়াছেন 'উদাহরণকাব্য'। কঠিন ভাষার আবরণে স্থানে স্থানে ইহার কাব্যোৎকর্ষ প্রশংসার্হ। দ্বিতীয় সর্গে শরদ্বর্ণন রচয়িতার কবিত্বশক্তির একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

ভাগবত—ইহা দ্বাদশ 'স্কন্ধে' রচিত, ইহার শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৮,০০০। কৃষ্ণের জীবনী, লীলাকীর্তন, বিষ্ণুর অবতারসমূহের বর্ণনা এবং কলিযুগ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী প্রভৃতি এই গ্রন্থের প্রধান বিষয়বস্তু। 'ভাগবত' বৈষ্ণবগণের সবিশেষ আদরণীয় ও শ্রদ্ধেয়। ভাষা, রচনাশৈলী ও ছন্দে ইহা পুরাণসমূহের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। কেহ কেহ ইহাকে বৈয়াকরণ বোপদেব কর্তৃক রচিত মনে করেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, ইহা অনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১০ম শতকের রচনা।

মহাভারত— ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে ব্যাস-রচিত। আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে, ইহা এক ব্যক্তির বা এক কালের রচনা নহে। তাঁহারা নানা যুক্তিবলে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, একই 'মহাভারতে' প্রাচীন ও অর্বাচীন অংশ বিদ্যমান। তাহা ছাড়া গ্রন্থখানির আকার যে যুগে যুগে পরিবর্ধিত হইয়াছে, তাহার

প্রমাণ বিদ্যমান। ভারতবাসিগণের পরম্পরাগত বিশ্বাস এই যে, 'মহাভারত' 'রামায়ণে'র পরবর্তী কালে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু, রচনাশৈলী, গ্রন্থে প্রতিফলিত সমাজ-চিত্র প্রভৃতি হইতে আধুনিক কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, মহাভারত, অন্ততঃ ইহার অংশবিশেষ, 'রামায়ণে'র পূর্ববর্তী। কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে কলহ, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ এবং অবশেষে ধর্মপরায়ণ পাণ্ডবগণের শ্রীকৃষ্ণসাহায্যে জয়লাভ—এই মূল কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া ইহাতে ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ও দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয় আলোচিত হইয়াছে এবং বিবিধ উপাখ্যান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

মালতীমাধব—ভবভূতি (আঃ খ্রীষ্টীয় ৭ম-৮ম শতক)-রচিত প্রকরণ শ্রেণীর দশাঙ্ক নাট্যগ্রন্থ। তরুণ ছাত্র মাধব এবং মন্ত্রিকন্যা মালতীর প্রণয়কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার প্রণয়কাহিনী এই গ্রন্থে নাট্যরূপ লাভ করিয়াছে। এই উভয় কাহিনী গ্রথিত করিয়া নাট্যকার নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন বটে; কিন্তু, মাধব-মালতীর প্রধান কাহিনীটি অপর গৌণ কাহিনীর নিকট ম্লান হইয়া পড়িয়াছে।

মালবিকাগ্নিমিত্র—কালিদাস (আঃ খ্রীঃ ৫ম শতক)-রচিত পঞ্চাঙ্ক নাটক। রাজকুমারী মালবিকার প্রতি রাজার অনুরাগ, ইহাতে কনিষ্ঠা মহিষী ইরাবতীর কোপ এবং অবশেষে অনুকূল পরিস্থিতিতে জ্যেষ্ঠা মহিষী ধারিণীর সাহায্যে রাজা ও তদীয় প্রণয়িনীর পরিণয়—সংক্ষেপে এই নাটকের বিষয়বস্তু এইরূপ। কাহারও কাহারও মতে, এই নাটক কালিদাসের অপরিণত বয়সের রচনা।

মুদ্রারাক্ষস—বিশাখদত্ত (আঃ খ্রীঃ ৯ম শতক)-রচিত সপ্তাঙ্ক নাটক। নানা কৌশলে চন্দ্রগুপ্ত-মন্ত্রী চতুর চাণক্য বা কৌটিল্য কর্তৃক বিধ্বস্ত নন্দরাজগণের অনুরক্ত মন্ত্রী রাক্ষসের স্বপক্ষে আনয়ন এই নাটকের মূল বিষয়বস্তু। শুধু রাজনৈতিক ব্যাপার অবলম্বনে

আর কোন নাটক সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে রচিত হয় নাই। ইহাতে একটি মাত্র নগণ্য স্ত্রীলোক ছাড়া অপর কোন নারীচরিত্র নাই—ইহাও এই নাটকের অপর একটি বৈশিষ্ট্য।

মৃচ্ছকটিক—ইহা প্রকরণ শ্রেণীর দশাঙ্ক নাট্যগ্রন্থ। ইহা শূদ্রকের নামাঙ্কিত। কেহ কেহ মনে করেন, ইহা শূদ্রক নামক কোন রাজার সভাশ্রিত পণ্ডিতের রচনা; কাহারও কাহারও মতে, ইহা ভাস-রচিত। খ্রীঃ পূর্ব ২য় শতক হইতে খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতক পর্যন্ত নানা কালই ইহার রচনাকাল বলিয়া বিভিন্ন পণ্ডিত মনে করেন। সচ্চরিত্র দরিদ্র ব্রাহ্মণ চারুদত্তের প্রতি গণিকা বসন্তসেনার অনুরাগ এবং নানা অবস্থাবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া উভয়ের মিলন ও বসন্তসেনা কর্তৃক চারুদত্তের বধূপদপ্রাপ্তি এই গ্রন্থের মুখ্য বিষয়বস্তু। সামাজিক ঘটনাবলী অবলম্বনে রচিত এই গ্রন্থখানি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

মেঘদূত—কালিদাস-রচিত বিখ্যাত গীতিকাব্য। ইহা পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রভুর শাপে রামগিরিবাসী বিরহী যক্ষকর্তৃক অলকাপুরীস্থিতা স্বীয় প্রিয়ার নিকট মেঘকে দূতরূপে যাইবার অনুরোধ—এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। কালিদাস এই কাব্যে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর এবং বিরহি-হৃদয়ের আর্তির বর্ণনায় অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কাব্যখানি মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত; ইহার রচনা সাবলীল ও ভাষা সরল।

রত্নাবলী—শ্রীহর্ষ-রচিত চতুরঙ্ক নাটিকা। নাট্যকার, কাহারও কাহারও মতে, স্থাণ্বীশ্বর-রাজ হর্ষবর্ধন (খ্রীঃ ৭ম শতকের আদিভাগ)। নৌব্যসনে বিপন্না সিংহলরাজকন্যা রত্নাবলী রাজা উদয়নের সভায় আনীতা, সাগরিকা নামে উদয়নের প্রাসাদে তাঁহার অবস্থান, তাহার প্রতি রাজার প্রেমাসক্তি এবং নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রমের পরে উভয়ের মিলন—সংক্ষেপে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু এইরূপ।

রাজতরঙ্গিণী—কল্হণ কর্তৃক ১১৪৮–৫০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কাব্য। ইহাতে কাশ্মীরের রাজগণের বর্ণনা আছে। গ্রন্থের আদিভাগে কতক কাল্পনিক রাজার প্রসঙ্গ থাকিলেও পরে অনেক ঐতিহাসিক রাজবংশ ও রাজার বৃত্তান্ত ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে ইতিহাস রচিত হয় নাই—এই অভিযোগের বিরুদ্ধে জাজ্বল্যমান প্রমাণ 'রাজতরঙ্গিণী'। ইহাতে অতিরঞ্জন অতিশয়োক্তি সত্ত্বেও বহু ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে। সংস্কৃতে এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে কল্হণের কাব্য শ্রেষ্ঠ ও প্রখ্যাত।

শুকসপ্ততি—সংস্কৃত গদ্যে রচিত লোকসাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহা তিন রূপে বিদ্যমান—চিন্তামণিভট্ট কৃত বর্ধিত রূপ (আঃ খ্রীষ্টীয় ১২শ শতক), জনৈক জৈনধর্মাবলম্বী ব্যক্তি-কৃত সংক্ষিপ্ত রূপ এবং দেবদত্ত-কৃত রূপ। ইহাতে ৭০টি গল্প আছে। গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে তদীয় যুবতী পত্নী অন্য ব্যক্তির প্রতি আসক্ত হইয়া গৃহত্যাগে উদ্যত হইলে গৃহপালিত শুক প্রতিদিন এক একটি কৌতূহলোদ্দীপক গল্প বলিয়া তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া রাখে; ইতোমধ্যে গৃহস্বামী প্রত্যাবর্তন করায় তাহার গৃহে অঘটন বারিত হয়—'শুকসপ্ততি'র বিষয়বস্তু এইরূপ।

সপ্তশতী—প্রাকৃতে 'সত্তসঈ' (=সংস্কৃত সপ্তশতী) নামক ৭০০ শ্লোকাত্মক একটি কাব্য হালের নামাঙ্কিত। নর-নারীর প্রেম এই শ্লোকগুলির মুখ্য বিষয়বস্তু। সম্ভবতঃ এই গ্রন্থেরই অনুকরণে বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের (খ্রীঃ ১২শ শতক) অন্যতম সভাকবি গোবর্ধন সংস্কৃতে 'আর্যাসপ্তশতী' নামক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যে শৃঙ্গাররসপ্রধান সপ্তশতাধিক পরস্পরনিরপেক্ষ শ্লোক বর্ণানুক্রমে গ্রথিত হইয়াছে।

সুভাষিতাবলী—সংস্কৃত সাহিত্যে এই নামের একাধিক কোষকাব্য আছে। উহাদের মধ্যে কাশ্মীরী বল্লভদেব কর্তৃক সঙ্কলিত 'সুভাষিতাবলী' সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। বল্লভদেবের উপলভ্যমান গ্রন্থটি খ্রীঃ ১৫শ শতকের পূর্বেকার বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে বিভি-

কবির তিন সহস্রাধিক শ্লোক ১০১টি 'পদ্ধতি' বা প্রকরণে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি নর-নারীর প্রেম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নীতিকথা ও হাস্যরস প্রভৃতি নানা বিষয়ক।

সূর্যশতক—সূর্যের স্তুতিবিষয়ক কাব্য। ইহা ময়ূর কবির নামাঙ্কিত; ময়ূর বাণভট্টের (খ্রীঃ ৭ম শতক) শ্যালক, মতান্তরে শ্বশুর। প্রসিদ্ধি এই যে, তিনি এই কাব্য রচনার ফলে সূর্যদেবের কৃপায় কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

স্বপ্নবাসবদত্তা—ভাস-রচিত নাট্যগ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থের আখ্যানভাগ সংক্ষেপে এইরূপ—পত্নী বাসবদত্তা বৎসরাজ উদয়নের অতিশয় প্রিয় মহিষী। অথচ, চতুর মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ দেখিলেন যে, রাজনৈতিক কারণে উদয়নের সহিত মগধ-রাজকুমারী পদ্মাবতীর পরিণয়-সাধন অবশ্যকর্তব্য। কিরূপ কৌশলে এই পরিণয় ঘটান হইল তাহাই এই ষড়ঙ্ক নাটকের বিষয়বস্তু।

গ্রন্থকার

অশ্বঘোষ—সম্ভবতঃ কুষাণ-বংশীয় রাজা কণিষ্কের (খ্রীঃ ১ম শতক) সমকালীন বৌদ্ধ কবি ও নাট্যকার। অশ্বঘোষ-রচিত কাব্যগুলির মধ্যে 'বুদ্ধচরিত' সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইহাতে গৌতমের জন্ম হইতে তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার অপর দুইটি কাব্যের নাম 'সৌন্দরনন্দ' ও 'গণ্ডীস্তোত্র-গাথা'। অশ্বঘোষ-রচিত নাট্যগ্রন্থের নাম 'শারিপুত্র (বা শারদ্বতী পুত্র)-প্রকরণ'; বুদ্ধকর্তৃক শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নকে স্বীয় মতে দীক্ষিত করিবার কাহিনী এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

আর্যভট—প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ ও গণিতজ্ঞ (খ্রীঃ ৫ম শতকের শেষভাগ)। তদ্রচিত 'আর্যভটীয়,' 'দশগীতিকাসূত্র' ও 'আর্যাশত' নামক গ্রন্থগুলি পাওয়া যায়। তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, পৃথিবী গোলাকার এবং ইহা অক্ষরেখার উপরে আবর্তিত হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, রাহুর গ্রাসহেতু গ্রহণ হয়—

এই ধারণা অলীক; বস্তুতঃ চন্দ্র ও পৃথিবীর ছায়ার বিশেষ অবস্থানে ইহা ঘটে। 'আর্যসিদ্ধান্ত' (খ্রীঃ ১০ম শতক) নামক গ্রন্থের রচয়িতা আর্যভট স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

আশ্বলায়ন—সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকের পূর্বেকার লোক। একটি শ্রৌতসূত্র ও একটি গৃহ্যসূত্র আশ্বলায়নের নামাঙ্কিত।

কল্হণ (কহ্লণ)—খ্রীষ্টীয় ১২শ শতকের কাশ্মীরী লেখক। ইঁহার রচিত 'রাজতরঙ্গিণী' নামক কাব্যে কাশ্মীরের অনেক রাজার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত যে কয়খানি সংস্কৃত কাব্য আছে, তন্মধ্যে কল্হণের কাব্য শ্রেষ্ঠ।

কাত্যায়ন—বৈদিক ও পরবর্তীকালের সংস্কৃত সাহিত্যে এই নামটি প্রায়ই পাওয়া যায়। কাত্যায়নের নামাঙ্কিত শ্রৌতসূত্র ও শুল্বসূত্র আছে। তাহা ছাড়া, 'কাত্যায়ন-শ্রাদ্ধকল্প' বর্তমান। এতদ্ব্যতীত কাত্যায়ন-রচিত স্মৃতিরও সন্ধান পাওয়া যায়। পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'র কাত্যায়ন-(মতান্তরে বররুচি) প্রণীত বার্তিকসূত্র সমূহ ব্যাকরণ-শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ।

ক্ষীরস্বামী—'নামলিঙ্গানুশাসন' বা 'অমরকোষে'র প্রখ্যাত ও প্রাচীনতম টীকাকার। ইনি খ্রীষ্টীয় ১১শ শতকের শেষার্ধে সম্ভবতঃ মধ্যভারতে বাস করিতেন। তদ্রচিত টীকাতে তাঁহার নানা শাস্ত্রের সহিত পরিচয়ের প্রমাণ বিদ্যমান।

চরক—আয়ুর্বেদশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ও প্রাচীনতম গ্রন্থ 'চরক-সংহিতা'র রচয়িতা বা সংকলয়িতা। কিম্বদন্তী এই যে, চরক কুষাণরাজ কনিষ্কের (খ্রীষ্টীয় ১ম শতক) চিকিৎসক ছিলেন। 'চরক-সংহিতা'র কতক অংশ দৃঢবল নামক জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক সংযোজিত। 'চরক-সংহিতা' প্রাচীনতর গ্রন্থকার অগ্নিবেশের গ্রন্থের কতক অংশের পরিবর্তিত রূপ। চরক তদীয় গ্রন্থে ভারতীয় দর্শনের নানা শাখার সহিত স্বীয় গভীর ব্যুৎপত্তির স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন।

চার্বাক—লোকায়তিক বা জড়বাদীকে বুঝাইতে এই শব্দটি প্রযুক্ত হয়। কেহ

কেহ বলেন, চার্বাক নামক কোন ঋষি লোকায়তদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা; কালক্রমে ইঁহার মতাবলম্বী ব্যক্তিগণও এই নামে অভিহিত হইতে থাকে। চারু ও বাক্ এই শব্দ দুইটি দ্বারা চার্বাক শব্দ গঠিত—ইহা কাহারও কাহারও মত; অর্থাৎ সে-ই চার্বাক যাহার বাক্য আপাতমধুর কিন্তু বস্তুতঃ অসার। চার্বাক দর্শনের কোন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নাই। অন্যান্য কতক দর্শন-শাস্ত্রে ইহার সমালোচনা হইতে জানা যায় যে, এই মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী; তাঁহারা যাগ যজ্ঞ পরলোক প্রভৃতি মানেন না এবং প্রত্যক্ষ ছাড়া অপর কোন প্রমাণ স্বীকার করেন না।

দণ্ডী—আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৮ম শতকের আলঙ্কারিক দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ' নামক গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ ইঁহারই রচিত 'দশকুমারচরিত' কথা-শ্রেণীর গদ্যকাব্য। 'অবন্তিসুন্দরীকথা' নামক একটি গ্রন্থও, অনেকের মতে, দণ্ডি-রচিত।

পতঞ্জলি—পাণিনীর 'অষ্টাধ্যায়ী'র 'মহাভাষ্য' নামক প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ-প্রণেতা। তিনি আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের কোন কালে জীবিত ছিলেন। কোন কোন স্থলে তিনি শেষনাগ নামেও অভিহিত হইয়াছেন। যোগসূত্র-প্রণেতা পতঞ্জলি ও ইনি এক ব্যক্তি কিনা সেই সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয় নাই।

বৎসভট্টি—দশপুরে (=মান্দাসোর) সূর্যমন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে রচিত (৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) ৪৪টি শ্লোকাত্মক একটি প্রশস্তি ইঁহার নামাঙ্কিত। ইহাতে কবি কালিদাসের রচনার অনুকরণ করিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কাহারও কাহারও মতে, বৎসভট্টি 'রাবণবধ' বা 'ভট্টিকাব্য'-প্রণেতা ভট্টি হইতে অভিন্ন; কিন্তু, এই অনুমানের সমর্থনে কোন অকাট্য যুক্তি নাই।

বরাহমিহির—আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে কোন সময়ে ইনি জীবিত ছিলেন। সিদ্ধান্ত ও ফলিত জ্যোতিষ (Astronomy ও Astrology) এবং গণিতশাস্ত্রে ইনি খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার

রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'বৃহৎসংহিতা' বিখ্যাত গ্রন্থ। ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রকে তিনটি শাখায় বিভক্ত করিয়াছিলেন; যথা—তন্ত্র, হোরা ও সংহিতা। কিম্বদন্তী এই যে, জ্যোতির্বিদ্যায় অভিজ্ঞ খনা ছিলেন বরাহের পুত্রবধূ।

বাণ—বাণভট্ট ছিলেন খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকে স্থাণ্বীশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধনের আশ্রিত পণ্ডিত। কথিত আছে যে, বাল্যাবস্থায় মাতাপিতৃহীন বাণ কুসং... পড়িয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিবার পরে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে হর্ষবর্ধনের আদেশক্রমে তাঁহার সভায় যান এবং কালক্রমে সুকবি-খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত' যথাক্রমে উৎকৃষ্ট কথা ও আখ্যায়িকাশ্রেণীর গদ্যকাব্য। 'বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম্' 'কাদম্বরী রসজ্ঞানামাহারোঽপি ন রোচতে' প্রভৃতি উক্তিতে ভারতীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক বাণের প্রশংসা ব্যক্ত হইয়াছে।

বাৎস্যায়ন— সংস্কৃত সাহিত্যে এই নামের একাধিক ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 'কামসূত্র'-প্রণেতা বাৎস্যায়ন কোন্ কালের লোক তাহা নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা যায় না। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, ইনি কালিদাস-পূর্ব যুগের লেখক। কেহ কেহ মনে করেন, ইনি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে জীবিত ছিলেন। আবার, কাহারও কাহারও ধারণা যে তিনি ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে জীবিত ছিলেন; 'ন্যায়ভাষ্য'-প্রণেতা বাৎস্যায়ন স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

বিল্হণ— খ্রীষ্টীয় ১১শ-১২শ শতকের কাশ্মীরী কবি। যৌবনে তিনি নানা দেশ পর্যটন করিয়া কল্যাণরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্লের সভায় সাদরে অভ্যর্থিত হইয়া ঐ রাজার 'বিদ্যাপতি'-পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ঐ রাজার জীবনবৃত্তান্ত 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত' নামক কাব্যে বর্ণনা করেন। বিল্হণের 'চৌরপঞ্চাশিকা' বা 'চৌরীসুরতপঞ্চাশিকা' নামক কাব্যটিও বিখ্যাত; প্রণয়িণীর স্মৃতিতে প্রণয়ীর উচ্ছ্বাস এই কাব্যের বিষয়বস্তু। শেষোক্ত

কাব্যের নাম অনুসারে বিল্‌হণ চোরকবি নামেও অভিহিত হইয়াছেন। 'কর্ণসুন্দরী' নামক নাটিকাও বিল্‌হণের নামাঙ্কিত; ইহাতে চালুক্যরাজ কর্ণদেব ত্রৈলোক্যমল্ল এবং এক রাজকুমারীর প্রেম ও পরিণয় নাট্যরূপ লাভ করিয়াছে।

বিশাখদত্ত— আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৯ম শতকের পূর্ববর্তী নাট্যকার। ইঁহার রচিত 'মুদ্রারাক্ষস' নামক নাটক প্রসিদ্ধ। চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য কর্তৃক কূট রাজনীতির সাহায্যে বিধ্বস্ত নন্দরাজগণের বিশ্বস্ত মন্ত্রী রাক্ষসের স্বপক্ষে আনয়ন এই নাটকের মুখ্য বিষয়বস্তু। শুধু রাজনীতি অবলম্বনে রচিত এবং প্রায় নারী-চরিত্রবর্জিত এইরূপ নাটক সংস্কৃত সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

ভট্টনারায়ণ— আনুমানিক খ্রীঃ ৯ম শতকের নাট্যকার। কেহ কেহ মনে করেন যে, কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গরাজ আদিশূর কর্তৃক আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম ছিলেন ভট্টনারায়ণ; কিন্তু, ইহা কিম্বদন্তী মাত্র এবং ইহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। ভট্টনারায়ণ-রচিত 'বেণীসংহার' নামক নাটক প্রসিদ্ধ।

ভবভূতি— আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৭ম কি ৮ম শতকের নাট্যকার। তদ্রচিত নাট্যগ্রন্থ তিনটি—মালতীমাধব, মহাবীরচরিত ও উত্তররামচরিত। মালতী নাম্নী এক মন্ত্রিকন্যা ও মাধব নামক শিক্ষার্থীর প্রণয়-কাহিনী 'মালতীমাধবে'র বিষয়বস্তু এবং শেষোক্ত গ্রন্থ দুইটি রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। 'কারুণ্যং ভবভূতিরেব তনুতে'—এই উক্তিতে করুণরসের চিত্রণে ভবভূতির নিপুণতার প্রশংসা করা হইয়াছে। ভবভূতির গ্রন্থগুলিতে হাস্যরস বিরল।

ভর্তৃহরি— 'নীতিশতক', 'বৈরাগ্যশতক' ও 'শৃঙ্গারশতক'—এই তিনটি ভর্তৃহরির নামাঙ্কিত। 'বাক্যপদীয়' নামক ব্যাকরণগ্রন্থ ভর্তৃহরি-রচিত। কেহ কেহ মনে করেন, এই ব্যক্তির নামের অপভ্রংশই ভট্টি এবং 'ভট্টিকাব্য' ইঁহারই রচিত। ভর্তৃহরি আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকের লেখক।

ভারবি- ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী কবি ও 'কিরাতার্জুনীয়' নামক কাব্য-প্রণেতা। ভারবির রচনায় অর্থগৌরব ভারতে উচ্চপ্রশংসা লাভ করিয়াছে। 'নারিকেল ফল সম্মিতং বচো ভারবে' :—এই উক্তিতে ভারবির কাব্যের কঠিন বহিরাবরণ অর্থাৎ ভাষার কাঠিন্য সম্বন্ধে ভারতীয় সমালোচকের মত ব্যক্ত হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে এই কাব্যের অন্তর্নিহিত রসের ইঙ্গিতও করা হইয়াছে। আধুনিক সমালোচকগণের মতে, ভারবির কাব্য প্রয়াসপ্রসূতি ও অনেক স্থলে কৃত্রিমতাদোষযুক্ত।

ভোজ- ধারারাজ ভোজ সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ১১শ শতকের লোক। তাঁহার রচিত বিভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা আশীটিরও অধিক। তন্মধ্যে 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' ও 'শৃঙ্গারপ্রকাশ' নামক অলঙ্কারশাস্ত্রের গ্রন্থ দুইটি সুবিদিত। 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' নামে একখানি ব্যাকরণগ্রন্থও ভোজের নামাঙ্কিত। এতদ্ব্যতীত ভোজের নামে প্রচলিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিও উল্লেখযোগ্য :—সমরাঙ্গণসূত্রধার (প্রধানতঃ স্থাপত্য ও মূর্তিশিল্প বিষয়ক) ও রাজমার্তণ্ড (যোগসূত্রের টীকা)।

রাজশেখর— খ্রীষ্টীয় ৯ম-১০ম শতকের লেখক। ইঁহার 'কাব্যমীমাংসা' অলঙ্কারশাস্ত্রে প্রখ্যাত গ্রন্থ। রাজশেখর-রচিত কর্পূরমঞ্জরী নামক সট্টকজাতীয় নাট্যগ্রন্থটি সম্পূর্ণ প্রাকৃতে রচিত। 'বালরামায়ণ', 'বালভারত' ও 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা' রাজশেখর কর্তৃক সংস্কৃতে রচিত তিনটি নাট্যগ্রন্থ।

শূদ্রক— 'মৃচ্ছকটিক' নামক নাট্যগ্রন্থের প্রারম্ভে ইহার প্রণেতা শূদ্রক সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, তিনি ছিলেন নানাশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ রাজা এবং ১১০ বৎসর বয়সে তিনি অগ্নিতে আত্মাহুতি দেন। এই নামের কোন রাজা বা কোন ব্যক্তি মোটেই ছিল কিনা সেই বিষয়ে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতক পর্যন্ত নানা কালই 'মৃচ্ছকটিক'-এর

রচনাকাল বলিয়া বিভিন্ন পণ্ডিত কর্তৃক অনুমিত হইয়াছে। রাজার কাহিনীর পরিবর্তে সামাজিক জীবন অবলম্বনে রচিত হওয়ায় এই গ্রন্থটি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

সুবন্ধু— আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকের আদিভাগের লেখক এবং 'বাসবদত্তা' নামক কথাজাতীয় গদ্যকাব্য-রচয়িতা; 'বাসবদত্তা'তে বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ হইতে সুবন্ধুকে কেহ কেহ গুপ্তরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (খ্রীঃ ৪র্থ-৫ম শতক) সমকালীন বলিয়া মনে করেন। বাণভট্টের 'কাদম্বরী'তে 'বাসবদত্তা'র উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে, সুবন্ধু বাণের পূর্ববর্তী। রাজকুমার কন্দর্পকেতু এবং রাজকুমারী বাসবদত্তার প্রেমের কাহিনী এই গ্রন্থের উপজীব্য। পরম্পরাগত ভারতীয় সমালোচনায় সুবন্ধু বাণভট্টের সমকক্ষ লেখক।

হরিষেণ— সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি হরিষেণ-রচিত। এই প্রশস্তির রচনাকাল ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়। ইহাতে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু, সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি পদ্যে ও গদ্যে বর্ণিত হইয়াছে। হরিষেণের রচনা উৎকৃষ্ট কাব্যধর্মী।

হাল— ইঁহার নামাঙ্কিত 'সত্তসঈ' প্রাকৃত গীতিকাব্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইহা ৭০০ শ্লোকে রচিত। শ্লোকগুলির সবই হালের রচিত কিম্বা বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত সেই বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। হালের পরিচয় ও কাল অনিশ্চিত। কেহ কেহ মনে করেন, হাল খ্রীষ্টীয় ১ম বা ২য় শতকের সাতবাহন রাজা। কাহারও কাহারও মতে, দীর্ঘকাল প্রক্ষেপের ফলে 'সত্তসঈ'র পদগুলি খ্রীষ্টীয় তৃতীয় হইতে পঞ্চম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কালসীমার মধ্যে রচিত হইয়াছিল। হালের কাব্য গোবর্ধনের 'আর্যাসপ্তশতী' ও অন্যান্য অনেক সংস্কৃত গীতিকাব্যের আদর্শ।

(ঘ) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় তারিখ

[যে তারিখগুলির পশ্চাতে বিশেষজ্ঞগণের যুক্তি আছে, ইহাতে সেইগুলিই শুধু দেওয়া হইল ; গ্রন্থকারদের মতামত ইহাতে নাই]

তারিখ	বিষয়
খ্রীষ্টপূর্বাব্দ	
আনুমানিক ২৫০০—২০০০ (আনুমানিক ২৫০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে আর্য-আক্রমণ বা অভিযান আরম্ভ হয়—*The Camb. Hist. of India*. Vol 1. পৃঃ ৬৪০)	ঋগ্বেদের প্রাচীন মন্ত্রাংশ (ছন্দযুগ) [ম্যাক্সমূলারের মতে ১২০০—১০০০ খ্রীঃ পূঃ ; খ্রীঃ পূঃ ১৪০০ অব্দ—*India* 1956]
২০০০—১৫০০	ঋগ্বেদের অর্বাচীন অংশ ও অপর বেদত্রয় (মন্ত্রযুগ)
১৫০০—১০০০	ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক
১২০০—১০০০	কৌরব ও পাণ্ডবের যুদ্ধ (Rapson) [আঃ ১৪০০ খ্রীঃ পূঃ, দ্রষ্টব্য Vedic Age, পৃঃ ৩০০]
১০০০—৬০০	উপনিষদ্
৬০০—২০০	সূত্রযুগ : বেদাঙ্গ
৬৫০—৬০০ পাণিনি	কাহারও কাহারও মতে ৮০০—৭০০। পাণিনির কাল খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম-চতুর্থ শতক বলিয়া অনেক আধুনিক পণ্ডিত মনে করেন।
৫৬৬—৪৮৬ বুদ্ধদেবের আবির্ভাব, ধর্মপ্রচার ও তিরোভাব	
২০০—১৫০ পতঞ্জলি (মহাভাষ্যকার)	শুঙ্গবংশের রাজা পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক
৫৬ বিক্রমাব্দের সূচনা	

খ্রীষ্টাব্দ

প্রথম শতকের শেষপাদ	কণিকের রাজত্ব (অশ্বঘোষের কাল)
আ: ১৫০—১৫১	রুদ্রদামনের গীর্ণার প্রশস্তি
৩২০—৫৬৯	গুপ্তরাজত্বের যুগ
৩৭৬ (মতান্তরে ৩৮০ —৪১৫)	গুপ্তরাজ বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকাল (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত) [ইহাই কালিদাসের কাল বলিয়া অনেকে মনে করেন]
৬০৬—৬৪৭	থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধনের রাজ্যকাল (ইহাই বাণভট্টের কাল)
৬৩৪	আইহোল প্রশস্তির তারিখ [ইহাতে কালিদাস ও ভারবির উল্লেখ আছে]
১১৭৮	বঙ্গের রাজা লক্ষ্মণসেনের সিংহাসনারোহণ [জয়দেব ইহার সভাকবি]

(ঙ) খ্রীষ্টোত্তর যুগের প্রধান প্রধান সংস্কৃত গ্রন্থকার ও গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা

খ্রীষ্টীয় শতক	পদ্যকাব্য	গদ্যকাব্য	চম্পূকাব্য	কোষকাব্য	দৃশ্যকাব্য	লেখ	গল্প	মন্তব্য
১	অশ্বঘোষ (১) বুদ্ধচরিত (২) সৌন্দরনন্দ (৩) গণ্ডীস্তোত্র গাথা	—	—	—	অশ্বঘোষ শারিপুত্র (বা শারদ্বতীপুত্র) প্রকরণ	—	—	—
২	—	—	—	—	—	গীর্ণার (আঃ ১৫০-১৫১ খ্রীষ্টাব্দ	—	—
৩	—	—	—	—	—		—	—
৪	—	—	—	—	ভাস রামায়ণমূলক ২ মহাভারতমূলক ৭ উদয়নের কাহিনী অবলম্বনে ২ অজ্ঞাতমূল ২	হরিষেণের এলাহাবাদ প্রশস্তি ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ	—	ভাস কালিদাসের পূর্ববর্তী, কিন্তু ঠিক কোন্ কালের লেখক তাহা জানা যায় না। উদয়নের কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'স্বপ্নবাসবদত্তা' তাঁহাদের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থ।
৫	কালিদাস (১) রঘুবংশ (২) কুমারসম্ভব (৩) মেঘদূত ভট্টি (আঃ ৫ম শতক) —ভট্টিকাব্য	—	—	—	কালিদাস ১ অভিজ্ঞান-শকুন্তলা ২) বিক্রমোর্বশীয় (৩) মালবিকাগ্নিমিত্র	বৎসভট্টির মন্দাসোর লিপি ৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দ	পঞ্চতন্ত্র আঃ ৫ম শতক	কালিদাসের সন্দিগ্ধ গ্রন্থাবলীর উল্লেখ এখানে করা হইল না।

খ্রীষ্টীয় শতক	পদ্যকাব্য	গদ্যকাব্য	চম্পূকাব্য	কোষকাব্য	দৃশ্যকাব্য	লেখ	গল্প	মন্তব্য
৬	ভারবি (আঃ ষষ্ঠশতক) -কিরাতার্জুনীয় কুমারদাস -জানকীহরণ	—	—	—	শূদ্রক-মৃচ্ছকটিক	—	—	খ্রীঃপূঃ ২য় শতক হইতে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত নানা কালই বিভিন্ন পণ্ডিত শূদ্রকের কাল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।
৭	ভর্তৃহরি (১) নীতিশতক (২) বৈরাগ্যশতক (৩) শৃঙ্গারশতক মাঘ (আঃ ৭ম শতক) -শিশুপালবধ	বাণভট্ট (১) কাদম্বরী (২) হর্ষচরিত সুবন্ধু (আঃ ৭ম শতক)-বাসবদত্তা	—	—	শ্রীহর্ষ (১) রত্নাবলী (২) নাগানন্দ (৩) প্রিয়দর্শিকা ভবভূতি (১) উত্তররামচরিত (২) মহাবীরচরিত (৩) মালতীমাধব	আইহোল (৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দ)	—	ভবভূতির কাল আনুমানিক সপ্তম শতক।
৮	অমরু (আঃ ৮ম শতক) অমরুশতক	দণ্ডী (আঃ ৮ম শতক, দশকুমার-চরিত	—	—	—	—	—	—
৯	—	—	—	—	বিশাখদত্ত -মুদ্রারাক্ষস ভট্টনারায়ণ -বেণীসংহার	—	বুধস্বামী (আঃ ৯ম শতক) -বৃহৎকথা-শ্লোকসংগ্রহ	বিশাখদত্তের কাল কাহারও কাহারও মতে ৭ম শতক; কেহ কেহ মনে করেন তিনি ৪র্থ-৫ম শতকের লেখক। ভট্টনারায়ণ আনুমানিক ৯ম শতকে জীবিত ছিলেন
১০	—	—	ত্রিবিক্রম বা সিংহাদিত্য—নলচম্পূ সোমপ্রভ সূরি-যশস্তিলকচম্পূ	—	ক্ষেমীশ্বর চণ্ড-কৌশিক। মুরারি-অনর্ঘরাঘব। রাজ-শেখর-বালরামায়ণ, বালভারত	—	—	—

খ্রীষ্টীয় শতক	পদ্যকাব্য	গদ্যকাব্য	চম্পূকাব্য	কোষকাব্য	দৃশ্যকাব্য	লেখ	গল্প	মন্তব্য
১১	পদ্মগুপ্ত বা পরিমল -নবসাহসাঙ্কচরিত বিলহণ -বিক্রমাঙ্কদেবচরিত সন্ধ্যাকর নন্দী -রামচরিত	—	—	—	কৃষ্ণ মিশ্র-প্রবোধচন্দ্রোদয়। দামোদর মিশ্র-মহানাটক। বিলহণ-কর্ণসুন্দরী	—	ক্ষেমেন্দ্র -বৃহৎকথামঞ্জরী সোমদেব -কথাসরিৎসাগর	—
১২	শ্রীহর্ষ -নৈষধচরিত কলহণ -রাজতরঙ্গিণী	—	—	'বিদ্যাকর -সুভাষিত -রত্নকোষ	—	—	চিন্তামণি ভট্ট ('আঃ ১২শ শতক') -'শুকসপ্ততি'র বর্তিত রূপের রচয়িতা	—
১৩	গোবর্ধন -আর্যাসপ্তশতী জয়দেব -গীতগোবিন্দ	—	—	শ্রীধরদাস -সদুক্তিকর্ণামৃত	জয়দেব -প্রসন্নরাঘব	—	'সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা' ('আঃ ১৩শ শতক)	—

(চ) বেদের রচনাকাল

আস্তিক মত

বেদের রচনাকাল নিশ্চিতরূপে স্থির করা অসম্ভব। কোন্‌ সুপ্রাচীনকালে ইহার সূচনা হইয়াছিল কে বলিতে পারে? ভারতীয় বৈদিক সম্প্রদায়ের মতে তো বেদ তথা বৈদিক সাহিত্য অনাদি ও অপৌরুষেয়—'মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্‌'।[1] প্রাচীন মত যাহাই হউক না কেন, আমরা এখানে বেদকে মানুষেরই রচনা অথচ অতিপ্রাচীন সৃষ্টি বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য গবেষণামূলক আলোচনায় বেদের রচনাকাল মোটামুটি কিরূপ স্থির হইয়াছে, তাহাই এখানে বলা হইবে।

ম্যাক্সমূলার

আমরা দেখিয়াছি, বৈদিক সাহিত্যের আদিম গ্রন্থ ঋগ্বেদ। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারই সর্বপ্রথম এই ঋগ্বেদের রচনাকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। অন্যান্য সংহিতা ছাড়িয়া ঋক্‌-সংহিতার কাল লইয়া চেষ্টা আরম্ভ হইল কেন, প্রশ্ন উঠিতে পারে। তাহার উত্তরে বলিতে হয়, যদি বৈদিক সাহিত্যের আদিম রচনা ঋক্‌-সংহিতার কাল নিশ্চিতভাবে কিছু স্থির করা যায় তাহা হইলে পরবর্তী কালের বৈদিক সংহিতা-গুলির এবং ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্‌ ও সূত্রযুগের গ্রন্থগুলির কাল নির্ণয় আপনা হইতেই অনেক সহজ হইয়া পড়ে। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারও এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই সর্বপ্রথমে ঋগ্বেদ রচনার কাল নির্ণয়ে ব্যস্ত হন।

ঋক্‌-সংহিতার কাল নির্ণয়ের আবশ্যকতা কি?

সূত্রযুগ খ্রীঃ পূঃ ৬০০-২০০ অব্দ

ম্যাক্সমূলার সূত্রগ্রন্থগুলিকে (বেদাঙ্গ-সাহিত্যকে) আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৬০০-২০০ অব্দের মধ্যে রচিত বলিয়া মনে করেন। এগুলির মধ্যে কতকগুলি প্রাক্‌-বুদ্ধযুগের, কিছু বুদ্ধের সমসাময়িক; বাকীগুলি বুদ্ধোত্তরযুগের বলিয়া তাঁহার ধারণা। এই সূত্রসাহিত্য আবার ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি হইতে উদ্ভূত; কারণ ব্রাহ্মণ সাহিত্য ও গ্রন্থ আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে বেদাঙ্গ সাহিত্যের বীজ সেখানেই উপ্ত। এই বিশাল ব্রাহ্মণ সাহিত্য বলিতে কিন্তু ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্‌ সব কিছুকেই বুঝাইবে; কেননা ব্রাহ্মণেরই শেষভাগে আরণ্যক এবং আরণ্যকের

১। সকল আস্তিক দর্শন বেদের অনাদিত্ব ও অপৌরুষেয়ত্বকে সসম্মানে মানিয়া লইয়াছে।

শেষে উপনিষদের আলোচনা রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ সকলেই বেদ-ব্যাখ্যা করিয়াছে—কেবল দৃষ্টি-ভঙ্গীর বিভিন্নতা আছে মাত্র।

ব্রাহ্মণ সাহিত্যের কাল
খ্রীঃ পূঃ ৮০০-৬০০ অব্দ

ইহাদের মূল 'সংহিতা'গুলি। এই বিশাল ব্রাহ্মণ সাহিত্যের জন্য খুব কমপক্ষে অন্তত ২০০ বৎসর সময় দিতেই হয়। সেজন্য ব্রাহ্মণ সাহিত্যের রচনার সময় ম্যাক্সমূলার খ্রীঃ পূঃ ৮০০-৬০০ অব্দ বলিয়া মনে করিলেন। এই ব্রাহ্মণ সাহিত্য যাহাদের ব্যাখ্যা করিয়াছে সেই বেদসংহিতাগুলি নিশ্চয়ই তাহাদের রচনার পূর্বে রচিত বা দৃষ্ট; সেজন্য এই গদ্য, পদ্য ও গানের সমষ্টি বেদসংহিতাগুলির রচনার জন্য কমপক্ষে আরও দুইশত বৎসর ধরা হইল। এইরূপে তাঁহার মতে বেদসংহিতাগুলি আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১০০০-৮০০ অব্দে রচিত। কিন্তু এই সংহিতাগুলির সংস্থাপন বা রচনার পূর্বেও নিশ্চয়ই বহুকাল অতীত হইয়াছে

বেদ সংহিতার কাল
১০০০-৮০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দ

যখন ইহারা পবিত্র যজ্ঞমূলক বলিয়া পরিগণিত হয় নাই, যখন ইহাদের অপরিসীম প্রভাব আর্য-সমাজে অনুভূত হয় নাই—অর্থাৎ এমন এক সময় নিশ্চয়ই ছিল যেকালে এই সংহিতাগুলি স্তূপীভূত হয় নাই; লোক মুখে বা ঋষিগোষ্ঠীর মুখে মুখে তাহারা চলিয়া আসিয়াছে। এই কালে ঐ সংহিতাগুলি লোক-প্রিয় ধর্মশাস্ত্র বলিয়াই সম্মান পাইয়াছে। এই সময়কে ম্যাক্সমূলার

ঋক্-সংহিতার কাল আনুমানিক
১২০০-১০০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দ

খ্রীঃ পূঃ ১২০০-১০০০ অব্দ বলিয়া মনে করেন; আর তাঁহার মতে ঋক্-সংহিতার আনুমানিক ও সর্বাপেক্ষা কম বলিয়া নির্দিষ্ট সময় উহাকেই বলা যায়। ম্যাক্সমূলার অবশ্য সংহিতাগুলির রচনায় দুইটি স্তরের বা যুগের উল্লেখ করিয়াছেন—মন্ত্রযুগ এবং ছন্দোযুগ; কিন্তু সে আলোচনা এখানে বাহুল্যমাত্র।

এই মত বিদ্বৎসমাজে প্রচারিত হইবার পর বহুকাল ধরিয়া এই ধারণাই

ম্যাক্সমূলার ঋগ্বেদের কোনো ধরাবাঁধা সময় নির্দেশ করেন নাই

বলবৎ রহিল যে ম্যাক্সমূলার যে ১২০০-১০০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দ বলিয়া ঋগ্বেদের রচনাকাল নির্দেশ করিয়াছেন, উহাই অপরিবর্তনীয় ও সুনির্দিষ্ট সময়। ম্যাক্সমূলার কিন্তু সত্যই ঋগ্বেদের কোনো ধরাবাঁধা রচনাকাল নির্দেশ করেন নাই। ভিণ্টারনিৎস্ দেখাইয়াছেন যে ম্যাক্সমূলারের

মতে ঋগ্বেদের রচনাকালের উহাই "minimum date" যাহা স্থির করা চলে। উহার ঠিক কত যুগ বা বৎসর আগে ঋগ্বেদ তথা অন্যান্য বৈদিক সাহিত্য রচিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে তিনি সুস্পষ্টভাবে কিছু জানেন না বা বলিতে পারেন না—ম্যাক্সমূলার ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

ইহার দীর্ঘকাল পরে ভারতের লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ও জার্মানীর সুবিখ্যাত মনীষী প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ জ্যাকোবি (Jacobi) পৃথক্ পৃথক্ভাবে প্রায় একই সময়ে ঋগ্বেদ রচনার কাল স্থির করিতে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা উভয়েই কিন্তু স্ব স্ব প্রথায় স্বাধীনভাবে এই বিষয়ে চিন্তা করিতে থাকেন। উভয়েরই ধারণা ছিল যে বেদের কাল ম্যাক্সমূলারের তথাকথিত নির্দিষ্ট সময়ের আরও বহু আগে। ফলে উভয়ে বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত জ্যোতিষিক গণনার সাহায্যে বেদের কাল স্থির করেন। শ্রদ্ধেয় তিলকের মতে বৈদিক সাহিত্যের কোনো কোনো অংশ (বিশেষত ঋগ্বেদ) খ্রীঃ পূঃ ৬০০০ অব্দে রচিত ; আর ঋগ্বেদের রচনাকাল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৬০০০-৪৫০০ অব্দ। অপর পক্ষে জ্যাকোবির মতে বৈদিক সংস্কৃতির প্রারম্ভ সূচিত হইয়াছে খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০ অব্দে এবং ঋগ্বেদের রচনাকাল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০-২৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

লোকমান্য তিলক ও জ্যাকোবির মত

জ্যোতিষিক গণনায় আরও একটি সুফল পাওয়া গিয়াছে। গৃহ্যসূত্রগুলিতে উল্লিখিত একটি প্রাচীন হিন্দুবিবাহপ্রথা 'ধ্রুব' নামক একটি তারার (Polar Star) উল্লেখ করিয়াছে। জ্যাকোবির ধারণা ঋগ্বেদীয় সভ্যতা এই ধ্রুবতারার আবির্ভাবেরও আগে ছিল ; অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ২৭৮০ অব্দে এই ধ্রুবতারাকে প্রথম দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা চিন্তা করিয়া জ্যাকোবি ঠিক করিলেন যে ঋগ্বেদ খ্রীঃ পূঃ ৩৫০০-৩০০০ অব্দের মধ্যে রচিত বলাই সংগত।

ধ্রুবতারার আবির্ভাবের পূর্বে ঋগ্বেদ রচিত

আশ্চর্যের বিষয়, আজও কেহ তিলক ও জ্যাকোবির জ্যোতিষিক এবং গাণিতিক বিচারকে খণ্ডন করিতে পারেন নাই। তবু তাঁহাদের দ্বারা উপস্থাপিত সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করিয়া বেদের কাল বিচারের পুনঃপ্রচেষ্টা বহুবার চলিয়াছে, আজও চলিতেছে।

কিছুদিন পূর্বে বি. ভি. কে. আয়ার পুনরায় জ্যোতিষিক গণনা ও

উপাদানের সাহায্যে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ সাহিত্য আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২৩০০—২০০০ অব্দে রচিত। ফলে ঋগ্বেদের রচনাকাল তাঁহারই মতে দাঁড়ায় আনুমানিক ৪৫০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দ।

বি. জি. কে. আয়ারের মত

অধ্যাপক ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাশ যে ভূতাত্ত্বিক সাক্ষ্য প্রমাণ সমেত উপস্থাপিত করিয়াছেন, ভিণ্টারনিৎস্ তাহাকে কিছুতেই সমর্থন করেন নাই। অধ্যাপক দাশের মতে ঋগ্বেদ রচনায় দুইটি স্তর দেখা যায়; একটি স্তরে ঋগ্বেদ যে ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক পরিচয় বহন করিতেছে তাহাতে গণ্ডোয়ানা মহাদেশের ধারণা আছে। হিমালয় পর্বতমালা এখন যেখানে বিরাজমান, সেখানে তখন ছিল বিশাল সমুদ্র। দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া তখন এক বিরাট ভূখণ্ডের মধ্যে ছিল; উহাদের মধ্যে কোনো সমুদ্রের ব্যবধান ছিল না। ঋগ্বেদের দ্বিতীয় স্তরে (অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের) হিমালয়, গঙ্গা, যমুনা, মুজবৎ প্রভৃতির উল্লেখ দেখি; মূল প্রাচীনতর অংশে তাহা নাই। এই দুই স্তরের রচনায় বহু সহস্র বৎসরের ব্যবধান। ডঃ দাশ সুপণ্ডিত এইচ. জি. ওয়েল্‌সের প্রমাণ দাখিল করিয়া ঋগ্বেদের রচনাকালের প্রারম্ভ খৃঃ পূঃ ১৬০০০ অব্দ বলিয়াছেন।

অবিনাশচন্দ্র দাশ

ভিণ্টারনিৎস্ উত্তরে বলিলেন যে ঐ সুপ্রাচীন যুগে ভূত্বকের পরিবর্তনের সময় মানুষ আদৌ বাঁচিয়া ছিল কিনা সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে; আর বেদ তো মানুষেরই রচনা; অতএব মানুষ না থাকিলে তৎকর্তৃক সৃষ্ট গ্রন্থ থাকিবে কি করিয়া? আর, এত সুদীর্ঘকালের মধ্যে ঋগ্বেদের ভাষার কি এতটুকুও পরিবর্তন ঘটিত না? ঋগ্বেদের সূক্তগুলিতে ভারতীয় জীবনের আদিম-যুগের যে ছাপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার রীতিনীতি, শিক্ষা, সমাজব্যবস্থা প্রভৃতির—তাহার সংগে ইদানীং প্রচলিত রীতিনীতি ও ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার তো কোনো মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। মহাভারত, রামায়ণ ও ক্ল্যাসিক্যাল যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের সংগেও তাহাদের মিল যথেষ্ট।

অবিনাশচন্দ্রের সমালোচনায় ভিণ্টারনিৎস্

তবুও বৈদিকসাহিত্যের সকল গ্রন্থ বা রচনার মধ্যে ঋগ্বেদের সৃষ্টি যে সর্বপ্রথম হইয়াছিল, তাহা অবিসংবাদিত। ইহার প্রমাণ মিলিবে সূক্তগুলির ভাষা, ছন্দ এবং স্বরাদি প্রক্রিয়া হইতে, তৎকালীন ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা বিচার করিলে। এছাড়া সত্যই তো ঋগ্বেদসংহিতা এককালের বা একজনের লেখা নয়। সূক্তগুলির প্রাচীনতম অংশের প্রারম্ভ হইতে ঋক্‌সংহিতার সংকলনকালের সমাপ্তির মধ্যে বহু শতাব্দীর ব্যবধান ঘটিয়াছে। তবুও জোর করিয়া বলা যায় না যে ঋগ্বেদের সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন রচনাংশ ভারতীয় সাহিত্যের সকল সৃষ্টি অপেক্ষা প্রাচীনতর। উদাহরণ স্বরূপ অথর্ব-সংহিতা ও সামসংহিতার popular ও primitive অংশগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ঋগ্বেদ বৈদিকসাহিত্যের সর্বপ্রথম রচনা

তবুও মোটামুটি বলা চলে যে ঋগ্বেদ পরবর্তীকালের সবকিছু সাহিত্যিক সৃষ্টিরই উৎস; কিন্তু ঋগ্বেদের আলোচ্য বিষয়ের বীজ তদপেক্ষা প্রাচীনতর কোনো গ্রন্থ বা সৃষ্টিতে মিলিবে না। লুড্‌উইগের এই মত সর্বাংশে সমর্থনযোগ্য। অন্যান্য সকল সংহিতাই সংকলনকালের দিক্ হইতে ঋক্‌সংহিতা সংকলনের পরে—ইহা সুনিশ্চিত। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্‌গুলি সাধারণভাবে সংহিতাযুগের পরে রচিত। ঋক্‌সংহিতা এবং অন্যান্য সংহিতার রচনাকালের মধ্যে যেমন বহু শতাব্দীর ব্যবধান, সংহিতা ও ব্রাহ্মণযুগের মধ্যেও তাহাই। উপনিষদ্‌গুলিই ত বিভিন্ন শতাব্দীতে, বিভিন্নকালে রচিত হইয়াছে। পাণিনির পূর্ববর্তী যাস্ক—ইনিই নিরুক্তকার এবং বেদের প্রথম ব্যাখ্যাতা বলিয়া আমরা তাহাকে জানি। এই যাস্কই আবার তাঁহারও পূর্ববর্তী কমপক্ষে সতেরজন ব্যাখ্যাকারের নাম তাঁহার গ্রন্থে করিয়াছেন। যদি ঋগ্বেদের কাল খ্রীঃ পূঃ ১২০০ অব্দ ধরা হয়, তাহা হইলে মাত্র ৭০০।৮০০ বৎসর বাকী থাকে সমগ্র বৈদিকসাহিত্যের সকল শাখার বিশাল সৃষ্টি ও তাহাদের বিবর্তনের জন্য। ভিণ্টারনিৎস্ সেজন্য সংক্ষেপে ম্যাক্সমূলারের নির্দিষ্ট কালের দ্বিগুণ সময় ঋগ্বেদের জন্য নির্ধারিত করিয়াছেন (অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ২৫০০—২০০০ অব্দ)। ইহা বলিলে আরও সুসংগত হয় যে বৈদিকসাহিত্যের

লুড্‌উইগের মতে

ভিণ্টারনিৎসের মতে ঋগ্বেদ আঃ খ্রীঃ পূঃ ২৫০০—২০০০ অব্দের মধ্যে রচিত

প্রারম্ভ কোনো এক সুদূর স্মরণাতীত ও অজ্ঞাত অতীতে; তবে তাহার শেষ পরিণতি খ্রীষ্ট পূর্ব অষ্টম শতকেই ঘটিয়াছে।" (ভিণ্টারনিৎস্)[১]

ভাষাতাত্ত্বিক ও দার্শনিকগণের মত যে কি তাহা পূর্বেই প্রসংগত বলিয়াছি।[২]

বটকৃষ্ণ ঘোষ, ম্যাক্‌ডোনেল, ঘাটে

এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। ডঃ বটকৃষ্ণ ঘোষের মতে বেদের কাল (বিশেষতঃ ঋগ্বেদের) খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দ। ম্যাকডোনেল আরও কম বলিয়াছেন। অধ্যাপক ঘাটের মতে সাতসূক্তে (ঋ. ২. ১২) বেদের কাল সম্পর্কে ইঙ্গিত আছে এইস্থলে—"চত্বারিংশ্যাং শরদ্যন্ববিন্দৎ।"[৩]

হুইট্‌নে

উপসংহারে বলিতে পারি হুইট্‌নের কথা—"সাহিত্যিক ইতিহাসে যে সব শলাকা (pins) বিদ্ধ করা হয় উহাদের বারবার তুলিয়া লাগাইতে হয়। বৈদিকসাহিত্যের কাল নির্ণয়ের ব্যাপারে সব ক্ষেত্রেই এই সত্য আজও সমানভাবেই প্রযোজ্য।" অধ্যাপক

পুশলকর, দেশমুখ— ঋগ্বেদ মহেঞ্জোদারো সভ্যতারও পূর্বে

পুশলকর ও পি. এস্. দেশমুখ মনে করেন যে ঋগ্বেদ মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা সভ্যতারও পূর্ববর্তী কালের রচনা। হরপ্পার উল্লেখ ঋগ্বেদে[৪] একস্থলে আছে, ইহাও তাঁহারা দেখাইয়াছেন।

১। *A History of Indian Literature*, Vol. I, p. 300, 310.

২। সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা, ১ম ভাগ, পৃঃ ৬।

৩। দ্রঃ V. S. Ghate—Lectures on the Rigveda.

৪। দ্রঃ Vedic Index, Vol. II, Macdonell & Keith, "হরিযূপীয়া" দ্র, ৬ষ্ঠ মণ্ডল, ২৭ অনুবাক, ৪র্থ সূক্ত, ৫ম ঋক্। Advanced History of India, p. 26, "হরিযূপীয়া নাম কাটিয়ারী ভাটিয়ালী বা" (পাঞ্জাব); Adv. Hist. of India, p. 22.

পরিশিষ্ট 'ছ'

বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি

পৃথিবীর সভ্যতার প্রথম অরুণোদয়ের পরিচয় মিলিবে বৈদিক সাহিত্যে। যখন পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ ও জাতি অজ্ঞানের তমিস্রায় ঘুমঘোরে অচেতন তখন জ্ঞানের দীপশিখা এই ভারতই একমাত্র জ্বালাইয়াছিল। সেজন্যই দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে যথাক্রমে ধ্বনিত হইয়াছে—

পৃথিবীর আদিম সভ্যতা

"দিয়াছ মানবে জগৎ জননী দর্শন উপনিষদে দীক্ষা।
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প কর্ম ভক্তি ধর্ম শিক্ষা॥"

এবং

"প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে
প্রথম সামরব তব তপোবনে
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞান ও ধর্ম কত কাব্য কাহিনী।"

সত্যই ভাবিতে আশ্চর্য লাগে যে সেই সুপ্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগেও আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি কত উন্নত ছিল এবং আমরা আজও জ্ঞানে অজ্ঞানে সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী ও ধারক।

পূর্বেই বলিয়াছি যে 'বৈদিক যুগে'র কোনো প্রকার আলোচনা করিতে গেলে ঋগ্বেদকে বাদ দিয়া কিছুই করা যায় না এবং তাহাকে লইয়া আরম্ভ করিতেই হইবে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোচনাতেও এই সাধারণ সত্যের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। অতএব সর্বপ্রথম ঋগ্বেদের যুগে আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির চিত্র কিরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহারই বিশ্লেষণ করিব।

ঋগ্বেদের যুগে আর্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতি

এই যুগের ধর্ম বহুদেবতাবাদী না একদেবতাবাদী ছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা উহা ঠিক যে একদেবতাবাদী ছিল তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি না,—যদিও হিরণ্যগর্ভকেই এখানে সর্বোচ্চ দেবতা বা অধিদেব[1] বলা হইয়াছে। এই বেদে সর্বসমেত মোট তেত্রিশজন দেবতার কল্পনা করা হইয়াছে। পূজ্য দেবগণ সকলেই সমান শ্রদ্ধাভাজন এবং প্রত্যেককেই পালাক্রমে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।

এই যুগের ধর্ম ও তাহার স্বরূপ

১। ঋগ্বেদ. ১০.১২১।

ম্যাক্সমূলার বেদের এই পূজাপদ্ধতিকে হেনোথিইজ্‌ম্‌ বা ক্যাথেনোথিইজ্‌ম্‌ বলিতে চাহিয়াছেন। বৈদিক দেবগণ প্রকৃতির শক্তি এবং অংশবিশেষ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। পরবর্তীকালে এই প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ও শক্তিনিচয়কেই এক একটি দেবতারূপে কল্পনা করা হইয়াছিল।

ঋগ্বেদের যুগে ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে জানা গিয়াছে যে এইকালে ইন্দো-আর্যগণ পঞ্চনদের চতুষ্পার্শ্বে (বর্তমান পাঞ্জাব) দখল করিয়াছেন।

ভৌগোলিক পরিচয়

ঋগ্বেদে প্রায় ২৫টি নদীর উল্লেখ আছে এবং তাহারা প্রায় সকলেই সিন্ধু নদীর শাখা। ইহাদের মধ্যে পাঁচটি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। সিন্ধু নদীর নাম প্রায়ই উল্লিখিত হইয়াছে। "সপ্তসিন্ধবঃ" বা সাতটি নদীর উল্লেখও প্রায়ই পাওয়া যায়। দৃষদ্বতী, সরস্বতী, সরযূ ও যমুনা প্রভৃতি উল্লিখিত নদী। 'গঙ্গা'ও এই যুগের বিশেষ পরিচিত নদী, তবে তাহার উল্লেখ ঋগ্বেদ রচনার শেষ স্তরেই পাওয়া যায়।[1] পর্বতগণের[2] উল্লেখও প্রায়ই মেলে। হিমালয়[3] সম্পর্কে সোজাসুজি উল্লেখও একস্থলে করা হইয়াছে। মূজবৎ[4] নামে তাহার একটি শৃঙ্গকে সোমের প্রাপ্তিস্থল বলা হইয়াছে। কিন্তু ঋগ্বেদে বিন্ধ্যপর্বতমালা, নর্মদা নদী প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ প্রাকৃতিক অবস্থানগুলির কোন উল্লেখ দেখি না।

ঋগ্বেদে প্রায় ২০টি সূক্ত ধর্মসম্পর্কবিহীন লৌকিক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছে। তাহাদের আলোচনা বিশেষ কৌতুকপ্রদ ও গুরুত্বপূর্ণ; কারণ

লৌকিক বিষয়ের আলোচনা

ঐগুলিতে মানবমন, তাহার চরিত্র, হাসিকান্না, ভাব, আবেগ উচ্ছ্বাস, তাহার জীবনের বিভিন্ন দিক্ ও পরিবেশের কথা আলোচিত হইয়াছে। অক্ষসূক্ত[5] আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে দ্যূতাসক্তের কাতর ও তিক্ত দুঃখময় অভিজ্ঞতার কাহিনী এবং নিখুঁতভাবে দ্যূতের সুগভীর আকর্ষণ ও তাহার শোচনীয় পরিণতির কথা ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ধর্মের সহিত সম্পর্কশূন্য সূক্তগুলির মধ্যে সংবাদসূক্তগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করা চলে—যম এবং যমী সংবাদ[6], পুরূরবা

১। ঋগ্বেদ ১০.৭৫.৫ · ১.১১৬.১৯; ৩.৫৮.৬ ২। ঋ. ২.১২ ৩। ঐ ১০.১২১
৪। ঐ ১০,৩৪ ৫। ১০.৩৪, ৬। ১০,১০।

উর্বশী সংবাদ[১] এবং বৃষাকপি সূক্ত[২]। সুপ্রসিদ্ধ বিবাহসূক্ত[৩], ভেকসূক্ত[৪] এবং শ্মাশানিক সূক্তগুলিতে[৫] মুখরোচক বৈচিত্র্য পরিবেশিত হইয়াছে।

ধর্মীয় এবং বাস্তব কাব্যরচনার মাঝামাঝি স্থান দখল করিয়া আছে দানস্তুতিগুলি (অর্থাৎ দানবীর রাজপুত্রগণ ও পৃষ্ঠপোষকগণের প্রশংসামূলক স্তব-স্তুতি; এই দানবীরগণ যাগযজ্ঞের বিশেষ সমর্থক ছিলেন)। এই দান-স্তুতিগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেকখানি।

সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবন

ঋগ্বেদীয় সূক্তগুলিতে আমরা ঐযুগে ইন্দো-আর্যজাতির সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাই। আর্যগণ এ সময় ধীরে ধীরে পাঞ্জাবের পূর্বদিকে অগ্রসর হইতেছেন। এ অংশটি নিঃসন্দেহেই চাষবাসের অন্তর্গত ছিল, কেননা সূক্তগুলিতেই আমরা কৃষি সম্পর্কে[৬] নির্ভুল উল্লেখ দেখিয়াছি। বাড়ীগুলি অধিকাংশই মাটির তৈয়ারী ছিল। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে 'ইষ্টক' বা ইটের উল্লেখ আছে। ত্রিতল বাটিকা এবং সহস্রস্তম্ভযুক্ত[৭] বিশাল রাজবাড়ীও সেযুগে ছিল—ঋগ্বেদে ইহাদের উল্লেখ বহুস্থলেই মিলিবে। গ্রাম এবং সুরক্ষিত সহর বা পুর্—এর কথা প্রায়ই বলা হইয়াছে। রাজা দিবোদাসের সাহায্যার্থে ইন্দ্র সহস্র অশ্ম (প্রস্তর)-ময়ী পুরী ধ্বংস করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কয়েকস্থলে[৮] লৌহময়ী পুরী ও দুর্গের উল্লেখও আছে।

প্রায়ই রাজগণের উল্লেখ[৯] দেখা যায়। আর্যাবর্ত বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর দ্বারা অধ্যুষিত ছিল এবং নানা জনপদে বিভক্ত ছিল। রাজাদের অথবা দলের সর্দারদের পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ চলিত।[১০] রাজগণ অথবা রাজকুমারগণ যে বিশেষ বর্ধিষ্ণু ধনকুবের ছিলেন তাহার প্রমাণ মিলিবে দানস্তুতিগুলিতে। ইহাদের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। সমাজে যে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট ছিল তাহারও সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

পুরুষের বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল—তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে, যদিও এক ব্যক্তির একটিমাত্র স্ত্রীকে বিবাহ করাই সাধারণ রীতি ছিল। মেয়েদের

১। ১০.৯৫ ২। ১০.৮৬ ৩। ১০.৮৫ ৪। ৭.১০৩ ৫। ১০.১৪–১৮ ৬। ১০.৩৪.১৩ ইত্যাদি। ৭। ৫.৬২.

৮। ১.৫৮.৮ ইত্যাদি ৯। ১.৪০.৮ প্রভৃতি ১০। ৭.৩৩.৬ ইত্যাদি।

দ্বিতীয়বার বিবাহের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। বিধবার পুনর্বিবাহও[১] উল্লিখিত হইয়াছে। মেয়েদের স্বয়ংবর প্রথাও[২] অজ্ঞাত ছিল না। ভ্রাতৃহীনা (অভ্রাতৃকা) নারী সমাজে হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইত—সহজে তাহাকে কেহ বিবাহ করিতে চাহিত না। দাম্পত্য জীবনে বিশ্বাসঘাতকতা এবং যৌনজীবনের নীতিবিগর্হিত স্বেচ্ছাচারের দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই।

নৈতিক আদর্শ

নৈতিক আদর্শের দিক্ হইতে বলা চলে যে অসত্য বা অনৃত ভাষণকে গর্হিত[৩] মনে করা হইত। দেবগণ মিথ্যাবাদীকে শাস্তি দেন[৪] এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল।

বেশভূষা ও পোষাক-পরিচ্ছদ

বেশভূষা সম্পর্কে সুবেশা নারীর এবং নিপুণভাবে প্রস্তুত পোষাকপরিচ্ছদের কথা বলা হইয়াছে। মণিমুক্তা[৫], পোষাকপরিচ্ছদের উপাদান (যেমন মেষলোম) এবং তুলাও সে যুগে ছিল। পোষাকপরিচ্ছদের মধ্যে উত্তরীয় এবং অধরীয় ছিল প্রসিদ্ধ। অলংকারের মধ্যে ব্রেসলেট্, মল, কণ্ঠহার উল্লেখযোগ্য। অথর্ববেদে উষ্ণীষ[৬] অথবা মস্তকাবরণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

খাদ্যশস্য এবং ভোজ্যদ্রব্য

শস্যাদির মধ্যে যবের উল্লেখ প্রায়ই পাওয়া যায় কিন্তু ধান্যের উল্লেখ নাই। অথর্ববেদের যুগে আমরা ধান্য তথা চাউলের সহিত প্রথম পরিচিত হই। রৌদ্রদগ্ধ শস্য কয়েকস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। দেবগণকে পুরোডাশ ও করম্ভ দেওয়া হইত; নানাবিধ ফলের কথাও আছে। খাদ্য বা ভোজ্য বলিতে বুঝাইত দুগ্ধ, ঘৃত এবং শাকসব্জী, তরকারি প্রভৃতি। মাংস খাওয়া হইত—ছাগ এবং মেষ মাংসের চাহিদাও ছিল সুপ্রচুর। গোমাংসও খাওয়া হইত এবং বৃষভগণকে বলি দেওয়া হইত। সোমরস এবং উত্তেজক সুরা মাদক দ্রব্য হিসাবে পান করা হইত।

বিচিত্র জীবিকা

ঋগ্বেদের একটি সূক্তে[৭] নানাবিধ জীবিকার কথা বলা হইয়াছে। যেমন কাঠের কাজ, চিকিৎসা, পৌরোহিত্য, চর্মকারবৃত্তি, কবিয়ালি, শস্যপেষণকারিণী প্রভৃতি। রথনির্মাণ, যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রশস্ত্রনির্মাণের এবং সূতীক্ষাগ্র যন্ত্রপাতিনির্মাণের কুশলতা বিশেষ প্রশংসিত হইত। সকলেই বস্ত্রাদি বয়নের প্রশংসা একবাক্যে করিতেন। তন্তু এবং বস্ত্র

১। ১০.৪০.২ ২। ১০.২৭.১২ ৩। ৪.৫.৫ ৪। ১.১৫২.১ প্রভৃতি ৫। ৮.৪৬.৩৩ ৬। অথর্ববেদ, ১৫.২.১ ৭। ৯.১১২।

শব্দদ্বয় উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার নির্মাণ এবং রজ্জু তৈয়ারীর প্রক্রিয়া তখন জানা ছিল। চর্ম-ব্যবসায়ী, কৃষক, পশুপালন ও পশুপ্রজননক্রিয়া, ক্ষৌরকর্ম ও নাপিত এবং কুসীদজীবী ঋণদাতারও সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। জুয়াখেলা বা অক্ষক্রীড়া, নৃত্যগীতবাদিত্রাদিযুক্ত অভিনয়, দুন্দুভিবাদন, বংশী ও বীণাবাদন, ঘোড়দৌড় ('আজিধাবন') এবং সংগীত প্রভৃতি চিত্তবিনোদনের বিভিন্ন উপায় বলিয়া পরিগণিত হইত।[১]

প্রাণী ও জীবজন্তু

গরু এবং ঘোড়ার কথা প্রায়ই উল্লিখিত হইয়াছে। অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে ভেড়া এবং ছাগলও বাদ যায় নাই। কুকুরের উল্লেখও আছে (উদাহরণ হিসাবে যমসূক্তে যমের দুই কুকুরের কথা বলা যায়)। বানর, শূকর, নেকড়ে, শিয়াল, সিংহ, হাতী, উট প্রভৃতি প্রাণী এবং ময়ূর, পায়রা, বাজপাখী, শকুন, রাজহাঁস প্রভৃতি পাখী ও সাপ প্রভৃতি সরীসৃপের উল্লেখ আছে।[২]

জাতিপ্রথা

জাতিপ্রথা হিন্দুদের সমাজব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কতকগুলি সাক্ষ্য রহিয়াছে যাহার বলে প্রমাণ করা যায় যে জাতিভেদপ্রথা বৈদিক যুগেও ছিল; কিন্তু সেগুলি এতই কম শক্তিশালী যে তাহার ভিত্তিতে ঐরূপ মন্তব্যে না আসাই যুক্তিযুক্ত। এমনকি লুড়ুইগ এবং কয়েজি ঐ প্রথাকে ঋগ্বেদের যুগেও মানিয়া লইয়াছেন।

মন্তব্য

ঋগ্বেদের যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক আলোচনা করা হইল। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে সেই সুপ্রাচীন যুগেও সভ্যতা ও সংস্কৃতির কত উচ্চ স্তরে ভারতীয় আর্যগণ পৌঁছিয়াছিলেন। আর এরূপ সভ্যতার উৎকর্ষকে প্রাথমিক পর্যায়ের মনে করিলে নিতান্তই অসঙ্গত হইবে।

ঋগ্বেদোত্তর যুগে বৈদিক সভ্যতা

ঋগ্বেদের পর অথর্ববেদে ও অন্যান্য সংহিতায় আমরা সভ্যতা ও সংস্কৃতির আরও অগ্রগতি লক্ষ্য করি। এযুগে সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থায় অনেক উন্নতি এবং জটিলতা দেখা যায়। ছোট ছোট গোষ্ঠী বা জাতিরা ধীরে ধীরে আর্যসমাজের

১। A Vedic Reader—Macdonell, pp. XXVII—XXVIII. ২। দ্রঃ Vedic Index, Vols. I—II এবং Rigvedic Culture—A. C. Das.

অঙ্গীভূত হইয়া যাইতেছেন। বড় বড় সুগঠিত রাজ্যে সুশাসন প্রবর্তিত হইয়াছে। বৃহদায়তন সহরগুলির উদ্ভব ঋগ্বেদোত্তর যুগের বৈদিক সাহিত্যেই সর্বপ্রথম পাওয়া যায়।

বৃহদায়তন সহর

বৃহদায়তন রাজ্যগুলির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে আর্যগণের পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিস্তৃতির পরিচয় পাই। গঙ্গা-যমুনা বিধৌত সমগ্র উর্বর ভূখণ্ড এবং বিন্ধ্যপর্বতকে অতিক্রম করিয়া গোদাবরীর উত্তরে বিন্ধ্যাটবীর গহনে আর্যগণের বসতি বিস্তারের কথাও আমরা এইযুগে পাই।

আর্যসভ্যতার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রসার

'মধ্যদেশ' এইযুগে আর্যসভ্যতার কেন্দ্রস্থল ছিল। এই অঞ্চল বলিতে সরস্বতী নদী হইতে গাঙ্গেয় উপত্যকা বুঝাইত এবং উহা কুরু, পাঞ্চাল এবং আরও কয়েকটি উপজাতির দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। এই অঞ্চল হইতেই ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা বহির্দেশগুলিতে ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়ে।

'মধ্যদেশ'

ঋগ্বেদোত্তর যুগে বহু রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। অথর্ববেদের একটি বিখ্যাত সূক্তে 'পরীক্ষিতে'র উল্লেখ আছে—তিনিই তাহার নায়ক। সেস্থলে তাঁহাকে বিশ্বের রাজা (রাজা বিশ্বজনীনা) বলা হইয়াছে[১]; তাঁহার রাজ্যে সর্বদা সমৃদ্ধির প্রাচুর্য বর্তমান।

রাজগণ

ঋগ্বেদের 'কৃবি'গণ হইতে 'পঞ্চাল'গণ উদ্ভূত। এই পঞ্চালগণের মধ্যে বহু দার্শনিক এবং ধর্মনেতার আবির্ভাব ঘটে। প্রবাহণ-জৈবলির ন্যায় রাজা এবং আরুণি ও শ্বেতকেতুর ন্যায় ঋষি এই পঞ্চালগণের মধ্যেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

পঞ্চাল

উপনিষদের যুগে বিদেহরাজ্য পঞ্চালদেশের গৌরবকে ম্লান করিয়াছিল।[২] রাজর্ষি জনক এই বিদেহের রাজা, সম্রাট্ ও বিশ্ববিখ্যাত ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

বিদেহ

এইযুগে রাজশক্তি অনেক বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। রাজগণ তাঁহাদের অধীনস্থ প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণও রাজাদের দেওয়া

১। An Advanced History of India, p. 42. ২। Political History of Ancient India এবং Hindu Civilisation দ্রঃ।

শাস্তিভোগ হইতে অব্যাহতি পাইতেন না। সাধারণ প্রজাকে বলি, শুল্ক এবং ভাগ অর্থাৎ 'কর' দিতে হইত[১]। দাস শ্রেণীর লোককে ইচ্ছামত বরখাস্ত বা হত্যা করা চলিত।

রাজশক্তি বৃদ্ধি

রাজার প্রধান কর্তব্য ছিল একাধারে সামরিক নেতা ও বিচারকের কার্যাবলী নির্বাহ করা। তিনি প্রজাগণের এবং আইন ও ধর্মের রক্ষক ছিলেন; শত্রুদমনকারী ত ছিলেনই। তিনি দণ্ডিতের প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করিতেন, কিন্তু নিজে দণ্ডার্হ ছিলেন না।

রাজার কর্তব্য

বিজয়ী রাজগণ নিজেদের কাহিনী চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে রাজসূয়, অশ্বমেধ, বাজপেয় প্রভৃতি সুবৃহৎ ও ব্যয়বহুল যাগযজ্ঞের[২] অনুষ্ঠান করিতেন; ফলে তাঁহারা 'সার্বভৌমত্ব' লাভ করিয়া 'বিশ্বজনীন রাজা' বলিয়া গণ্য হইতেন। রাজাদের পুরাদস্তুর অভিষেক হইত। ব্রাহ্মণসাহিত্যের যুগে[৩] রাজা, সম্রাট্, স্বরাট্, বিরাট্ এবং একরাট্ প্রভৃতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের তথা সাম্রাজ্যবাদের বীজ বৈদিক যুগেই উপ্ত হইয়াছিল—একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

রাজার সার্বভৌমত্ব

অথর্ববেদে[৪] রাজা ও রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা বহুস্থলে রহিয়াছে। উহাকে সায়ণ 'রাজকর্মাণি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সূত, গ্রামণী, বিশ্, রত্নিন্, রাজকর্তৃ, প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও সমাজে শ্রদ্ধেয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের উল্লেখ এই যুগেই মিলিবে। সভা ও সমিতির ব্যাপক আলোচনা অথর্ববেদে আছে[৫]। পুরোহিত, সেনানী, পালাগল, গোবিকর্তন, অক্ষাবাপ, ক্ষত্তৃ, ভাগদুঘ, সংগ্রহীতৃ প্রভৃতি অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাষ্ট্রভৃত্যের কথাও আছে। বলি ও শুল্কের সংগ্রহ ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয় করনীতি ও রাজস্ব আদায়ের সুনির্দিষ্ট বিধিব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল।

রাষ্ট্রভৃত্য ও রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি

করনীতি

১। History of Hindu Revenue System—U. N. Ghoshal ২। বাজসনেয়ী সংহিতা দ্রঃ। ৩। দ্রঃ ঐ ব্রাহ্মণ। ৪। Bloomfield—A. V. & the Gopatha Brahmana ৫। Shende—The Religion and Philosophy of the A. V., pp. 75-79.

পতি ও শতপতির উল্লেখে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গ্রামে সর্বনিম্ন কর্মচারী ছিলেন অধিকৃৎ—রাজা ইঁহাকে নিযুক্ত করিতেন।* ঋগ্বেদে উল্লিখিত 'জীবগৃভ্' এবং উপনিষদে 'উগ্রঃ' শব্দদ্বয়ের সাহায্যে অনেকে সে যুগে পুলিশ কর্মচারীর অস্তিত্ব ছিল বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে কিছু বলা চলে না।

প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা

পুলিশ-ব্যবস্থা

বিচার-ব্যবস্থায় রাজার অনেক ক্ষমতা ছিল; কিন্তু এই ক্ষমতা তিনি প্রায়ই অধ্যক্ষদের দিতেন। ছোটখাট বিচারের ভার ছিল সভাসদ্‌গণের উপর। গ্রামের 'সভা'য় গ্রাম্যবাদিন্ (বিচারক) ছোটখাট অথচ গ্রামে অনুষ্ঠিত অভিযোগাদির মীমাংসা করিতেন। 'অগ্নিপরীক্ষা' তখন বিচার-ব্যবস্থার একটি অঙ্গ ছিল।

বিচার ব্যবস্থা

সমাজ-ব্যবস্থাতেও অনেক পরিবর্তন লক্ষিত হয়। বেশভূষা ও গৃহ-নির্মাণের ক্ষেত্রে ঋগ্বেদের যুগ অপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন অবশ্য দেখা যায় না। খাদ্য তালিকায় মাংসভক্ষণ ধীরে ধীরে নিষিদ্ধ অথবা অপ্রিয় হইতে থাকে। সামাজিক আমোদ-প্রমোদের নূতনতর রূপ এই কালে প্রবর্তিত হইয়াছে। বড় বড় সর্বজনীন উৎসবে শৈলূষ অর্থাৎ অভিনেতা ও বীণাবাদক (বীণাগাথিন্) কর্তৃক বীণা ও বেণুতে গীত গান বা গাথার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। 'শততন্তু' বা একশতটি তারের সমন্বয়ে গঠিত বাদিত্রের কথাও উল্লিখিত আছে। 'গাথা'গুলি হইতেই পরবর্তী কালের দুইটি বৃহৎ মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের বিজয়-গাথা উদ্ভূত হইয়াছিল।

বেশভূষা

আমোদ-প্রমোদ

নারীর অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি দেখা যায় না।** কন্যাকে ক্লেশের মূল বলিয়া মনে করা হইত। নারী সাধারণতঃ সভা-সমিতিতে যোগ দিতে পারিত না; উত্তরাধিকারী হইবারও অযোগ্য ছিল। উচ্চবর্ণের বিবাহিত নারীগণকে প্রায়ই সপত্নীর উপস্থিতি ও আধিপত্য সহ্য করিতে হইত। রাজমহিষীদের মধ্যে অধিকাংশই যথেষ্ট

নারীর স্থান

* প্রশ্নোপনিষদে ইহার উল্লেখ আছে।

** Women in the Vedic Age—Sakuntala Rao Sastri

সম্মান লাভ করিতেন; তাঁহাদের মধ্যে মহিষী ও বাবাতা উল্লেখযোগ্য। পরিবৃক্তী কিন্তু অবহেলিতই ছিলেন। নারীর ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের অধিকার ছিল; কয়েকজন মহিলা অতি উন্নত ধরণের শিক্ষাও পাইয়াছিলেন, যাহার ফলে তাঁহারা রাজসভায় দার্শনিক বিচার ও বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিবাহ-বিধির নিয়মাবলী আরও সুদৃঢ় এবং অপরিবর্তিত হইয়াছে এবং কয়েক স্থলে শিশু বিবাহেরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

জাতিভেদ

জাতিভেদের ক্ষেত্রে সুদূর-প্রসারী পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়—উচ্চ দুই বর্ণ—এখন বৈশ্য এবং শূদ্রকে সামাজিক সমান অধিকার দিতে অস্বীকার করিতেছেন।* শূদ্রকেও ইচ্ছা করিলেই অত্যাচার করা চলিত। চারি বর্ণের প্রত্যেককে আহ্বান করার জন্য পৃথক পৃথক্ সম্বোধনবাচক শব্দাবলী সৃষ্ট হইয়াছে। জাতি বদল করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িতেছিল; কিন্তু উচ্চবর্ণের ব্যক্তিগণ অবর বর্ণের নারীগণের পাণিগ্রহণ করার অব্যাহত স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। শূদ্রের সহিত বিবাহ কিন্তু সাধারণ ভাবে হেয় ছিল।

উচ্চবর্ণের জীবন-যাত্রা

উচ্চবর্ণের জনগণের জীবন এখন শাস্ত্রের অনুশাসনে নিগড়িত হইয়া পড়িতেছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদে সুস্পষ্টভাবে এই শ্রেণীর জীবন-যাত্রা ত্রিবিধ স্তরে বিভক্ত ছিল বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে। গৃহস্থ, সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী ছাত্র—এই ছিল উচ্চবর্ণের জীবন-যাত্রার ত্রিবিধ শাস্ত্রসম্মত স্তর।

ব্রাহ্মণদের সুযোগ-সুবিধা

ব্রাহ্মণদের সম্মান ও প্রাধান্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদিও পুরোহিত নিজেকে ভূসুর এবং রাষ্ট্র-রক্ষক বলিয়া প্রচার করিতেন বা দাবী জানাইতেন এবং একই ব্যক্তি বিভিন্ন রাজ্যের পুরোহিত হইতে পারিতেন, তবুও পোপের ন্যায় রাজাকে রাষ্ট্র-শাসনে কেহই বাধা দিতে পারিতেন না। ব্রাহ্মণের প্রাধান্য বহুক্ষেত্রেই ক্ষত্রিয় অগ্রাহ্য করিয়া চলিতেন এবং স্থল বিশেষে এমন কথাও আছে যেখানে ক্ষত্রিয় নিজেকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শক্তিশালী ব্যক্তি বলিয়া

* দ্রঃ History of Hindu Public Life, Part I, U. N. Ghoshal—ব্রহ্ম-ক্ষত্র চুক্তির তাৎপর্য।

ঘোষণা করিয়াছেন, আর পুরোহিতকে তাঁহার অধস্তন কর্মচারী মাত্র বলিয়াছেন। পুরোহিত সত্যই রাজার অনুবর্তী ছিলেন।

সমাজব্যবস্থার বিভিন্নক্ষেত্রে শ্রেণীগত কর্ম-বিভাগের নিদর্শনও দেখা যায়। কৃষি এবং পশুপালন ও গবাদিপশুরক্ষা ব্যতীতও বণিক্, রথকার, কর্মকার, সূত্রধার, চর্মকার, মৎস্যব্যবসায়ী, ধীবর প্রভৃতি উপশ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ সমাজের দৃষ্টিতে হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেন এবং একটি ব্রাহ্মণে সূত্রধারের স্পর্শ অশুচিকর বলা হইয়াছে। শূদ্রও অপবিত্র বলিয়া গণ্য হইত; দেবোদ্দেশে দেয় হবিঃ বা তাহার উপাদান দুগ্ধ তাহাকে স্পর্শ করিতে দেওয়া হইত না। শূদ্র এবং বৈশ্যকে ধীরে ধীরে এক অপাংক্তেয় শ্রেণীভুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে পৃথক্ করা হইতেছিল। শূদ্রের বাঁচিবার এবং শ্রীবৃদ্ধি লাভের অধিকার ধীরে ধীরে স্বীকৃত হইতে লাগিল এবং তাহার গৌরব খ্যাপনের জন্য প্রার্থনা পর্যন্ত করা হইয়াছিল। আর্যসমাজে বিজিত নব নব আদিম অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্তির ফলে শূদ্রগণের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছিল।

শ্রেণীগত কর্ম বিভাগ ও বিভিন্ন জীবিকা

শূদ্রগণের সংখ্যাবৃদ্ধি

সমাজে স্বীকৃত বর্ণ ও জাতিগুলি ছাড়াও সমাজ-বহির্ভূত দুইটি উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠী ছিল; উহারা ব্রাত্য এবং নিষাদ নামে প্রসিদ্ধ। ব্রাত্যগণ সম্ভবত ব্রাহ্মণ্যসভ্যতার বহির্ভূত আর্যগোষ্ঠী। তাহারা ব্রাহ্মণদের আচার ও নিয়মাবলী মানিত না, চলিতভাষায় কথা বলিত এবং যাযাবর জীবন যাপন করিত। তাহারা শিবের উপাসনা করিত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তাদির অনুষ্ঠান ও শাস্ত্রসম্মত ধর্মাচরণ করিলেই তাহাদের আর্যসমাজভুক্ত করা চলিত। নিষাদগণ কিন্তু স্পষ্টতঃই অনার্য; ইহারা নিজ নিজ গ্রামে বাস করিত এবং নিজেদের শাসক (স্থপতি) কর্তৃক শাসিত হইত। সম্ভবত ইহারা অধুনাতন ভীলদের পূর্বপুরুষ।

ব্রাত্য এবং নিষাদ

অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে এইযুগে নিম্নলিখিত তথ্যাদি পাওয়া যায়। জনসাধারণ 'এমন কি ধনীরা ('ইভ্য')' এখনও বেশীর ভাগই গ্রামে বাস করিত, কিন্তু নগর-জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও

অর্থনৈতিক অবস্থা

চাষবাস ছাড়িয়া দিতেছিল ; আর সেস্থান দখল করিতেছিল এক শ্রেণীর জমিদার ; উহারা সমগ্র গ্রাম নিজেদের দখলে আনিতেছিল। জমির মালিকানা পরিবর্তন এযুগে বিশেষ চলিত না এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সেরূপ প্রয়োজন হইলেও গোষ্ঠীর জনগণের সম্মতি পাইলেই কেবল করা সম্ভব হইত।

ভূমিস্বত্ব

কৃষিই জনগণের প্রধান জীবিকা ছিল। চাষের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল ; নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে নূতন প্রথায় চাষে উৎপন্ন ফসলও প্রচুর হইত। নব নব শস্য ও ফলের বীজ জমিতে বপন করা হইত। কিন্তু কৃষিকার্য নির্বিঘ্নে চালাইবার উপায় ছিল না। একটি উপনিষদে বলা আছে যে প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি, ঝড় ও পঙ্গপালের উপদ্রবে দেশের বহুলোক ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ঐ দেশ ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হয়।

কৃষিই প্রধান জীবিকা

ব্যবসায়-বাণিজ্য যথেষ্ট প্রসার লাভ করে। একদল বংশানুক্রমিক বণিক্ সম্প্রদায়ের* সৃষ্টি হয়। পর্বতবাসী কিরাতগণের সহিত ঔষধপত্রাদি ও সোমলতা প্রভৃতি দুর্লভ পার্বত্য জিনিষের বিনিময়ে চর্ম, বস্ত্রাদি ও শয্যাদ্রব্য বিক্রীত হইত—আন্তর্বাণিজ্যের এইরূপ বহু উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে।

ব্যবসায়-বাণিজ্য
আন্তর্বাণিজ্য

সমুদ্রের সহিত এযুগে আর্যগণের পরিচয় ছিল সুনিবিড় এবং শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত বন্যার কাহিনী** হইতে অনেকে অনুমান করিয়াছেন যে ব্যাবিলনের সহিত আমাদের বহির্বাণিজ্য চলিত।

সামুদ্রিক ও বহির্বাণিজ্য

মূল্যমান নির্ধারণের জন্য ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মুদ্রার প্রচলন এই যুগের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। নিষ্ক, শতমান ও কৃষ্ণল এই জাতীয় মুদ্রার পর্যায়ে পড়ে। তবে ইহারা সত্যই মুদ্রারূপে অঙ্কিত হইত কিনা সে বিষয়ে আজও নিঃসন্দেহে কিছু বলা চলে না। নিষ্ক প্রথমে কণ্ঠহার জাতীয় আভরণ ছিল ; পরে উহা নির্দিষ্ট ওজনের স্বর্ণমুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। নিষ্ক ও শতমানের ওজনের পরিমাণ একই ছিল।

মূল্যমান ও মুদ্রাঙ্কন,
মুদ্রানীতি

* 'বাণিজ'। ** দ্রঃ 'মনুমৎস্যকথা'

বণিকদের ব্যবসায়ের সঙ্ঘ ছিল—উহার নাম 'পণ' ছিল বলিয়া জানা যায়। দেশে অনেক 'শ্রেষ্ঠী'ও বাস করিতেন।

শিল্পের ক্ষেত্রে বহুবিধ জীবিকার সংস্থান এই যুগের বৈশিষ্ট্য। এক একটি শিল্পবিভাগে দক্ষতা ও কর্মকৌশল যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। শ্রমবিভাগ স্বভাবতঃই প্রবর্তিত হইয়াছিল। 'রথকার' ও 'তক্ষা'র মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য নির্ণীত হইত; চর্মকার ও ধনুর্নির্মাতা, চর্মব্যবসায়ী ও চর্মপাদুকা প্রভৃতির নির্মাতা পৃথক্ পৃথক্ কর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শিল্পে শ্রমবিভাগ

নারী জাতীয় জীবনে সক্রিয় সহযোগিতা করিত। শিল্পের ক্ষেত্রে তাহারা বস্ত্রবয়ন, সূচীশিল্প, কণ্টকাদির কার্য এবং রঞ্জয়িত্রীর কার্য করিত। নারীর জীবন দুহিতা, জায়া, জননী ও কুমারী বা কন্যারূপে বিভক্ত ছিল।

সমাজে নারীর গুরুত্ব

পরিশিষ্ট 'ক'

তন্ত্র*

'তন্ত্র' শব্দের অর্থ

'তন্ত্র' শব্দটির প্রকৃত অর্থ বিতর্কের বিষয়। কেহ কেহ বলেন, তন্ ও ত্রৈ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'তন্ত্র' পদে সেইরূপ গ্রন্থকে বুঝায় যাহা বিষয়বস্তুর বিস্তৃত আলোচনা পূর্বক মানুষকে বিপদ হইতে ত্রাণ করে।**

'তন্ত্র' শব্দটি সুপ্রাচীন; কিন্তু, শাস্ত্র বা গ্রন্থ অর্থে এই শব্দের প্রয়োগ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দেখা যায় না। ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে এই শব্দটি তাঁত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'মহাভাষ্য'কার পতঞ্জলি সিদ্ধান্ত অর্থে তন্ত্র পদ প্রয়োগ করিয়াছেন।

'তন্ত্রশাস্ত্রের' বিষয়বস্তু

মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে, তন্ত্রের বিষয়বস্তু চতুর্বিধ—জ্ঞান, যোগ, ক্রিয়া ও চর্যা। দার্শনিক মতবাদ, অক্ষরসমূহের রহস্যময় তাৎপর্য, যন্ত্র, মন্ত্র প্রভৃতি জ্ঞানের অন্তর্গত। কতকপ্রকার সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যে মনোনিবেশ যোগের অন্তর্গত। দেবতার মূর্তি নির্মাণ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিধি ক্রিয়াংশের আলোচ্য। ধর্মানুষ্ঠান ও সামাজিক কর্তব্য বিষয়ক বিধান চর্যাংশে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

এই শাস্ত্রে গুরুকে আধ্যাত্মিক জীবনে অত্যন্ত উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে। তান্ত্রিক সাধনেচ্ছু বা মুমুক্ষু ব্যক্তির উপযুক্ত গুরু কর্তৃক দীক্ষিত হওয়া আবশ্যক শাস্ত্রজ্ঞান, বাক্‌সিদ্ধি, যোগমার্গের অনুসরণ, স্থিতপ্রজ্ঞতা প্রভৃতি গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তি গুরু হইবার যোগ্য। গুরুর প্রতি দেবতাজ্ঞানে ভক্তি, গুরুকর্তৃক প্রদত্ত মন্ত্রকে গোপন রাখা প্রভৃতি শিষ্যের কর্তব্য।

তন্ত্রে দেবীপূজার অঙ্গ হিসাবে এবং মোক্ষলাভের উপায় স্বরূপ পঞ্চতত্ত্বের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। এই পাঁচটি তত্ত্ব হইতেছে—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা

* বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ।

** তনোতি বিপুলানর্থান্ তত্ত্বমন্ত্রসমন্বিতান্।
ত্রাণং চ কুরুতে যস্মাৎ তন্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥

(হস্ত এবং অঙ্গুলির বিন্যাস) ও মৈথুন। এই শব্দগুলির স্থূল অর্থের স্থলে কতক তন্ত্রে সূক্ষ্ম তাৎপর্যের কথা বলা হইয়াছে।

তন্ত্র মানবদেহকে ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ বলিয়া কল্পনা করিয়াছে। এই দেহস্থ নাড়ীগুলির মধ্যে প্রধান ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। এই দেহের অভ্যন্তরে ছয়টি চক্রের অবস্থান কল্পিত হইয়াছে; মূলাধার বা আধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। এগুলি ছাড়াও দেহের শীর্ষস্থানে, অর্থাৎ মস্তকের কেন্দ্রস্থলে, বিরাজমান শতদল পদ্ম; ইহার নাম সহস্রারচক্র। তন্ত্রশাস্ত্রের মতে মেরুদণ্ডের নিম্নদেশস্থ মূলাধার চক্রে সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজমানা; সাধক যোগবলে উহাকে জাগরিত করে। এই জাগরিত শক্তি সহস্রার চক্রে শিবের সহিত মিলিত হইয়া মূলাধারে প্রত্যাগমন করে।

তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব ও উদ্দেশ্য

তন্ত্রশাস্ত্রে যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে, উহাদের মধ্যে কতক অতি প্রাচীন কালে সমাজে প্রচলিত ছিল। আর্যগণের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়াদির উল্লেখ আছে। অদেব, অনৃতদেব ও শিশ্নদেব প্রভৃতি অনার্যগণ ঐন্দ্রজালিক ছিল। নানাবিধ প্রক্রিয়া ও মন্ত্রের সাহায্যে দুষ্ট লোকেরা মানুষকে ব্যাধিগ্রস্ত বা নিহত করিত বলিয়া ঋগ্বেদে উল্লেখ পাওয়া যায়। এইরূপ অনিষ্টকর কার্য যাহারা করিত, তাহাদিগকে যাতুধান আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে; 'যাতুধান' হইতেই সম্ভবত বর্তমান 'জাদু' শব্দের উৎপত্তি। তন্ত্রশাস্ত্রে প্রযুক্ত কতক রহস্যময় শব্দ ও মন্ত্র ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদে পাওয়া যায়। কিন্তু, শাস্ত্র হিসাবে তন্ত্র কখন আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। কতক প্রমাণ হইতে মনে হয়, তন্ত্রগ্রন্থ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকের পূর্বে রচিত হয় নাই বা হইয়া থাকিলেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় নাই। মহাভারতের অর্বাচীনতম অংশেও (আঃ খ্রীঃ চতুর্থ শতক) তন্ত্রের কোন উল্লেখ নাই। প্রসিদ্ধ অভিধান 'নামলিঙ্গানুশাসন'-এ (আঃ ষষ্ঠ শতকের পূর্ববর্তী) ধর্মগ্রন্থ হিসাবে তন্ত্র শব্দের অর্থ লিখিত নাই। চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণ তন্ত্রের উল্লেখ করেন নাই। তন্ত্রগ্রন্থের নেপালে রক্ষিত প্রাচীনতম পুঁথিগুলি খ্রীষ্টীয় সপ্তম হইতে নবম শতকের মধ্যে লিখিত।

তন্ত্রশাস্ত্র কি উদ্দেশ্যে প্রথমে রচিত হইয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। তবে মনে হয়, জনসাধারণের উপযোগী সাধনার পদ্ধতি ও মোক্ষের উপায় লিপিবদ্ধ করাই এই জাতীয় গ্রন্থসমূহের রচয়িতৃগণের উদ্দেশ্য ছিল। প্রাচীন শাস্ত্রে সাধনার যে পথ নির্দেশিত হইয়াছে, তাহা অতীব কঠোর ও কৃচ্ছ্রসাধ্য। জীবনে যে সকল বস্তু ভোগ করিবার প্রবণতা মানুষের আছে, উহাদের ত্যাগের উপরে ঐ পথ প্রতিষ্ঠিত। তন্ত্র সেই পথের সন্ধান দিয়াছিল, যাহাতে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা দ্বারাই মানুষ চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে। তন্ত্রশাস্ত্রের বিষয়বস্তু দ্বিবিধ; একটি দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক, অপরটি বাস্তবাশ্রয়ী। শেষোক্ত অংশে তন্ত্র মানুষকে শিক্ষা দেয়, কি করিয়া সে মণ্ডল, মুদ্রা, ন্যাস, যন্ত্র ও চক্র প্রভৃতির সাহায্যে শারীরিক প্রক্রিয়াদি দ্বারা, পরম শক্তির সহিত নিজের তাদাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারে। মনে হয়, প্রাচীনতর শাস্ত্রের শুষ্ক দার্শনিক তত্ত্ব ও কৃচ্ছ্রসাধনের প্রতিবাদ স্বরূপ তন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল।

তন্ত্রগ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ

তন্ত্রশাস্ত্রের গ্রন্থগুলিকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলিকে যথাক্রমে বলা হয় আগম, তন্ত্র ও সংহিতা। এই সকল শ্রেণীরই গ্রন্থাবলীকে সাধারণতঃ তন্ত্রনামে অভিহিত করা হয়।

তন্ত্রগুলি সাধারণতঃ শিব ও পার্বতীর কথোপকথনের আকারে রচিত। যে গ্রন্থে শিব বক্তা ও পার্বতী শ্রোত্রী উহা আগম শ্রেণীর অন্তর্গত; ইহার বিপরীত পদ্ধতি লক্ষিত হয় নিগম জাতীয় গ্রন্থাবলীতে।

কোন কোন গ্রন্থে বিষ্ণুক্রান্তা, রথক্রান্তা ও অশ্বক্রান্তা ভেদে তন্ত্রগ্রন্থসমূহের ত্রিবিধ শ্রেণীবিভাগ আছে। কেহ কেহ বলেন, স্রোত, পীঠ ও আম্নায় ভেদে তন্ত্র ত্রিবিধ।

হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ভেদে তন্ত্র তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

তন্ত্রের উৎপত্তিস্থল

তন্ত্রশাস্ত্র প্রথমে কোথায় উদ্ভূত হইয়াছিল, সেই বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, তান্ত্রিক তত্ত্ব এবং আচার অনুষ্ঠান বিদেশ হইতে ভারতে প্রবর্তিত হইয়াছিল। কাহারও

কাহারও মতে, এই শাস্ত্রের উদ্ভব হয় বঙ্গদেশে এবং কালক্রমে ইহা ভারতের সর্বত্র প্রসার লাভ করে। ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে এই শাস্ত্র তিব্বতে এবং চীনদেশে প্রবর্তিত হয়। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, আগম শ্রেণীর সাহিত্য প্রথমে রচিত হয় কাশ্মীরে, সংহিতা-সাহিত্য উদ্ভূত হয় বাংলা, দাক্ষিণাত্য ও শ্যামদেশে। তন্ত্র শ্রেণীর রচনার উৎপত্তিস্থল অনেকেই বঙ্গদেশকে মনে করেন।

তন্ত্রশাস্ত্রের গ্রন্থাবলীর সংখ্যা ও নাম

কোন কোন তন্ত্রে এই শাস্ত্রের গ্রন্থসংখ্যা ৬৪ বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু, ইহার অনেক অধিকসংখ্যক তন্ত্রগ্রন্থের পুঁথি নানাস্থানে সংরক্ষিত আছে।

প্রকাশিত হিন্দুতন্ত্রগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকখানি গ্রন্থের নাম নিম্নলিখিতরূপ :—

কুলার্ণব, তন্ত্রসার, প্রাণতোষিণী, প্রপঞ্চসার, মহানির্বাণতন্ত্র, রুদ্রযামল, শারদাতিলক, শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, অহির্বুধ্ন্যসংহিতা, মালিনীবিজয়, বিজ্ঞানভৈরব।

বৌদ্ধগণের প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তন্ত্রের নাম :—

অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ, আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প, জ্ঞানাসিদ্ধি, প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি, ষট্চক্রনিরূপণ, সাধনমালা।

তন্ত্রের প্রভাব

তন্ত্রশাস্ত্র জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। ইহার জনপ্রিয়তার কারণও ছিল অনেক। তন্ত্র যে বেদ বা বেদকেন্দ্রিক ধর্মের প্রতি সক্রিয় বিরোধিতা করিয়াছিল, তাহা নহে। এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য এই যে, বেদবিহিত অনুষ্ঠানাদি এ যুগে কষ্টসাধ্য ; সুতরাং সহজ সরল সাধন-পদ্ধতি ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শূদ্র ও স্ত্রীলোকগণ বেদচর্চা এবং বৈদিক অনুষ্ঠানাদি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন ; কিন্তু ইঁহারা তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপের অধিকারী। এই সকল কারণে তন্ত্র জনসাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। তন্ত্রের প্রভাব সমাজে অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর হইয়া পড়িলে হিন্দুশাস্ত্রকারগণ উহাকে অস্বীকার করিতে পারিলেন না। ফলে তান্ত্রিক মন্ত্র ও আচার অনুষ্ঠান হিন্দুশাস্ত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হইয়া পড়িল। তন্ত্রগুলি প্রথমতঃ জনপ্রিয় পুরাণগুলিকে প্রভাবিত করিয়াছিল এবং পুরাণের মাধ্যমে ধর্মশাস্ত্রাদিতে

ইহাদের প্রভাব অনুস্যূত হইয়াছিল ; অবশ্য, কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মশাস্ত্রে তন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে সমাজসংস্কারক রঘুনন্দন (খ্রীঃ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক) সর্বপ্রথম তান্ত্রিক দীক্ষাকে শাস্ত্রীয় অনুমোদন দান করেন।

রক্ষণশীল হিন্দু শাস্ত্রকারগণ হয়ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই তন্ত্রের প্রামাণিকত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। 'দেবীভাগবতে' (১১. ১. ২৫) উক্ত হইয়াছে যে, তন্ত্র যদি বেদের অবিরোধী হয় তাহা হইলে উহা অবশ্য প্রামাণ্য।

তন্ত্র যে শুধু হিন্দুধর্মকেই প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহা নহে। ভারতবাসীর জীবনেও ইহার প্রগাঢ় প্রভাবের প্রমাণ বিদ্যমান। তন্ত্রোক্ত বহু দেবদেবীর স্তব স্তোত্র অদ্যাপি অনেকের প্রত্যহপাঠ্য ও প্রেরণাদায়ক। প্রাদেশিক সাহিত্য অনেক পরিমাণে তান্ত্রিক ভাবধারায় পুষ্ট। বাংলাসাহিত্য জন্ম হইতেই তন্ত্র-প্রভাবিত। 'চর্যাপদ' হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বাংলা গ্রন্থে তান্ত্রিক ভাব লক্ষণীয়। অসংখ্য শাক্ত পদাবলীতে তন্ত্রোক্ত তত্ত্বসমূহের প্রতিধ্বনি ও জীবন-দর্শনের স্বাক্ষর রহিয়াছে।

পরিশিষ্ট খ

প্রাক্-রবীন্দ্র বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃত

প্রাচীন ভারতীয় ভাবনা ও চিন্তাধারার আধার সুপ্রাচীন বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্য। প্রায় দু'হাজার বছর ব্যাপ্ত করে এই সাহিত্য ভারতে সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছিল, এবং একদিন দেবভাষা সংস্কৃত রাজভাষার স্থান অধিকার করেছিল। বৈদিক ঋষির ধ্যানগম্ভীর অধ্যাত্ম উপলব্ধি, যুগযুগান্তরের দার্শনিক ও নৈয়ায়িকগণের সুপরিণত মনীষা, বিভিন্ন শাস্ত্র ও কলাবিদ্যার বিচিত্র অনুশীলন ও আলোচনা এবং রাজসভাপুষ্ট কাব্য-সাহিত্য, নাটক, প্রেম-সঙ্গীত ও কবিতাবলীকে ধারণ করে আছে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য।

রাজসভাপুষ্ট বিদগ্ধজনের আশ্রয় দেবভাষা সংস্কৃতের সঙ্গে জনসমাজের প্রাণের সংযোগ ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়, এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাণবান ও বেগবান সৃষ্টিপ্রবাহ শুদ্ধ হয়ে আসে। সংস্কৃতের সৃষ্টিপ্রবাহ শুদ্ধ হয়ে এলেও, পরবর্তী ভাষা-সাহিত্যসমূহে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব অশেষ। পরবর্তীদের কাছে সংস্কৃত সাহিত্য ভাব ও রূপের চিরন্তন প্রেরণার উৎস।

বিশেষতঃ প্রাচীন সাহিত্যের এমন কতগুলি ধর্ম থাকে, যা বিশেষ যুগের বা কালের অন্তর্গত নয়; মানুষের জীবন যখন অন্ধ সংস্কার ও অনুষ্ঠানের ভারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, প্রাচীন সাহিত্যের সরল জীবনবোধ ও সহজ সৌন্দর্য-বোধ তখন তার নব জীবন-দর্শন রূপায়ণে সহায়তা করে। যুগসঙ্কটে প্রাক্তনী প্রজ্ঞা জাতির মনীষাকে নূতন পাথেয় দান করে।

প্রাচীন সাহিত্যের এই বিশেষ গৌরব ছাড়াও এ দেশে সংস্কৃত ভাষার অন্য পরিচয় ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের মহিমা ও কৌলীন্য-প্রসিদ্ধি এমন ছিল যে, নবীন ভারতীয় আর্যভাষাসমূহের আবির্ভাবের পরেও সংস্কৃত ভাষা ধর্মালোচনার আশ্রয় এবং সাহিত্যসাধনার বাহন—এই স্বীকৃতি থেকে বহুদিন তাকে কেউ বঞ্চিত করতে পারে নি।

গুপ্ত-যুগ থেকে আরম্ভ করে সেন-যুগ পর্যন্ত, সংস্কৃত প্রাকৃত ও শৌরসেনী অপভ্রংশ বাংলা দেশে সাহিত্য-সাধনা ও ধর্মালোচনার বাহন ছিল। অভিজাত সমাজে ও পণ্ডিত সমাজে নবজাত বাংলা ভাষার কোন স্থান তখন ছিল না।

ঐশ্বর্যশালী সংস্কৃত সাহিত্যের উত্তরাধিকার লাভ করেও বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য সুদীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করতে হয়।

দশম থেকে দ্বাদশ শতকে রচিত চর্যাপদে বাংলাভাষার বিশিষ্ট সাহিত্য-প্রকৃতি ও বাঙালীর বিশিষ্ট মানস-সংগঠনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার অবক্ষয় এবং অপভ্রংশ বাংলা প্রভৃতি দেশীয় ভাষার তখন অভ্যুদয় যুগ। দেশীয় ভাব, ভাষা ও ভঙ্গী গ্রহণ করে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা হয়, সংস্কৃত সাহিত্যও দেশীয় ভাষা-সাহিত্যকে প্রভাবিত করে। দেশীয় ভাষার অন্ত্যানুপ্রাস ও ঝঙ্কার এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যঞ্জন-ধ্বনিসমৃদ্ধ পরিণত রচনা-কৌশল বাঙালী কবি জয়দেবের সংস্কৃতে রচিত 'গীতগোবিন্দ' কাব্যকে সার্থক করেছে। 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের প্রভাব পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে সঞ্চারিত হয়েছে। অপরদিকে, 'সুভাষিতরত্নকোশ' এবং 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'র কবিতিকাবলী, চর্যার পদসমূহ এবং মধ্যযুগের শক্তি ও বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে একটা দূর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। স্বল্পায়তন রচনার ভিতর আবেগপ্রবণ বাঙালী হৃদয় সার্থক রূপে আত্মপ্রকাশ করে, প্রসার ও বিস্তারের ভিতর বাঙালীর কল্পনাসমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না।

চর্যাপদে লক্ষ্য করা যায়, জনসাধারণের কাছে নিবেদন করার জন্য জনজীবনের ভাব ও ভাষায় গ্রন্থ রচিত হয়েছে সত্য; কিন্তু সংস্কৃত প্রভাবিত মনের স্পর্শ পদগুলিকে সমৃদ্ধ করেছে।

দিবা বিভেতি কাকেভ্যো রাত্রৌ সন্তরতে নদীম্।
তত্র নক্রভয়ং নাস্তি তদ্ধি জানন্তি তদ্বিদঃ ॥

এই উদ্ভট শ্লোকে যে কাহিনীর ইঙ্গিত আছে, তার আভাস আছে এই চর্যাপদটিতে :—

দিবসই বহুড়ী কা অই ডরে ভাই।
রাতি ভইলে কামরূপ যাই।

সাধন-সঙ্কেত নিগূঢ় রাখার জন্য চর্যাকারগণ উদ্ভট শ্লোকের ন্যায় আবরণ সন্ধান করেছিলেন। চর্যার সাধনতত্ত্বে যোগদর্শন, বৌদ্ধ তন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট।

চর্যাপদে বাঙালী শিল্পীর যে মানস স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়, সেই স্বাতন্ত্র্য নবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে। সংস্কৃতবেত্তা পুরাণজ্ঞ শাস্ত্রপারঙ্গম কবি কাব্যসূচনায় জন্মখণ্ডে কাব্যের যে পরিচয় দিয়েছেন, কাব্যের শেষে বিরহখণ্ডের পরিণতি সে পরিচয় বহন করে না। শিল্প প্রাণবন্ত হয়ে কবির অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে প্রাণসার সংগ্রহ করে সাবলীল গতিতে অগ্রসর হয়েছে, শিল্পীর সংস্কৃত-সচেতন বিদগ্ধ মনের নির্দেশের প্রতীক্ষা করে নি। জন্মখণ্ডে লক্ষ্য করা যায়, কবি পুরাণাশ্রিত ঐশ্বর্যপ্রধান কৃষ্ণ-লীলা রসের সাধক। ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাভারতের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য তিনি ব্যগ্র। কংসভার প্রপীড়িত পৃথ্বীর উদ্ধারের জন্য কৃষ্ণের অবতারত্ব। কিন্তু জন্মখণ্ডে 'কাহ্নাঞির সম্ভোগ কারণে' পৌরাণিক লক্ষ্মী রাধারূপে যখন আবির্ভূত হন, তখন অনুমান করা যায় কেবলমাত্র কাহ্নাইয়ের সম্ভোগ নয়, কবিচিত্ত রসসম্ভোগের জন্য 'রতিরসকামদোহনী', 'শিরীষকুসুমকোঁওলী' এই 'অদ্ভুত কনকপুতলী'কে পরিচিত পৌরাণিক ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত করে 'পদুমা উদরে সাগরের ঘরে' রচনা করেছে। কবির কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা যথার্থ উদ্দীপিত করেছে রাধাকৃষ্ণ পরকীয় প্রেমলীলার প্রচলিত লৌকিক কাহিনী। বাংলা দেশের সাহিত্য তখন ধর্মচেতনা থেকে মুক্ত ছিল না। অন্য কোন দার্শনিক পটভূমিকার অভাবে কবি এই পরকীয় প্রেমলীলাকে পৌরাণিক ঈশ্বর বৈকুণ্ঠ-বিহারী বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীর ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। কিন্তু জীবনের আদি-পর্বে 'আতি মহাবীর কাহ্ন' বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী বিবিধ অসুর সংহার করে যে মহাবলের পরিচয় দিয়েছিলেন, পরের খণ্ডগুলিতে তার আর কোন পরিচয় নেই। কেবল, 'শিরীষ-কুসুম-কোঁওলী' 'এগার বরিষের' একটি 'বালী'-কে ছলে বলে কৌশলে অধিকার করার জন্য ঈশ্বরত্বের আস্ফালন বার বার করা হয়েছে। রাধাচরিত্র এবং দান, নৌকা, হার, ভার প্রভৃতি খণ্ডের উল্লেখ কোন পুরাণে নেই। বড়ায় বল্পরী আইহন-পত্নী রাধার তীব্র কৃষ্ণবিমুখতা, বিভিন্ন খণ্ডে, সে যুগের জীবনের নানা ঘটনার ঘাত সংঘাতের ভিতর দিয়ে বিরহখণ্ডে কৃষ্ণপ্রাণতায় পর্যবসিত হয়েছে।

কাব্যস্বরূপ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৌরাণিক কাহিনী কাব্যপ্রেরণার যথার্থ ইন্ধন নয়; বরং কাহিনীতে তার অনধিকার প্রবেশের চিহ্ন আছে। সংস্কৃত

শ্লোকাবলী এ কাব্যের উজ্জ্বল "শিরোভূষা"। কিন্তু তাদের নিজস্ব কাব্যমূল্য যাই থাক না কেন এবং মূল কাব্যাংশের যে ইঙ্গিতই দান করুক না কেন, বাংলা কাব্যাংশের আত্মা ও প্রাণের সঙ্গে তারা এক হয়ে নেই।

বরং সংস্কৃত সাহিত্য থেকে আহরণ করা আভরণ এবং 'গীতগোবিন্দে'র সৌরভ নিয়ে গড়া "শিরীষকুসুমকোঁওলী" চন্দ্রাবলী রাহীকে দেখে মনে হয় কবির সংস্কৃত জ্ঞান সার্থক।

এই সার্থকতার পরিচয় কৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ভাষাতেও আছে। কবির গভীর সংস্কৃত জ্ঞান সংস্কৃত শব্দ ও প্রয়োগ রীতিকে বাংলা ভাষায় অক্লেশে ব্যবহার করেছে। একটি ভাষার উপর অধিকার ও লৌকিক কাহিনীর প্রতি আকর্ষণ থাকায় লৌকিক শব্দ, বাগ্ধারা ও সংলাপরীতি কাব্যে নিঃশব্দে তার নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্য হরিস্মরণ ও কীর্তন দ্বারা বাংলা দেশের মন দুটি ধারায় সরস করে তুলেছিল। একটি ধারার রীতি অনুসরণ করে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য বিলাসকলাকুতূহলী চিত্তকে তৃপ্ত করেছিল, কৃষ্ণানুরক্ত চিত্তকে তৃপ্ত করল মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের ভাবগত অনুবাদ, তবে কোন কোন জায়গায় আক্ষরিক অনুবাদ আছে।

অনুবাদ সাহিত্যের আদর্শ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অপরিণত সাহিত্য ভাব ও পুষ্টি সংগ্রহ করার জন্য সমৃদ্ধতর সাহিত্য থেকে আদর্শ গ্রহণ করে। কখনও বা বিশেষ যুগের ভাববেদনা প্রাচীন শিল্পের ভাবাবহের ভিতর নিজের প্রতিচ্ছবি যখন নিরীক্ষণ করে, তখন ভাবসাম্যের জন্য নিজের ভাষায় সেই প্রাচীন শিল্পকে নিজের মত করে গ্রহণ করে। ভারতীয় সাহিত্য ও শাস্ত্রের বিপুল ভাণ্ডার বাংলার কবিকুলকে কাব্য-সৃষ্টির জন্য বিচিত্র বিষয়বস্তু দান করেছিল। বিভিন্ন যুগে কবিবৃন্দ প্রেরণা অনুযায়ী সেই ভাণ্ডার থেকে ভাববীজ আহরণ করেছেন। সংস্কৃত ভাগবতে সমন্বয়ের আকাঙ্ক্ষা ও প্রেমধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাগবতে পুলিন্দ, পুক্কশ, কিরাত, যবন প্রভৃতি আর্যেতর জাতিবৃন্দ ভগবদুপাসনার অধিকারী। তুর্কী আক্রমণের পর বাংলার সমাজসংস্থা বিনষ্ট হয়। বিচ্ছিন্ন সমাজে সমন্বয় ও সংহতির

আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। মাধবেন্দ্রপুরী, যবন হরিদাস ও অদ্বৈত মহাপ্রভু প্রভৃতির সাধনায় এক নবীন প্রেমধর্মের উন্মেষ হয়। সমন্বয় ও সমদর্শনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রেমধর্মের পরিচয় 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যেও আছে। কবির নিজের ভাষায় :—

'সভাকার এক আত্মা ভিন্ন না মানিহ
পর আত্মাএ নিজ আত্মাএ বেথা নাহি দিহ।'

অন্যত্র

সর্বভূতে হের আমি দেখাল্য তোমারে
ভূতে দয়া জেই করে সেই ত আমারে।
ভূত হিংসা জেই করে সেই আমার বৈরি
অহিংসা পরম ধর্ম থাকহ আচরি।

ভাগবত-বাণী ধারণ করে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য চৈতন্যভাবসাধনার পীঠভূমি প্রস্তুত করেছে। ভাগবত সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছিলেন—

'সব পুরুষার্থ ভক্তি ভাগবতে হয়
প্রেমরূপ ভাগবত চারিবেদে কয়।'

বাংলা দেশের বৈষ্ণব সাহিত্য ও সংস্কৃত ভাগবতের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করল মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য। শ্রীচৈতন্যদেবের রাধাকৃষ্ণ লীলারসের আস্বাদন ভাগবত কাহিনীকে নূতন মহিমা দান করেছে। চৈতন্যোত্তর ভাগবতে বাংলার মানস-সম্ভব দান ও নৌকালীলার কাহিনী সাদরে গৃহীত হয়েছে। চৈতন্য-সমকালীন কবি ভাগবতাচার্য পণ করেছিলেন, 'মহাভাগবতে না কহিব অন্য কথা'। কিন্তু কৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে' লিখলেন—

এসব রসের কথা নাহি ভাগবতে
বিস্তারি কহিব কিছু............

কবিশেখর তাঁর 'গোপালবিজয়' কাব্যে লিখেছেন—

আর একখানি দোষ না লবে আমার
পুরাণের অতিরেক লিখিব আপার।
অবিচারে আমারে না দিহ দোষভারে
স্বপনে কহিয়া দিল নন্দের কুমারে।

বাংলার স্বপনচারিণী কল্পনা সংস্কৃত ভাগবতের ভিতর বন্দী হয়ে থাকতে পারে নি—প্রাণের ঠাকুর নন্দকুমারের প্রেরণা ও আপনার কল্পনা-মহিমা দ্বারা ভাগবতকে অতিক্রম করতে চেয়েছে। মানব রসের সাধক বাঙালী আর্যকল্পনাশ্রয়ী দ্যুলোকবাসী দেবদেবীবৃন্দকে ঐশ্বর্যময় করে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে নি। তাঁদের একান্ত পরিজন করে, কেবল ইহলোকে নয়, বাঙালী স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত করেছে, গৃহগত অনুভূতিকে বিশুদ্ধ করে দেবমহিমাকে আস্বাদ করেছে। সংস্কৃত ভাগবতের প্রেরণায় কবিকল্পনা যেখানে নবভাগবত সৃষ্টি করেছে, সেখানে সেই প্রেরণা সার্থক হয়েছে।

আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণ-কাহিনী আশ্রয় করে যুগে যুগে রাম-কথা রচিত হয়েছে, এবং যুগ ও কবিকল্পনা অনুযায়ী কাহিনী ও রামস্বরূপ পরিবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন যুগের ভক্তিবাদ ও দর্শন যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ, অদ্ভুতরামায়ণ, অধ্যাত্মরামায়ণ, জৈমিনিরামায়ণ, বিভিন্ন পুরাণ ও দেবীভাগবতে রামচরিত্র ও কাহিনীকে প্রভাবিত করেছে। বাংলার রামায়ণ-কাব্য কেবল বাল্মীকি-রামায়ণ নয়, বিভিন্ন যুগের সংস্কৃত রামায়ণ ও পুরাণ থেকে ভাবসাম্য অনুসারে প্রেরণা ও উপাদান গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন যুগে বাঙালী কবি সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত থেকে কি ভাবে প্রেরণা ও উপাদান সংগ্রহ করেছে, তার যথাযথ আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। মোটামুটি একটি সাধারণ পরিচয় এখানে দেওয়া গেল।

কৃত্তিবাসের শ্রীরামপাঁচালী বাংলা দেশের আদি রামায়ণ-কাব্য। হনুমান কর্তৃক বিশল্যকরণী আনয়ন প্রসঙ্গে কবি বলেছেন—

নাহিক এসব কথা বাল্মীকি রচনে।
বিস্তারিয়া লিখিত অদ্ভুতরামায়ণে ॥
এক রামায়ণ শত সহস্র প্রকার।
কে জানে প্রভুর লীলা কত অবতার ॥

লবকুশ কর্তৃক নিহত রামের তিন ভ্রাতা বাল্মীকি কর্তৃক পুনর্জীবিত হন। বাল্মীকি-রামায়ণ-বহির্ভূত এই কাহিনী প্রসঙ্গে কৃত্তিবাস বলেছেন—

এসব গাহিল গীত জৈমিনিভারতে।
সম্প্রতি যে গাই তাহা বাল্মীকির মতে ॥

"বাল্মীকির মতো" রচনা করা মধ্য যুগের কবির পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। বাল্মীকির রামায়ণ-কাব্য বাল্মীকির যুগকে ধারণ করে আছে। নরোত্তম, বীর্যবান, ক্ষত্রিয়নন্দন রামচন্দ্রকে আশ্রয় করে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বৈশ্য চতুর্বর্ণের বিভিন্ন নরনারীর চরিত্র-বৈচিত্র্য, জীবনাদর্শ, দেব-রক্ষ-নর-বানরের কীর্তিকথা, সে যুগের অরণ্য ও নগরী, প্রশস্ত পটভূমিকায় উদার ব্যাপ্তি ও মহাকাব্যিক মহিমা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি পণ্ডিত কৃত্তিবাসের ছিল না। রামায়ণ-কাব্যে পরিবার-জীবন-বিপর্যয়ের যে করুণ ইতিহাস আছে, কারুণ্যের সেই নির্ঝর কবি-কল্পনার উৎস। গৃহধর্ম, চরিত্রধর্ম, কৃত্তিবাসের যুগের গ্রামীণ জীবন, নরনারীর চরিত্রবৈশিষ্ট্য, রীতিনীতি ও ভাবধারা কৃত্তিবাসের রচনায় রামায়ণের আধারে আত্মপ্রকাশ করেছে। কৃত্তিবাসের যুগের ভক্তিবাদ, শাক্ত ও বৈষ্ণব চেতনা অধ্যাত্ম রামায়ণ ও অদ্ভুত রামায়ণ প্রভৃতি থেকে বিভিন্ন কাহিনী সংগ্রহ করেছে। কৃত্তিবাসের কাব্যে রত্নাকর দস্যু নামধর্মের মাহাত্ম্যে বাল্মীকি মুনিতে পরিণত হয়েছিল। এই কাহিনী অধ্যাত্ম রামায়ণে আছে।

পরবর্তীকালের বাংলা রামায়ণ কথা বাল্মীকি রামায়ণ অপেক্ষা অন্যান্য সংস্কৃত রামায়ণ কাহিনী অধিকতর অনুসরণ করেছে। নিত্যানন্দ আচার্য অদ্ভুত রামায়ণ অনুসারে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন, সেজন্য তার নাম অদ্ভুতাচার্য হয়।

কৈলাসবসুর রামায়ণ কাব্য অদ্ভুতরামায়ণের মূলগত অনুবাদ। বৈদ্য রামশঙ্কর দত্তের রামায়ণ কৃত্তিবাস ও অদ্ভুতাচার্যের কাব্যের সমন্বয়ে রচিত। দ্বিজ ভবানীনাথ ও দ্বিজ শ্রীলক্ষ্মণ অধ্যাত্মরামায়ণ অনুসরণ করেছিলেন। শ্রীলক্ষ্মণের ভণিতায় দেখা যায়, তিনি যোগবাশিষ্ঠ থেকেও কিছু অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের রামায়ণ কাব্য গতিশীল জীবনবোধের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সৃজনশীল কল্পনা লোকজীবন ও সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে সার্থকভাবে উপমা, অলঙ্কার ও বিভিন্ন উক্তি গ্রহণ করেছে। কবিদের সহজ জীবনানুভূতি সংস্কৃত রামায়ণ-কথাকে বাঙালীর জীবনকথায় পরিণত করেছে। কিন্তু সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত কোন সৃজনশীল প্রেরণা ও সহজ অনুভূতির অভাবে কবিকল্পনার

শক্তি অবসন্ন হয়ে আসে; খণ্ড কাব্য রচনা এবং মৌলিক সৃষ্টি অপেক্ষা সংস্কৃত আকর গ্রন্থের মূলানুগ অনুবাদের প্রতি আগ্রহ অধিকতর হয়। কোন সার্থক প্রেরণার ফলে আকর গ্রন্থের প্রতি এই প্রীতির আবির্ভাব হয় নি; পুরাতনের চর্বিতচর্বণ করার জন্য সংস্কৃত কাব্যসমূহের মূলানুসরণ করা হয়।

উনিশ শতকে, রঘুনন্দন গোস্বামীর 'রাম-রসায়ন' এই ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। কবি সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। সংস্কৃত শব্দাদির আতিশয্য মাঝে মাঝে শ্রুতিকটু হয়েছে। বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ ও তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণ অনুসরণ করলেও ৺দীনেশচন্দ্র সেনের মতে 'রামরসায়ন' অনেকাংশে ভাগবতের প্রতিচ্ছায়ার মত। কবি বৈষ্ণব ছিলেন, রামায়ণের করুণ কাহিনীগুলি তিনি বর্জন করেছিলেন। বাঙালী কবির বৈষ্ণব চেতনায় রাম-কথা ও কৃষ্ণ-কথা এক হয়ে দেখা দিয়েছে।

পালরাজমহিষী চিত্রমতিকাদেবীর কাছে মহাভারত পাঠ করে ব্রাহ্মণ বটেশ্বর স্বামী ভূমি-দক্ষিণা লাভ করেছিলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী গত হয়ে গেলেও আর কোন ব্রাহ্মণের এই উত্তরাধিকার গ্রহণ করার কথা জানা গেল না। রাজসভায় মহাভারত পাঠের ধ্বনি যখন আবার উত্থিত হোল তখন দেখা গেল, বিদেশী মুসলমান শ্রোতার অংশ গ্রহণ করেছেন; আর সে কথা বাংলা মহাভারতে যিনি উল্লেখ করেছেন, তাঁর পদবী দাস, নাম পরমেশ্বর এবং উপাধি কবীন্দ্র। মুসলমান শাসকের মনোরঞ্জনের জন্য ব্রাহ্মণেতর কবি বাংলা মহাভারত রচনায় ব্রতী হন। তাঁর নিজের ভাষায়—

পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি
পুরাণ শুনন্ত নিত্য হরষিত মতি।

ষোড়শ শতকের প্রথমে হুসেন শাহের আমলে তাঁর লস্কর পরাগল খাঁ চট্টগ্রামের শাসক নিযুক্ত হন। সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনী মুসলমান শাসকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু 'সংস্কৃত মহাভারত অতি গুরুতর' হওয়ায় তিনি আদেশ করেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসকে—

'এই সব কথা কহ সংক্ষেপ করিয়া
দিনেকে শুনিতে পারি পাঁচালী রচিয়া।'

পরমেশ্বরের কাব্য অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত। শাসকের অভিলাষ অনুযায়ী

মহাভারতের গুরুভার বর্জন করে কেবলমাত্র কাহিনীর অনুসরণ করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা, দীক্ষা, রাজনীতি, কূটনীতি, ধর্ম, অধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের বৃহৎ জীবনের যে মহৎ পরিচয় মহাভারত ধারণ করে আছে, বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম ভারত পাঁচালী কাব্য 'পাণ্ডববিজয়-পঞ্চালিকা'য় ভারতের সেই পরিচয় নেই।

পরাগল-পুত্র ছুটিখানের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য জৈমিনিসংহিতার অশ্বমেধপর্বকাহিনী বাংলায় অনুবাদ করেন শ্রীকর নন্দী। এর পর বহু কবি কখনও একটি পর্বের, কখনও বা সমগ্র মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করেন। ভণিতা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কেউ বলেছেন 'সংস্কৃত ভারত না বুঝে সর্বজন'; অন্য কেউ বা উল্লেখ করেছেন—

সপ্তদশ পর্ব কথা সংস্কৃতে বন্ধ
মূর্খ বুঝাইতে কৈল পরাকৃত ছন্দ।

সপ্তদশ শতাব্দীর কবি কাশীরাম দাসের চেতনায় মহাভারতের কথা 'অমৃতসমান' হয়ে দেখা দিল। "মূর্খ বুঝাইবার" জন্য নয়, পরম শ্রদ্ধায়, সুকৃতির ফল যাঁদের আছে সেই পুণ্যবানদের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর কাব্য নিবেদন করলেন। তাঁর কাব্য মহাভারতের আক্ষরিক অনুবাদ নয়; মহাভারতের অমৃতরূপ বাংলায় ভাববৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে তাঁর কাব্যে আত্মপ্রকাশ করেছে।

স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর সম্বন্ধে লিখেছেন, "......ইহারা বাঙ্গালীর ঘরের দেবতা। ইঁহাদের শাস্ত্র বঙ্গভাষাতেই লিখিত; বঙ্গীয় গৃহস্থ বধূগণই ইঁহাদের পূজার উৎকৃষ্ট পুরোহিত।" মঙ্গলকাব্যের আদিরূপ ঘরের শাস্ত্রকথা। আদিরূপ ঘরের শাস্ত্রকথায় সংস্কৃত পুরাণের প্রভাব কতটুকু ছিল তা আজ জানা যায় না; কিন্তু শাস্ত্র যেদিন কাব্যে পরিণত হয়েছিল, সেদিন সংস্কৃত পুরাণ মঙ্গলকাব্যে নূতন তাৎপর্য নিয়ে দেখা দেয়।

সংস্কৃত পুরাণের দেবতার রূপ-কল্পনার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পরিবেশের প্রভাবে পৌরাণিক চরিত্র যুগে যুগে বিচিত্র ভাব আত্মস্থ করে এবং নূতন ব্যঞ্জনা লাভ করে। পৌরাণিক চরিত্রে উদার ব্যাপ্তি ও সার্বভৌম সংকেত নিহিত আছে। সমন্বয়ের বিশেষ ধর্ম নিয়েই পৌরাণিক দেবদেবীর

সৃষ্টি হয়। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে হিন্দুধর্মের অবক্ষয় যুগে, ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য বৈদিক হিন্দুধর্ম নিজের মতকে উদার ও গণ্ডীকে প্রসারিত করে। হিন্দুধর্ম লৌকিক ধর্মমতকে স্বীকৃতি দান করে। ফলে বৈদিক দেবগোষ্ঠী পৌরাণিকরূপে রূপায়িত হয়; নূতন দেবদেবীর অবতারণা করা হয়।

বহুযুগ পরে তুর্কী আক্রমণে বিপর্যস্ত বাংলাদেশে প্রায় অনুরূপ ভাবাবহ সৃষ্টি হয়েছিল। বিধর্মী বিদেশীর আক্রমণে হিন্দুধর্ম বিপন্ন হয় এবং হিন্দুধর্মে সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়। পৌরাণিক দেবতা ও লৌকিক দেবতার সংমিশ্রণের ফলে নূতন দেবদেবীর আবির্ভাব হয়। লৌকিক ভাষা নবাগত দেবদেবীর মহিমা-গানে মুখর হয়ে ওঠে।

নবাগত দেবদেবীবৃন্দের পরিচয় লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আর্যদেবতন্ত্রে তাঁদের কোন সুপ্রতিষ্ঠিত আসন নেই। ভক্তত্ব ও দেবত্বকে অধিকার এবং কৌলীন্য অর্জন করার জন্য পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে তাঁরা কৌলিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন; কিন্তু আকৃতি এবং প্রকৃতি তাঁদের সম্পূর্ণ পৃথক। সরীসৃপ দেবতা মনসা মহাভারতের জরৎকারুর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেলেও এবং শিবকন্যার পরিচয় গ্রহণ করলেও, হীন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে, মুহূর্তে তাঁর দেবনির্মোক ত্যাগ করেন। চণ্ডী বিশ্বজননী দুর্গার সঙ্গে একাত্ম হতে চাইলেও সপত্নীকন্যা মনসার প্রতি তাঁর অত্যাচার অবর্ণনীয়। কৃষকদেবতা শিব দেবাদিদেব মহাদেবের মধ্যে বিলীন হয়ে গেলেও স্থান-কাল-মাহাত্ম্যে তাঁর আদিম প্রকৃতি অপ্রকাশিত থাকে না।

পুরাণের বৈচিত্র্য ও বিশালতা বাংলা মঙ্গলকাব্যে নেই। কিন্তু পুরাণের গঠনভঙ্গীকে বাংলা পুরাণ নিজের মত করে অনুসরণ করেছে। পুরাণের সাধারণতঃ পাঁচটি লক্ষণ থাকে :—ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি, (প্রলয়ের পরে) নূতন সৃষ্টি, দেবতা ও ঋষিদের বংশাবলী, মন্বন্তর ও রাজবংশাবলী।

মঙ্গলকাব্য যে আঙ্গিকে গড়ে উঠেছে, সাধারণভাবে তার পরিচয়—বন্দনা, আত্মপরিচয়, দেবখণ্ড ও নরখণ্ড।

দেবমহিমা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষভাবেই এই আঙ্গিকের সৃষ্টি হয়। প্রথম অংশে বন্দনা। আশীঃ, নমস্ক্রিয়া বা বস্তু নির্দেশ দ্বারা সংস্কৃত কাব্যের সূচনা হয়। সেই রীতির অনুসরণ করে মঙ্গলকাব্যের প্রারম্ভিক দেবতাবলীকে বেদে বন্দনা করা হয়।

মহাভারতের সেই বিখ্যাত শ্লোক মঙ্গলকাব্যের শিরোভূষা, যে শ্লোকে নরনারায়ণ, নরোত্তম এবং সরস্বতীকে প্রণতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। বন্দনা সম্প্রদায় বিশেষের দেবদেবী বন্দনা মাত্র নয়—কবি গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারকরূপে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর উপাস্যদের জয়োচ্চারণ করেছেন।

পুরাণের অনুসরণে মঙ্গলকাব্যে সৃষ্টি-কাহিনী আছে, কিন্তু সেই কাহিনী লৌকিক ঐতিহ্য থেকে আহরণ করা হয়েছে। এই সৃষ্টি-কাহিনী নিয়েই মনসা, চণ্ডী ও ধর্মমঙ্গলের আরম্ভ।

আত্মপরিচয় অংশে দেব অথবা দেবীর স্বপ্নাদেশের কথা উল্লেখ করে কাব্যের অপৌরুষের স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করা যায়।

শিবকাহিনী এবং লৌকিক দেবতার সঙ্গে পৌরাণিক দেবতার সম্বন্ধ দেবখণ্ডে বর্ণনা করা হয়।

নরখণ্ডে শাপভ্রষ্ট দেবদেবী নরলোকে জন্মগ্রহণ করে দেবতার পূজা প্রচার করেন।

মঙ্গলকাব্য মানবজীবন-রসপুষ্ট কাব্য। পৌরাণিক দেবকাহিনীতে পৌরাণিক আদর্শ সার্থকতা লাভ করে নি। দেবাদিদেব মহেশ্বর ও জগজ্জননী গৌরীর আখ্যান বর্ণনার সময়েও কবি চাষীজীবনের আনন্দ বেদনাকে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু পৌরাণিক চেতনা ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কার কাব্যকে অন্যরূপে সার্থক করেছে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে বাংলার জীবনে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য বিধি ও অনুশাসনের প্রতিষ্ঠা ছিল। চণ্ডীমঙ্গলে শ্রীমন্তের এবং মনসামঙ্গলে লখীন্দরের বিদ্যার্জন প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যায়, উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর সংস্কৃত কাব্য, ব্যাকরণ ও স্মৃতির সঙ্গে অপরিচয় ছিল না। শিক্ষিত দরদী কবি যেদিন মঙ্গলকাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন, সেদিন পৌরাণিক চেতনা ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কার মঙ্গলকাব্যের স্বরূপ পরিবর্তিত করেছে। সে-যুগের জীবনে পৌরাণিক সংস্কার ও আচারের প্রভাব ছিল। জীবনের কথা প্রসঙ্গে দরদী কবি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে পৌরাণিক চেতনা-নিয়মিত জীবনাদর্শকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই চেতনার আলোকে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, নারায়ণ দেব ও বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁদের সংস্কৃত-জ্ঞান মঙ্গলকাব্যের ভাষাকে অলঙ্কৃত, মার্জিত ও পরিচ্ছন্ন করেছে।

কেবলমাত্র সংস্কৃত বৈদগ্ধ্য ও পৌরাণিক জ্ঞান মঙ্গলকাব্যকে সার্থক করতে পারে নি। সংস্কৃত পাণ্ডিত্য ভারতচন্দ্রের কাব্যকে 'রাজকণ্ঠের মণিমালা'র ঔজ্জ্বল্য দান করেছে, কিন্তু কাব্য জীবনের বেগে ও আবেগে উত্তপ্ত নয়। পৌরাণিক ধারা অনুসরণ করে দুর্গামঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, সূর্যমঙ্গল রচনা এবং মার্কণ্ডেয়াদি পুরাণের অনুবাদ হয়। দেবমহিমাবর্ণনক্রমে বিলহণের চৌরপঞ্চাশিকা অবলম্বনে কঙ্ক, দ্বিজ শ্রীধর, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কর্তৃক রচিত বিদ্যাসুন্দর আখ্যান এই প্রসঙ্গে নিদর্শন স্বরূপ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ভাবপ্রেরণা ও প্রাণস্পর্শের অভাবে এই সব রচনা সাহিত্যগুণ-সমৃদ্ধ নয়, যথার্থ মঙ্গলকাব্য এদের বলা যায় না।

অথচ কোন কোন মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ও শিবায়ন কাব্যে শিবগৌরী আখ্যান বর্ণনার সময়ে সাধারণ জীবনের অনুভূতি যখন প্রকাশিত হয়েছে, তখন কাহিনী রসরূপ লাভ করেছে। পৌরাণিক চরিত্রের উদার ব্যাপ্তির কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সার্থক কবির ভাবকল্পনা দ্বারা পৌরাণিক চরিত্র ও কাহিনী যখন নূতন ব্যঞ্জনা লাভ করে, তখন কবির রচনায় পৌরাণিক চরিত্র ও কাহিনী আধাররূপে সার্থকতা লাভ করে। এ কথা কেবলমাত্র মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে নয়, সকল যুগের কাব্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য। পরম যোগীশ্বর মহাদেব 'যোগিকুলধ্যেয়যোগী'রূপে সর্বত্র বন্দনা লাভ করেন। কিন্তু মহাকবির তূলিকা যখন তাঁর 'কিঞ্চিৎপরিলুপ্তধৈর্যের' চিত্র অঙ্কন করে, তখন মহাদেব চরিত্র নূতন ভাবগরিমা দ্বারা মণ্ডিত হয়। যুগে যুগে সংস্কৃত কাব্য এবং কবিতিকায় ও মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে কবিকল্পনা অনুযায়ী দেব ও দেবী চরিত্র নূতন ভাবসংকেত লাভ করেছে। মন্দ কবির রচনা কখনও যে রসাভাসের সৃষ্টি করেনি তা নয়, কিন্তু সাধারণতঃ রূপসৃজনের যে পদ্ধতির কথা আলোচনা করা হয়েছে, তার দ্বারাই মঙ্গলকাব্যের পৌরাণিক দেবদেবীর চরিত্র সার্থকতা লাভ করেছে।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর বাঙালী কবি জীবনের পটভূমিকায় পৌরাণিক ও লৌকিক দেবতার মহিমা কেবল নয়, মানুষের ভিতর দৈবী মহিমাকে প্রত্যক্ষ করেছিল। মননচিন্তা ও সাধনার পূর্ণতার দ্বারা মানবজীবনের অনন্ত সম্ভাবনা লাভের কথা প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন সংহিতায়,

মহাভারতে ও ভাগবতে বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও একথা বলা হয়েছে, ব্রহ্মসৃষ্ট ব্রাহ্মণময় জগতে তপস্যার দ্বারা শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন, আর দ্বিজ চিন্তা ও কর্মের গ্লানির দ্বারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। বাংলাদেশে এই সত্য অন্ততঃ চিরকাল স্বপ্রকাশ ছিল না। রঘুনন্দনের স্মৃতি-তত্ত্বে ঘোষণা করা হয়, 'দুঃশীলোঽপি দ্বিজঃ কার্যো ন শূদ্রো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।' মানুষের সাধনায় ও প্রার্থনায় অপিহিতমুখ সত্যের উপরের হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ অপসারিত হয়, অন্ধ আচারে আচ্ছন্ন বাংলা দেশে উচ্চারিত হয়, 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।' আদ্বিজচণ্ডালে প্রেম বিতরণ করে চৈতন্যদেব মধ্যযুগের বাংলাদেশে নূতন করে প্রচার করলেন,—মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের কৃতির দ্বারা স্থিত হয়, এবং সে কৃতি মানুষের আন্তরসাধনার উপর নির্ভর করে। ধন নয়, জন নয়, পাণ্ডিত্য নয়, অহৈতুকী ভক্তির দ্বারা দুর্গতের পরিত্রাণ হয়, সংশয়-ক্লব্ধ চিত্ত শান্তি লাভ করে। এ সত্য কেবল জ্ঞানে নয়, প্রেমাদর্শের মাধ্যমে মহাপ্রভুর জীবনাচরণে মূর্ত হয়। জীবনের বহিরঙ্গে নামসংকীর্তনদ্বারা দুর্গতোদ্ধার, অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণলীলারসাস্বাদন এক নূতন চেতনার সৃষ্টি করে। সমসাময়িক কালে সমসাময়িক মানুষের ভিতর ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে বৈষ্ণবগণ ভাগবতকে আদর্শ করে প্রমাণ করেন, শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের অবতার; তিনি রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতমূর্তি। কৃষ্ণের সকল লীলার ভিতর নরলীলা সর্বোত্তম এবং নরবপু তাঁর স্বরূপ। নবদ্বীপ, নীলাচল এবং বৃন্দাবনকে কেন্দ্র করে যে বৃহত্তর বৈষ্ণব সমাজ গড়ে ওঠে, সে সমাজে কেবল বাংলায় নয় সর্ব ভারতীয় সাংস্কৃতিক ভাষা সংস্কৃতে, এই বিশ্বাস ও তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সাহিত্য, অলঙ্কার ও দর্শন রচনা করা হয়। বৈষ্ণব প্রেরণা দ্বারা সৃষ্ট বাংলা শাস্ত্র-সাহিত্য এই সকল সংস্কৃত রচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়।

বাংলায় লেখা চৈতন্যজীবনীতে এই প্রভাব প্রথম লক্ষ্য করা যায়। কবি কর্ণপুর ও মুরারিগুপ্ত সংস্কৃতে চৈতন্যজীবনী রচনা করেছিলেন। সংস্কৃত রীতি অনুসরণ করায় তাঁদের রচনায় শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টা প্রাধান্য লাভ করেছিল। সংস্কৃত জীবনীর মত চৈতন্যজীবনের অলৌকিকত্বের পরিচয় বাংলায় লেখা চৈতন্য-জীবনীসমূহেও আছে, কিন্তু তাঁর মানবরূপও এই সকল

গ্রন্থে অনুপস্থিত নয়। দিব্য প্রেরণাময় জীবন অঙ্কন করার জন্য বৃন্দাবনদাস ভাগবতের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থের নাম প্রথমে চৈতন্যমঙ্গল ছিল, কিন্তু ভাগবতের অনুসরণে রচিত হওয়ায় গ্রন্থের নূতন নামকরণ হয় চৈতন্যভাগবত। সংস্কৃতজ্ঞ বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ থেকে শ্লোকের উদ্ধৃতি আছে।

চৈতন্যদেবের নবদ্বীপলীলা ও বহিরঙ্গ জীবনের আচার আচরণের মহিমা বৃন্দাবন দাসকে উদ্বুদ্ধ করে, আর শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ জীবনের মহিমা কৃষ্ণদাস কবিরাজকে ভক্তিবিহ্বল তত্ত্বসঙ্কুল রচনায় অনুপ্রাণিত করে। তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার জন্য কৃষ্ণদাস সংস্কৃত শাস্ত্র এবং কাব্যের বহু অংশ উদ্ধৃত করেন। তাঁর কাব্যের একতৃতীয়াংশ সংস্কৃত শ্লোকে পূর্ণ, আবার সংস্কৃত শ্লোকের অধেক ভাগবত থেকে সংগৃহীত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্য এবং শাস্ত্রে কৃষ্ণদাসের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। বিচার বিতর্কের রীতি ও ভাষায় এবং মাঝে মাঝে কাব্যগুণমণ্ডিত সংস্কৃত ও বাংলা পদে তার পরিচয় আছে। বৈষ্ণব ধর্মাদর্শ প্রচারের ফলে বাংলা সাহিত্যের যেমন উন্নতি হয়, সংস্কৃত এবং বাংলার সংযোগও তেমন সুদৃঢ় হয়। চৈতন্যচরিতামৃতে সংস্কৃত শ্লোকের প্রাচুর্যের জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ সচেতন ছিলেন, তবু তিনি পাঠকদের কাছে দাবী করেছেন,—

ভাগবত শ্লোকময় টীকা তার সংস্কৃত হয়
তবু কৈছে বুঝে ত্রিভুবন
ইহাঁ শ্লোক দুই চারি তার ব্যাখ্যা ভাষা করি
কেন না বুঝিবে সর্বজন।

দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে সংস্কৃত শ্লোকের 'ভাষা ব্যাখ্যা' দার্শনিক তত্ত্ব-বিচার এবং মতবাদ প্রতিষ্ঠার বাংলা ভাষা প্রথম নিয়োজিত হয়। নূতন পরীক্ষায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের সফলতার পরিমাণ কম নয়।

বৈষ্ণব সাধনায়, সঙ্গীতের মাধ্যমে আরাধ্য দেবতার বন্দনা সাহিত্যে নূতন সম্ভাবনার সূচনা করে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বৈষ্ণব কবিতা, মহাজন পদাবলী নামে পরিচিত হয়। গানের দুই ছত্র হিসাবে পদের প্রথম ব্যবহার পাওয়া যায় 'গীতগোবিন্দে'। রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক 'পদ' সংস্কৃতে রচনা করেন কবি জয়দেব, আর ব্রজবুলিতে করেন মিথিলার কবি বিদ্যাপতি।

বাঙালী বৈষ্ণব গীতিকবিদের পদাবলী এঁদের রচনা দ্বারা প্রভাবিত। প্রকীর্ণ সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিতার মত বিদ্যাপতি স্বল্পপরিসর পদে রাধাকৃষ্ণলীলা রচনা করেন। কিন্তু, তাঁর কাব্যের সুরধর্ম এবং কাব্যের আধারের শিল্পকর্ম দেখে মনে হয়, তিনি জয়দেবের যথার্থ উত্তরাধিকারী। উত্তরাধিকার গ্রহণ করেও বিদ্যাপতি অভিসার ও বিরহের পদে, ভাবের দিকে, জয়দেবকে অতিক্রম করে গিয়েছেন। কালিদাস ও জয়দেবের বিরহ পদের কাব্যসুষমা অনবদ্য। কিন্তু বিদ্যাপতির বিরহ ও অভিসারের পদে প্রাণের যে উত্তাপ ও গতিবেগ আছে, কালিদাস ও জয়দেবের পদে সেই বেগ ও তাপ অনুভব করা যায় না। পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীতে ঐ বেগ ও তাপ অনুভব করা যায়।

চৈতন্যদেবের প্রেমাদর্শের প্রেরণায় বৈষ্ণব পদাবলী নূতন গতিবেগ লাভ করে। গৌরকান্তি শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণার্তি ও পদাবলীর রাধার কৃষ্ণার্তি অভিন্ন হয়ে দেখা দেয়। চৈতন্যপরবর্তী যুগের পদাবলী বৃন্দাবনের গোস্বামীদের ধ্যান ও ধারণার দ্বারা শোভিত হয়ে তাত্ত্বিক ও আলঙ্কারিক সংহতি লাভ করে। রূপের রচনা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র আশ্রয় করে বৈষ্ণব রসস্বরূপকে নূতন করে প্রকাশ করেছে। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী বিশেষভাবে উজ্জ্বলনীলমণির রসাদর্শকে গ্রহণ করেছে।

জয়দেব ও বিদ্যাপতির কাব্যের মণ্ডনরীতি ও শিল্পচাতুর্য বৈষ্ণব কবিদের আদর্শ ছিল। চৈতন্য-পরবর্তীযুগে বৈষ্ণবপদ রচনায় বিশেষভাবে ব্রজবুলির ব্যবহার আরম্ভ হয়। ব্রজবুলিতে লৌকিক শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দও যথেষ্ট আছে। চৈতন্যদেবের ভাবপ্রেরণার ফলে লৌকিক ভাব ভাষা ভঙ্গী ও সংস্কৃত ভাব ভাষা ভঙ্গীর সুষ্ঠু সমন্বয় হয়। চৈতন্যদেব লোকজীবন কেবল নয়, লোক-সংস্কার ও লোকবিশ্বাসকেও মর্যাদা দান করেছিলেন। নৌকালীলা দানলীলার অভিনয় ও লৌকিক প্রেমগীতের দ্বারা কৃষ্ণবিরহকাতর চৈতন্য কৃষ্ণলীলারস আস্বাদন করতেন। শীলভট্টারিকার লেখা 'যঃ কৌমারহরঃ' ইত্যাদি শ্লোক মহাপ্রভুকে ভাববিহ্বল করে তুলত। ক্রমশঃ প্রকীর্ণ সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিতার স্বল্পায়তন আধার লৌকিক ভাব, ভঙ্গী ও বাক্‌শিল্পমিশ্রিত রূপ বৈষ্ণব পদাবলীকে প্রভাবিত করে। কেবল শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণবিরহ নয়

সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতাবলীর বিরহিণীদের বিরহভাবনা দ্বারা রাধার বিরহবেদনাও ভাবিত হয়। কেবল বৈষ্ণবসাহিত্যে নয়, বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বারমাস্যারও কালিদাসের 'ঋতুসংহারে'র প্রভাব আছে বলে মনে করা হয়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে, লৌকিক ভাষাভঙ্গীর সরসতা ও তীক্ষ্ণতা এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ভাবগাম্ভীর্য ও রূপ-সৌন্দর্য আশ্রয় করে বাংলা সাহিত্য প্রথম আত্মপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যে পরিণত হয়। চৈতন্যোত্তর ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের সাহিত্য সংস্কৃত সাহিত্যের ঐশ্বর্যকে ধারণ ও বহন করার শক্তি অর্জন করে। ব্যর্থ অনুকরণ নয়, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাণসার গ্রহণ করে বাংলার মানস রসায়নে রসায়িত নব রূপ ও ভাবযুক্ত বাংলাসাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। চৈতন্যের সময়ও বাংলাদেশে সংস্কৃত বৈষ্ণবগ্রন্থাদির বঙ্গানুবাদ হয়েছিল; যথা রূপগোস্বামীর ললিতমাধব নাটকের স্বরূপগোস্বামী কর্তৃক 'প্রেমকদম্ব' নামক কাব্যরূপে অনুবাদ, উজ্জ্বলনীলমণির জগন্নাথ দাস-কৃত অনুবাদ উজ্জ্বলরস ইত্যাদি। সেযুগে বাংলা ভাষায় সৃষ্টি কবার প্রেরণা অনুভব করলেও বাঙালী শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি প্রেরণার পথে অনেক বাধা ছিল। ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার জন্য এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, জীবনে যা কিছু পবিত্র, যা কিছু মধুর, তার আধার সংস্কৃত। বিশেষতঃ সর্বভারতীয় সাহিত্যিক ভাষা সংস্কৃতে রচনা করে বাঙালী শিল্পীর বৃহত্তর বিদগ্ধ সমাজে খ্যাতি লাভ করার সম্ভাবনা ছিল। চৈতন্যদেব লৌকিক ভাব ও ভাষাকে মর্যাদা দান করেছিলেন; ফলে বাঙালী তার নবলব্ধ জীবনবোধকে সংস্কৃত এবং ভাষায় একসঙ্গে প্রকাশ করে। অবশ্য, শিল্পি-চিত্তের সংশয় সম্পূর্ণ যে দূর হয়েছিল একথা বলা যায় না। ষোড়শ শতাব্দীর রচনা গোপালবিজয়ের ভূমিকায় কবিশেখর বলেছেন—

কহে কবিশেখর করিয়া পুটাঞ্জলি,
হাসিয়া না ফেলাহ লৌকিক ভাষা বলি।

কৌলীন্যহীনতার জন্য সঙ্কোচ থাকলেও বাংলা ভাষায় সৃষ্টিপ্রেরণা অনুভব করেছিলেন কবি; সেজন্য ভাষার মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করে বলেছেন—

লৌকিক বলিয়া না করিহ উপহাসে
লৌকিক মন্ত্রে সি সাপের বিষ নাশে।

ভাবপ্রেরণা যতদিন অকৃত্রিম ছিল, ততদিন 'লৌকিক মন্ত্র' সার্থক হয়েছিল; কিন্তু প্রেরণার অভাবে বৈষ্ণব পদাবলী, অনুবাদ ও মঙ্গলকাব্য গতানুগতিক লেখাতে পর্যবসিত হয়। বরং সপ্তদশ শতকের শেষ থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের বাউল গান ও শাক্তপদাবলী নূতন ভাব-চেতনার পরিচয় বহন করে। বাউলের গানের মনের মানুষ ভাব মাত্র সত্তা, বাউলের গান তান্ত্রিক সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া, সূফী ধর্মমত এবং হিন্দু দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। বাউলের গান মরমী কবির রচনা; এই মরম ধর্ম subjectivism রূপে আধুনিক গীতিকবিতায় দেখা দিয়েছে।

বাঙালী কবি সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতির পদে তান্ত্রিক পরিকল্পনানুসারী দেবীর ভয়ঙ্করী ঘোরা মূর্তির সঙ্গে দেবীর মাধুর্যময়ী মূর্তিও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। জীবনযন্ত্রণায় বিক্ষুব্ধ ভক্ত কবি তাঁর সংশয় দ্বন্দ্ব ও প্রতীতির কথা কখনও হাসিতে অশ্রুতে, কখনও অভিমানে, দেবীর কাছে নিবেদন করেছেন। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে বাংলার সাধারণ ঘরে যে উমারা ছিলেন, তাঁদের বাল্যলীলা ও দাম্পত্য জীবনের ছবি হর-জায়া গিরি-সুতার লীলাখ্যানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তত্ত্বানুভূতি ও মানবজীবনরসকে কবি এক সঙ্গে আস্বাদ করেছেন।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে কবি, যাত্রা, তর্জা, টপ্পা ও আখড়াই গানের বিশেষ চর্চা হয়। রাধাকৃষ্ণলীলা, শক্তিমহিমা বিশেষভাবে এই সকল গানের বিষয়বস্তু। কৃষ্ণকমল গোস্বামী ও দাশরথি রায়ের কোন কোন পদে এবং কবিওয়ালাদের কোন কোন গানে পৌরাণিক মহিমা বোধ ও ভক্তিরসের স্ফুরণ আছে। কিন্তু সাধারণ ভাবে ধর্ম-সম্পর্ক-বিরহিত মানবীয় অনুভূতি এই সকল রচনার ভাব-উৎস।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনায় দুই ভিন্ন ধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রভাকর-সম্পাদক রূপে গুপ্ত কবি সম্পাদনা, সাহিত্য সমালোচনা, প্রাচীন সাহিত্য উদ্ধার ও সমসাময়িক ঘটনার বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। এই দৃষ্টি-কোণ থেকে বোধ হয় তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকটি শ্লোকের এবং বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদসমূহের ভিতর 'হিতপ্রভাকর', 'প্রবোধপ্রভাকর', 'বোধেন্দুবিকাশ' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ

উল্লেখযোগ্য। কিন্তু গুপ্ত কবি গভীর জীবন-দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন না। পিতাপুত্রের দীর্ঘ তত্ত্বালোচনা-বিষয়ক কবিতা এবং মহাকালীর স্তব, বেদান্ত, ন্যায় এবং তন্ত্রের আলোচনার স্তরে সীমাবদ্ধ। তাঁর রচনা গভীর উপলব্ধির কোন পরিচয় বহন করে না। কবির প্রকাশবাহনও সার্থক নয়। অনুপ্রাস-যমক-কণ্টকিত রচনাভঙ্গীতে কবিওয়ালাদের উত্তরাধিকার লক্ষ্য করা যায়।

ঈশ্বরগুপ্তের অন্যতম শিষ্য মদনমোহন তর্কালঙ্কার সুবন্ধু-রচিত গদ্যকাব্য বাসবদত্তার কাহিনী আশ্রয় করে বিদ্যাসুন্দরী রীতিতে দীর্ঘ আখ্যানকাব্য রচনা করেন। তাঁর অপর গ্রন্থ রস-তরঙ্গিণী সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। গ্রন্থকারের নিজের ভাষায় উদ্ভট শ্লোকের 'আদ্যরসঘটিত শ্লোকসকল' তিনি এই গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে নূতন কাব্যধারার সূচনা করেন। পদ্মিনী-উপাখ্যানের ভূমিকায় রঙ্গলাল লিখেছিলেন, 'পুরাণেতিহাসে বর্ণিত বিবিধ আখ্যানে' অলৌকিক বর্ণনা থাকাতে তিনি 'রাজপুত্রেতিহাস' অবলম্বন পূর্বক তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। রঙ্গলাল সর্বপ্রথম প্রতীচ্য রীতি অনুযায়ী ঐতিহাসিক কাহিনী আশ্রয় করে দেশাত্মবোধক কাব্য রচনা করেন। কিন্তু রঙ্গলালের পক্ষে 'পুরাণেতিহাসবর্ণিত' অলৌকিকতা পরিহার করা সব সময় সম্ভব হয়নি। কাঞ্চীকাবেরীকাব্যে দেবশক্তির অলৌকিক আখ্যান প্রাধান্য লাভ করেছে। রঙ্গলাল কুমারসম্ভবের কয়েকটি সর্গ এবং উদ্ভট শ্লোকের বঙ্গানুবাদ করেন। সংস্কৃতের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের জন্য তাঁর কাব্যে সংস্কৃত বাক্যাংশের অনুপ্রবেশ ঘটেছে যেমন,—'মাগুণে শ্রুতিং দেহি' অথবা, 'সর্বথা পুত্রস্য অর্থে দুহিতাসুতকে"।

মধুসূদনের জীবনকাহিনী থেকে জানা যায়, কাব্য এবং নাটক রচনা করার পূর্বে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য পুনরায় পাঠ করেছিলেন। কাব্যের বিষয়বস্তু-সংগ্রহে এবং নামকরণে তিনি প্রাচ্য সাহিত্যের উপর নির্ভর করলেও শিল্পাঙ্গিক প্রতীচ্য শিল্পভাণ্ডার থেকে আহরণ করেছেন। তিলোত্তমাসম্ভব এবং মেঘনাদবধ কাব্যের নামকরণ সংস্কৃত সাহিত্যের কুমারসম্ভব এবং শিশুপালবধ কাব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মধুসূদন প্রথম কবি, যাঁর রচনায় প্রাচ্য এবং

প্রতীচ্য ভাবচেতনা সমীকৃত হয়ে এক নূতন চেতনার সৃষ্টি করেছে ; এ পরিচয় পূর্বে এদেশে ছিল না। এই নূতন চেতনার জাগরণে প্রাচ্য ভাবাদর্শ কিভাবে সমীকৃত হয়েছিল, মেঘনাদবধ কাব্য আলোচনা করলে তা প্রত্যক্ষ করা যায়।

মেঘনাদবধ কাব্যে মধুসূদন রাম-রাবণের কাহিনী আধার রূপে নির্বাচন করেছিলেন। প্রাচীন চরিত্র ও কাহিনী এই কাব্যে নূতন অর্থ, নূতন সত্তা লাভ করেছে। আত্মকৃত কোন কর্মের ফলাফলের জন্য অথবা দৈবকৃত কোন বাধা জীবনে উপস্থিত হোক না কেন, তার কাছে পরাভব স্বীকার না করে আপন শক্তিকে উন্নত রাখার যে মহিমা, সেই মহিমা রাবণ চরিত্রে কেবল নয়, মেঘনাদবধ কাব্যের প্রায় সকল চরিত্রে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মধুসূদন যুগবাসনার অনুবর্তন করে এই সত্য অনুভব করেছিলেন, এবং আরো অনুভব করেছিলেন যে এই মহৎ ভাবকে ধারণ করার শক্তি একমাত্র বাল্মীকির রামায়ণের রাবণ চরিত্রে নিহিত আছে। বাল্মীকির রামায়ণে লঙ্কা দগ্ধ হওয়ার পর বন্ধনক্লিষ্ট হনূমান রাবণকে দেখে মোহিত হয়ে ভেবেছিল, "ওঃ কি রূপ, কি ধৈর্য, কি শক্তি, কি দ্যুতি, রাক্ষসরাজের সর্বাঙ্গে কি সুলক্ষণ। যদি এঁর অধর্ম প্রবল না হোত তবে ইনি ইন্দ্রসমেত সুরালোকের রক্ষক হতেন।" ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিদৃষ্টি যুগান্তরের আলোকে নূতন মূল্যবোধের সহায়তায় রাবণ চরিত্রের শাশ্বত রূপ, ধৈর্য, শক্তি এবং দ্যুতির বিকাশ নূতন করে উপলব্ধি করেছে। এই মহৎ ভাবের রূপায়ণে, মধুসূদনের কবিভাষা বিশেষভাবে সংস্কৃত শিল্পভাণ্ডার থেকে মণ্ডনক্রিয়ার উপকরণ সংগ্রহ করেছে। অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ, উপমা অলংকার তিনি অক্লেশে ব্যবহার করেছেন ভাবের ওজস্বিতা প্রকাশের জন্য।

মেঘনাদবধ কাব্য অথবা মধুসূদনের সমগ্র সাহিত্যকৃতির আলোচনা এই স্বল্পপরিসরে সম্ভব নয়। কিন্তু মধুসূদনের সাহিত্যকৃতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে একথা বলা যায়, প্রাচীন কাহিনীতে ও চরিত্রে যে সম্ভাবনা অস্ফুট ছিল মহাকবির কল্পনা সেই সম্ভাবনাকে সার্থকভাবে স্ফুটতর করেছে।

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র মধুসূদনকে অনুসরণ করলেও সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পুরাণ-কাহিনীকে তাঁদের কাব্যে ব্যবহার করেছিলেন। ঊনবিংশ

শতকের বুদ্ধিবাদ ও যুক্তিবাদের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে তাঁরা পৌরাণিক কাহিনীর রূপক ব্যাখ্যা করেছেন, হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের তত্ত্বগ্রাহ্য রূপ ও মহিমা প্রকাশ করেছেন। হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার ও দশমহাবিদ্যা কাব্যে পুরাণ কাহিনীর যথাযথ অনুসরণ নেই। তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার জন্য বৃত্রসংহার কাব্যে পরলোকের বিবরণ, ব্রহ্ম ও শিবলোকের বর্ণনা সংযুক্ত হয়েছে। উনবিংশ শতকের বিবর্তনবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হেমচন্দ্র দশমহাবিদ্যার আখ্যানের রূপান্তর সাধন করেছেন। বৃত্রসংহার কাব্যে পাতালপুরে দেবতাদের মন্ত্রণা, বিশ্বকর্মার যন্ত্রশালার বর্ণনা ইত্যাদি দুই এক জায়গা ছাড়া অন্যত্র চরিত্র অথবা কাহিনী কোন বিশেষ তাৎপর্যের দ্বারা মণ্ডিত হয়ে রসব্যঞ্জনা লাভ করেনি।

রৈবতক, কুরুক্ষেত্র এবং প্রভাস-এ কবি নবীনচন্দ্র সেন যুগধর্মের ব্যাখ্যাতা। মহাভারতীয় পটভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণের জীবনের মধ্যে কবি পতিত ভারতবাসী পতিত মানবজাতির জন্য মহৎ জীবনাদর্শের সন্ধান করেছেন। এই সন্ধান তত্ত্বচিন্তার স্তরে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে, সার্থক কবিপ্রেরণাতে রূপান্তরিত হয়নি। কবির তত্ত্বচিন্তাও সুনির্দিষ্ট নয়। রৈবতক কাব্যে গীতার জ্ঞানযোগ কর্মযোগের বিস্তার ও আর্য অনার্য মিলনের পরিকল্পনা প্রভাস কাব্যে হরিনাম ধ্বনিতে পর্যবসিত হয়েছে।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের অনুসরণ না করে কবি বিহারীলালের কল্পনা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে পরিক্রমণ করেছে। বাংলা সাহিত্যে বিহারীলাল আধুনিক রোমান্টিক কবিতার প্রথম উদ্গাতা। প্রতীচ্য ভাবাদর্শের সঙ্গে ক্রমপরিচয়ের ফলে এদেশে আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধের জাগরণ হয়। এই স্বাতন্ত্র্যবোধ চিরাগত ধর্মভাব থেকে মুক্ত হয়ে যেখানে আত্মভাব সাধনার সূচনা করেছে, সেখানে কবিমানসে রোমান্টিক ভাবকল্পনার উৎসার সম্ভব হয়েছে। বিহারীলাল সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর অপরিচয় ছিল না। বিহারীলালের শ্রেষ্ঠকাব্য সারদামঙ্গল। সারদামঙ্গল কাব্যে কবির রোমান্টিক কল্পনার স্বপ্নচারণের অন্যতম ক্ষেত্র বাল্মীকি ও কালিদাসের কাল। কালিদাসের দুষ্মন্ত নেপথ্যবর্তিনীর গান শুনে ইষ্টজনবিরহের কথা স্মরণ করতে না পেরে অনির্দেশ্য বেদনাবোধে ব্যাকুল হয়েছেন। কবি বিহারী-লাল প্রীতি-বিরহ, মৈত্রী-বিরহ ও সরস্বতী-বিরহে বিরহাকুল হয়ে সারদামঙ্গল

কাব্য রচনা করেন। কবির সারদা 'বিশ্বমোহিনী', 'বিশ্ববিকাশিনী' শক্তি, বিশ্বব্যাপ্ত সৌন্দর্য ও মানবীয় প্রেমমাধুর্যের সমন্বিত রূপ। মনোলীনা এই রহস্যময়ীর সন্ধানে কবি অতীত সারস্বত কল্পনার স্বপ্নলোকে বিচরণ করেছেন। বৈদিক ঊষার যুগে, বাল্মীকির কালে ও কালিদাসের কালে কবি সরস্বতীর লীলায়িত আবির্ভাবের মূর্তি অঙ্কিত করেছেন। 'সাধের আসন' কাব্যে কবি অনুভব করেছেন, কবির আরাধ্যধন ও 'যোগীন্দ্রের ধ্যানধন' অভিন্ন। সর্বভূতে অবস্থিত কান্তিরূপিণী দেবী সারদা বিশ্বসৃষ্টির মূল শক্তি। চণ্ডীর বিখ্যাত শ্লোক সহায়তায় সারদা বন্দনা, সর্গসূচনায় সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতি, প্রকৃতি বর্ণনার পদে কালিদাসের কাব্যের ভাবমাধুর্য থেকে মনে হয়, কবিকল্পনার বিচরণক্ষেত্র বিশেষভাবে সংস্কৃত ভাবজগৎ। সংস্কৃত-কাব্যের ভাবমাধুর্য থাকা সত্ত্বেও, বিহারীলালের ভাষা সার্থক নয়। কবি স্বপ্নলোকে বিচরণ করেছেন, কিন্তু তাঁর স্বপ্ন ভাষায় ও ভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। স্বপ্নের জড়িমা বিহারীলালের কাব্যরূপে অপরিচ্ছন্নতার সৃষ্টি করেছে।

বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরের, কিন্তু বাংলা নাটক মাত্র এক শতকের পরিচয় বহন করে। নাটক-সমৃদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের পূর্ণ ঐতিহ্য সত্ত্বেও পয়ারে সংস্কৃত নাটকের কয়েকটি অনুবাদ ছাড়া চর্যাযুগ থেকে আরম্ভ করে ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বাংলায় নাটক রচনার কোন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। চৈতন্যদেবের ভাবাদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে চৈতন্য-পরিকরগণ বাংলায় নয়, সংস্কৃতে নাটক রচনা করেন। চৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমাদর্শ যে ধর্মসচেতন ভাবাবহ সৃষ্টি করেছিল, সেই ভাবাবহে ইহলৌকিক বস্তুগত জীবনের রূপায়ণ সম্ভব ছিল না। সেজন্য বাংলায় দৃশ্যকাব্য রচিত হয়েছিল; কিন্তু তা নাটক নয়, যাত্রা। বাংলা দেশের যাত্রা সংস্কৃত নাটকের বিবর্তিত রূপ না স্বতউদ্ভূত সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তবে, সংস্কৃত নাট্যসংস্কার যে কিছু পরিমাণে যাত্রাকে প্রভাবিত করেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সংস্কৃত নাটকের মত যাত্রাও সাধারণতঃ মিলনানন্দময় পরিণামে সমাপ্ত হোত।

ইংরেজের নির্মিত রঙ্গমঞ্চে ইংরেজী নাটকের অভিনয় এবং সেক্সপীয়ারের নাটকের পঠন-পাঠন শিক্ষিত বাঙালীকে নাটক অভিনয় ও নাটক রচনায় উৎসাহিত করে। বলা যায়, নাটক রচনার প্রথম যুগে সচেতন এবং অসচেতন

উভয় শ্রেণীর লেখকের দৃষ্টি ইংরেজী নাটকের সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। অনেক সময় সংস্কৃত নাটকের আদর্শ পরিহার করার ইচ্ছা থাকলেও প্রথম যুগের নাট্যকারগণ সংস্কৃত নাট্যসংস্কার সম্পূর্ণ অতিক্রম করে যেতে পারেন নি। সংস্কৃত নাট্যরীতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যায় যে সংস্কৃত নাটক কাহিনী-প্রধান, ঘটনানির্ভর নয়। নান্দীকে অবলম্বন করে সংস্কৃত নাটকের আরম্ভ। নান্দীতে জগতের সেই পরমাধারকে বন্দনা করা হয়, যিনি কল্যাণময় ও আনন্দময়। সংস্কৃত নাটকে যুদ্ধ মৃত্যু ইত্যাদি মর-জীবন-বেদনার চিত্র রচনা নিষিদ্ধ। সংস্কৃত নাটকে নাট্যকার জীবনের সুখ-দুঃখ-বেদনানন্দময় পরিপূর্ণ স্বরূপের সন্ধানী নন। কেবলমাত্র জীবনের আনন্দময় মুহূর্তগুলির সংযোগ ও সামঞ্জস্য বিধান তাঁর কবি-কল্পনার প্রধান প্রচেষ্টা। প্রথম যুগের নাট্যকারগণ তাঁদের রচনায় ইংরেজী নাটকের আঙ্গিক গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সংস্কৃত নাট্যরীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

১৮৫২ সালে রচিত মৌলিক নাটক 'কীর্তিবিলাস' ও 'ভদ্রার্জুন' নাটকের ভূমিকায় লেখকদ্বয় সংস্কৃত এবং ইউরোপীয় নাট্যরীতির তুলনামূলক আলোচনা করে সংস্কৃত নাট্যরীতি পরিহার করার কথা ঘোষণা করেন। 'ভদ্রার্জুন' নাটকে নান্দী, প্রস্তাবনা এবং বিদূষক-ভূমিকা বাদ গেলেও রচনা সংস্কৃত নাটকের মত কাহিনীপ্রধান। 'কীর্তিবিলাস' নাটক লেখকের ভাষায় 'সুখাভিনয়' নয়, 'করুণাভিনয়'। কিন্তু বাংলা ভাষার এই প্রথম ট্রাজেডি নান্দী ও সূত্রধারের কথার মাধ্যমে আরম্ভ হয়ে সংস্কৃত নাট্যরীতিকে অনুসরণ করেছে। রামনারায়ণ তর্করত্ন বাস্তব কাহিনী আশ্রয় করে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক রচনা করেন; তাঁর রচনা সংস্কৃত প্রহসনের লক্ষণাক্রান্ত।

কেবলমাত্র প্রাচ্য অথবা প্রতীচ্য নাট্যকলার পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাংলা নাটককে সার্থকতার পথে উন্নীত করতে পারে নি। বাংলা নাট্যসাহিত্যে সার্থকতার সম্ভাবনা তখনই সূচিত হয়েছে, যখন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য রীতি সমন্বিত হয়ে তৃতীয় এক নূতন রীতিকে নাট্যসাহিত্যে সঞ্চারিত করেছে। মধুসূদন এই রীতির প্রবর্তক। সংস্কৃত আলঙ্কারিকের অনুশাসন অমান্য করলেও মধুসূদনের নাটকে সংস্কৃত নাটকের কাব্যময় রূপ ও ভাষার গাম্ভীর্যের উত্তরাধিকার অস্বীকৃত নয়।

সংস্কৃত অথবা ইউরোপীয় যে রীতিই অনুসৃত হোক না কেন, নাট্যকারগণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল যাত্রায়। বাংলার জলবায়ু যেরকম তাঁরা গ্রহণ করতেন, সেরকম তাঁদের রচনায় তাঁদের অগোচরে যাত্রার প্রভাব সক্রিয় হয়েছে। মধুসূদন ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই রীতির ব্যতিক্রম। এর প্রথম কারণ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল[১], দ্বিতীয় কারণ বিদগ্ধ সম্প্রদায়ের জন্য ধনীর প্রাসাদে নির্মিত রঙ্গালয়ের প্রয়োজন সিদ্ধ করেছিল তাঁদের নাটক। কিন্তু জনসাধারণ রচনার লক্ষ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রারীতি নাটকে অনুসৃত হয়। সঙ্গীতের আধিক্য, ধর্মভাব, অতিভাষণ ও কল্পনার আতিশয্য প্রকাশ যাত্রার পৌরাণিক কাহিনী অভিনয়ের বিশেষ কতগুলি অঙ্গ ছিল। বাংলা পৌরাণিক নাটকে কেবল নয়, সামাজিক নাটকেও সংস্কৃত ও ইউরোপীয় নাটকের প্রভাবের সঙ্গে যাত্রা-প্রভাবও সঞ্চারিত হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণে সাধারণ লোকের চরিত্রচিত্রণ সার্থক। কিন্তু বিয়োগান্ত নাটকে সংস্কৃত নাটকের অন্ধ অনুকরণে উচ্চশ্রেণীর কৃত্রিম ভাব ও পণ্ডিতী সংলাপ, যাত্রার অনুসরণে পৌনঃপুনিক পতন ও মৃত্যু এবং স্থান-কাল বিস্মৃত হয়ে মৃত ব্যক্তির সামনে আভিধানিক ভাষায় শোকজ্ঞাপক বক্তৃতা, সার্থক চরিত্র চিত্রণ সত্ত্বেও নাটকের সম্ভাবিত রসপরিণামকে ব্যর্থ করেছে। মনোমোহন বসুর নাটক, যাত্রা এবং নাটক দুই ভাবেই অভিনীত হোত। সতী নাটকে বিচ্ছেদের পর মিলনান্ত অঙ্ক সংযুক্ত করে 'বিয়োগান্ত-প্রিয় মহাশয়' ও 'পুনর্মিলনানুরাগী' মহাশয়গণের উপর গ্রহণ ও বর্জনের ভার অর্পণ করা হয়েছে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঐতিহাসিক, সামাজিক ও পৌরাণিক কাহিনী আশ্রয় করে বহু নাটক রচনা করেন। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের সঙ্গ তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। সহজ ভক্তিরস ও দেশাত্মবোধ তাঁর নাটকে উৎসারিত হয়েছে। কিন্তু নাটকের সকল বিচিত্র ভাবই অবশেষে ধর্মভাবের পরিণতিতে সমাপ্তি লাভ করেছে। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাট্যগ্রন্থ জনা,—বিয়োগান্ত। নাট্যকাহিনী সমাপ্ত হওয়ার পরেও, ক্রোড়াঙ্ক যোজনা করে, মরলোকে নয়, অমরলোকে মিলনদৃশ্য অঙ্কন করা হয়েছে।

১। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বহু সংস্কৃত ও ফরাসী নাটকের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন।

ইংরেজ আগমনের ফলে বাংলা নাটকের মত বাংলা গদ্য চর্চারও বিশেষ সূচনা হয়। খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের জন্য পুস্তিকা প্রচার ও সাময়িক পত্র সম্পাদনা করার সময়, শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ প্রথম অনুভব করেছিলেন, হিন্দুধর্মের বিরোধিতাব জন্য সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে বাল্মীকি রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রভৃতি মুদ্রিত হয়। মিশন সম্পাদিত দিগ্‌দর্শন ও সমাচারদর্পণ নামক মাসিক পত্রিকায় বিবিধ বিষয়ের সঙ্গে হিন্দু ধর্মেব বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

অন্যদিকে শাসকবৃন্দের প্রচেষ্টায় হ্যালহেড বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। ব্যাকরণে উপনিষদের কয়েকটি শ্লোক উদ্ধাব করা হয়। নামপত্রে লেখা ছিল, "বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং ক্রিয়তে হালেদাঙ্গ্রেজী।" হ্যালহেডের ব্যাকবণ এবং এই সময়ে আইন অনুবাদের দ্বারা সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার নিকট সম্পর্ক আবিষ্কৃত হয়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়ম কেরীও বাংলা ভাষার যথার্থ পরিচয় আবিষ্কার করেন। তাঁব নিজের ভাষায়, "The Bengali may be considered as more nearly allied to the Sanskrit than any of the other languages of India."

তরুণ সিভিলিয়নদের কথ্য ভাষা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে 'কথোপকথন' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ-ভূমিকায় কেরী উল্লেখ করেছেন, ভাষা শিক্ষার জন্য কথ্য রীতির সঙ্গে সঙ্গে "Higher Classical Work"-এর সঙ্গেও পরিচয় প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে কেরীর নির্দেশে সংস্কৃত গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হয় এবং কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থ রচিত হয়।

বাংলা গদ্য রচনা করার সময়, সংস্কৃত গদ্য রীতির বৈশিষ্ট্যের প্রতি কেরীর সহযোগী পণ্ডিতদের দৃষ্টি নিশ্চয়ই আকৃষ্ট হয়। জীবন পরিচয়ের প্রকাশধর্মের পার্থক্য অনুসারে সংস্কৃত গদ্য-সাহিত্যের আলঙ্কারিক বিভাগ—কথা ও আখ্যায়িকা। কথার বিষয়বস্তু কাল্পনিক, আর উপজীব্য আখ্যায়িকার

বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক। বাণের রচনা কাদম্বরী কথা, আর হর্ষচরিত আখ্যায়িকা। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে প্রকাশিত রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র এবং রাজীবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্ রচনা হিসাবে অপরিণত; গ্রন্থ-পরিকল্পনা সংস্কৃত গদ্যরীতি দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে হয়। তরুণ শিক্ষার্থীদের চিত্ত-বিনোদনের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাহিনী ও ইতিহাসের রস পরিবেশনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এই বিষয়ের রচনাতেও সংস্কৃত সাহিত্য থেকে বিষয়বস্তু লাভে কেরীর সহযোগিবৃন্দ বঞ্চিত হননি। 'বিদ্যাপতির পুরুষপরীক্ষার হরপ্রসাদ রায় কৃত বঙ্গানুবাদ ও সংস্কৃত হিতোপদেশ অবলম্বনে গোলকনাথ ও মৃত্যুঞ্জয় লিখিত হিতোপদেশ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। চণ্ডীচরণের তোতা-ইতিহাস-এর আদর্শ ফারসী গ্রন্থ হলেও এতে শুকসপ্ততির প্রভাব আছে সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা ইংরেজী সংজ্ঞা অনুযায়ী 'পপুলার টেল' শ্রেণীর গ্রন্থ, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এই গ্রন্থের অনুবাদ করেন। কলেজ থেকে প্রকাশিত ইতিহাস-মালা, ইতিহাস-নামাঙ্কিত হলেও বত্রিশ-সিংহাসনের মত জনপ্রিয় গল্পসংগ্রহ। রামরাম বসু রচিত লিপিমালাতে পত্রাকারে মৌলিক রচনায় পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলি' গ্রন্থের নাম রাজতরঙ্গ ছিল। কেরীর নির্দেশে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় যখন তিনি ব্রতী হন, তখন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের চেতনায় সংস্কৃত গ্রন্থ 'রাজ-তরঙ্গিণীর' প্রভাব কিছু পরিমাণে নিশ্চয়ই সক্রিয় হয়েছিল। গ্রন্থের নামকরণে কেবল নয়, প্রাচীনকালের বিবরণেও, সংস্কৃত রচনারীতির মত অতিরঞ্জন ও অতিশয়োক্তি আছে।

বিদ্যালঙ্কারের প্রবোধচন্দ্রিকা গ্রন্থে সংস্কৃত ব্যাকরণ, অলঙ্কার, পুরাণ, নীতিশাস্ত্র ও ইতিহাস থেকে নানা উপাখ্যান সংগৃহীত হয়েছে। এই গ্রন্থে বিষয় অনুসারে তিনি কথ্য, সাধু ও সংস্কৃত রীতি ব্যবহার করেছেন। বাংলা গদ্যের যথার্থ শব্দবিন্যাস-রীতি মৃত্যুঞ্জয়ের রচনায় দেখা যায় না। কিন্তু সংস্কৃত সন্ধি ও সমাসের ভার বাংলা গদ্য বহন করতে সক্ষম কিনা, এবং তার দ্বারা আবার শিল্পশ্রী কতটুকু প্রকাশিত হয়, বিভিন্ন রীতির প্রয়োগ দ্বারা তার পরীক্ষা হয়েছে।

বাঙালী লেখকগণের মধ্যে রামমোহন রায় সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি সুস্পষ্ট বক্তব্য উপস্থাপিত করার জন্য বাংলা গদ্য রচনায় ব্রতী হন। মিশনারী সম্প্রদায় এবং গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায়ের আক্রমণে তাঁকে শাস্ত্রীয় বিচার বিতর্কে অবতীর্ণ হতে হয়। সেযুগে লৌকিক ভাষায় শাস্ত্রালোচনা নিষিদ্ধ ছিল। রামমোহনের বেদান্ত গ্রন্থের প্রতিবাদে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বেদান্তচন্দ্রিকা রচনা করে মন্তব্য করেছিলেন, "যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রী হৃদয়ার্থবোদ্ধা সুচতুর পুরুষের গণস্তবী অসতী-নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্মুখ হন, তেমনি সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষায় হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্না উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণ মাত্রেতেই পরাঙ্মুখ হন", এই প্রতিকূল পরিবেশে রামমোহন রায় বিভিন্ন উপনিষদের অনুবাদ ও শাস্ত্রীয় বিচার সরল প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় করেছিলেন। বাংলা অনুবাদে ও শাস্ত্রীয় বিচার বিতর্কে রামমোহন কিছু পরিমাণে সংস্কৃত বৈয়াকরণ রীতি অনুসরণ করেছিলেন। সূত্রকারগণ অর্ধমাত্রা লাঘব করতে পারলেও পুত্রোৎসবের আনন্দ অনুভব করতেন। রামমোহনের রচনারীতি সংহত সরল ও যুক্তিনিষ্ঠ, কিন্তু অন্বয় ও সাহিত্যগুণ থেকে বঞ্চিত।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বিদেশী অধ্যক্ষের অনুরোধে বাংলা গদ্য রচনা করেন, এবং এই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত গদ্য রচনা কার্যে নিযুক্ত হয়ে গদ্যরীতির সন্ধান করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অপরের অনুরোধে নয়, অন্তরের প্রেরণায়, শিক্ষা-প্রচার ও সমাজ-সেবার উদ্দেশ্যে গ্রন্থ রচনা করেন, এবং তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যকে রীতি দান করেন। রীতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অর্থপূর্ণ শব্দের ইচ্ছামত ব্যবহার গদ্যভাষা নয়। গদ্যভাষা মনোভাব প্রকাশের অর্থপূর্ণ শব্দাবলীযুক্ত সেই বাহন যা ব্যাকরণের নীতি অনুযায়ী বিন্যস্ত হয়ে ভাব প্রকাশের একটি আনুপূর্বিক রূপসৃষ্টি করে। এই রূপসৃষ্টিই পদবিন্যাস বা ভাষার syntax। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত গদ্যরীতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। পরবর্তী জীবনে ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় অন্তরঙ্গ হয়। সংস্কৃত গদ্যের শিল্পশ্রী এবং ইংরেজী গদ্যের সহজ রূপ তাঁকে প্রভাবিত করে। তিনিই সর্বপ্রথম 'ধ্বনিসামঞ্জস্য' স্থাপন করে এবং 'সৌম্য সরল শব্দ' নির্বাচন করে বাংলা গদ্যের ছন্দ আবিষ্কার করেন। ভাষা তখন সার্থক হয় যখন শিল্পীর প্রাণসত্তার স্বাক্ষর সে বহন

করে। বজ্রকঠোরের সঙ্গে কুসুমকোমল ভাব সংস্কৃত তৎসম শব্দ ও তদ্ভব শব্দকে সুষম মিলনে সংবদ্ধ করে বিদ্যাসাগরী রীতিকে সৃষ্টি করেছে। তাঁর শকুন্তলা ও সীতার বনবাস ভাবানুবাদ; লেখকের অন্তরের করুণার নির্ঝর গ্রন্থ দুটিকে ভাবসিক্ত করেছে।

বিদ্যাসাগর-রচিত সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, বাংলাভাষায় সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস। সংস্কৃত সাহিত্যের মূল্যায়নে, বিদ্যাসাগর চিরাচরিত মতের প্রতিধ্বনি করেন নি। তাঁর অভিমতের স্বাতন্ত্র্য ছিল। এই গ্রন্থ এবং শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত সাহিত্যের রসস্বরূপ সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙালীকে নূতন করে সচেতন করেছিল।

রামমোহনের পর মহর্ষির রচনায় ও সাধনায় বেদ, বেদান্ত ও উপনিষদ নূতন করে অর্থ ও তাৎপর্য লাভ করে। মহর্ষির লিখিত রচনাবলীর মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম ব্যাখ্যান, আত্মতত্ত্ববিদ্যা, ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস, আত্মচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। মহর্ষি বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেননি। তিনি নিজে উপনিষদের বৃত্তি লিখে তার বঙ্গানুবাদ করেন। মহর্ষি ভক্তিপথের পথিক ছিলেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। মহর্ষির সত্যসন্ধান যুক্তিবাদী বিশ্লেষণের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে।

মহর্ষির সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থায় অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলা গদ্যের উন্নতি সাধন করেন। সংস্কৃতের অনাবশ্যক ভার থেকে তিনি বাংলা সাহিত্যকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। সংস্কৃতের পরিবর্তে বাংলা ভাষায় উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত হয়। শাস্ত্রের আনুগত্য এবং ভক্তিবাদ পরিহার করে তিনি জ্ঞানবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মতে, "বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ববেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত।" অক্ষয়কুমারের জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনায় এবং মহর্ষির অধ্যাত্ম-ভক্তি-তদগত অনুভূতির সুকুমার প্রকাশে বাংলা সাহিত্য সার্থকতর পরিণতির সম্মুখীন হয়।

মহর্ষির প্রেরণায় রাজনারায়ণ বসু এবং বিদ্যাসাগরের অনুসরণে তারাশঙ্কর তর্করত্ন বাংলা গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদে বাংলা গদ্য কখনও মূল গ্রন্থের মত অলসগামিনী হলেও, সাধারণতঃ সচল। উনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানমার্গী ধর্মালোচনা রাজনারায়ণ বসুর মনীষার আধারে যুক্তি, বিচার ও প্রমাণাদি যোগে সংহত ও দীপ্ত হয়েছে।

বাংলা গদ্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রচনায় সর্বপ্রথম সচেতনভাবে প্রবন্ধধর্মের লক্ষণান্বিত হয়। ধর্মনিষ্ঠ ঐতিহ্য-নির্ভর আদর্শবাদ দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ ও বিবিধ প্রবন্ধ প্রভৃতি গ্রন্থে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রবন্ধ এক বিশেষ ধরণের সাহিত্যিক নির্মিতি। প্রবন্ধকারের ব্যক্তিত্বের প্রভায় চিহ্নিত হয়ে প্রবন্ধ প্র-বন্ধত্ব লাভ করে। এই সচেতন আঙ্গিকবুদ্ধি নিয়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও তাঁর প্রবন্ধাবলী রচনা করেছিলেন। সেজন্য বোধহয় তাঁর প্রবন্ধে সাহিত্যরস অপেক্ষা জ্ঞান-সমৃদ্ধি প্রবলতর। ভূদেবের মধ্যে একটি সাহিত্যিক রসিক মানস নিহিত ছিল। তাঁর স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। প্রবন্ধের মত ভূদেব উপন্যাস সংজ্ঞার দ্বারা, তাঁর বিশিষ্ট এক রচনাকে চিহ্নিত করেন। সাহিত্যের বিশেষজ্ঞগণ ঐতিহাসিক উপন্যাসের অঙ্গুরীয়বিনিময় গল্পটিকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসের মর্যাদাদান করেছেন।

বঙ্কিমের রচনায় বাংলা প্রবন্ধ ও উপন্যাস সর্বপ্রথম সাহিত্যরসে মণ্ডিত হয়। তাঁর প্রবন্ধে কবিজনোচিত অনুভূতি বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও মনীষার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর পরিধি বহুব্যাপ্ত। সমকালীন সমাজ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সমাজনীতির সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, ধর্ম এবং দর্শন তাঁর আলোচ্য বিষয়। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র উত্তররামচরিতের অপূর্ব বিশ্লেষণ করেন, এবং সেক্সপীয়ার ও কালিদাসের তুলনামূলক সমালোচনা করে প্রমাণ করেন, সংস্কৃত সাহিত্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সঙ্গে সমকক্ষতার দাবী করতে সক্ষম।

তাঁর ধর্ম-চিন্তার স্বাতন্ত্র্যও লক্ষণীয়। বঙ্কিমের মতে হিন্দুধর্ম কোন সাম্প্রদায়িক আশা আকাঙ্ক্ষা বিশ্বাসের প্রকাশ মাত্র নয়। দেহে এবং মনে যা মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করে, তাকেই ধর্ম বলে অভিহিত করা যায়। এই ধর্মই হিন্দু ধর্ম, হিন্দুধর্ম তথা আদর্শ মনুষ্যত্বের যথার্থ প্রতিভূ বঙ্কিমচন্দ্রের মতে শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণচরিত্রের বিশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্র পৌরাণিক কিংবা কাব্যিক কাহিনী মাত্রকেই গ্রহণ করেন নি। সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক কোঁতের প্রত্যক্ষবাদ এবং ইংরেজ দার্শনিক মিল ও বেন্থামের হিতবাদ বঙ্কিম-

মানসকে সমপরিমাণে প্রভাবিত করেছিল। ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ঈশ্বরতত্ত্বকে সম্পূর্ণ পরিহার করেছিল। বঙ্কিমের কাছেও মহাভারতের পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ সর্বলোকহিতব্রতী গীতার নিষ্কাম যোগী। বঙ্কিমের কল্পনায় নিষ্কাম যোগী, নিরাসক্ত হলেও, নির্মম নন।

তাঁর সাহিত্যিক জীবনের পরিণততম যুগে দেবী চৌধুরাণীর প্রফুল্ল চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র এই আদর্শ রূপায়িত করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসেও এই আদর্শপ্রবণতার অস্ফুট পরিচয় বিকশিত হয়েছে আয়েষা চরিত্রে। পরবর্তী অধিকাংশ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র নারীত্বের মধ্যে, কিংবা কখনও পৌরুষের মধ্যে, এই আদর্শ মনুষ্যত্বের বিকাশসার্থকতা এবং বিপর্যয়ের জন্য ব্যর্থতার ইতিহাস পরোক্ষভাবে হলেও সচেতন হয়ে সৃষ্টি করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচনাবলীর দ্বারা বাঙালীর স্বাজাত্যাভিমান জাগ্রত করেন। ইংরেজ-রচিত ইতিহাস যে বাঙালীর সত্য ইতিহাস নয়, এবং বাঙালীর সত্য ইতিহাস যে অগৌরবের নয়—বঙ্কিমচন্দ্র একথা সর্বপ্রথম প্রচার করেন। বঙ্কিমের রচনায় স্বাজাত্যবোধ অধ্যাত্মবোধের সঙ্গে সংযুক্ত। নিষ্কাম ধর্ম ও স্বদেশপ্রেমের সমন্বিত রূপ আনন্দমঠের ভাব-প্রেরণা। বঙ্কিমের ভাবদৃষ্টিতে সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি দশপ্রহরণধারিণী দুর্গাতে পরিণত হয়েছেন।

আবহমান কালের বাঙালীর মানস সংস্কৃতি রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের রসে পরিপুষ্ট। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের জ্ঞানমার্গী রচনায় পৌরাণিক আলোচনার স্থান ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় পৌরাণিক রূপকল্পনা ও ধ্যানকল্পনাকে বাঙালী নূতন করে লাভ করে।

বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব আলোচনার প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে, পূর্বোক্ত সাহিত্য সংস্কৃতের ভাবরসেই পুষ্ট হয়নি, সংস্কৃত সাহিত্যের আঙ্গিকও তাকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের নানাবিধ শব্দ ও অর্থালঙ্কার এবং সুললিত ছন্দরাজি দ্বারা বাংলা সাহিত্য মণ্ডিত। তা ছাড়া, বাংলার গণনাতীত প্রবাদরাশি ও বাগ্‌ভঙ্গী সংস্কৃত সাহিত্যের প্রগাঢ় প্রভাবের পরিচয় বহন করে। গ্রন্থবিস্তারভয়ে এ সকল প্রসঙ্গের আলোচনা থেকে এখানে বিরত থাকতে হল।

নামনির্দেশিক

[শুধু প্রধান প্রধান সংস্কৃত গ্রন্থ, লেখ ও গ্রন্থকারের নাম এখানে লিখিত হইল। পরিশিষ্টের নামগুলি এই নির্দেশিকার অন্তর্ভুক্ত হইল না। তারকাচিহ্ন পাদটীকার নির্দেশক।]

গ্রন্থ ও লেখ

গ্রন্থকার